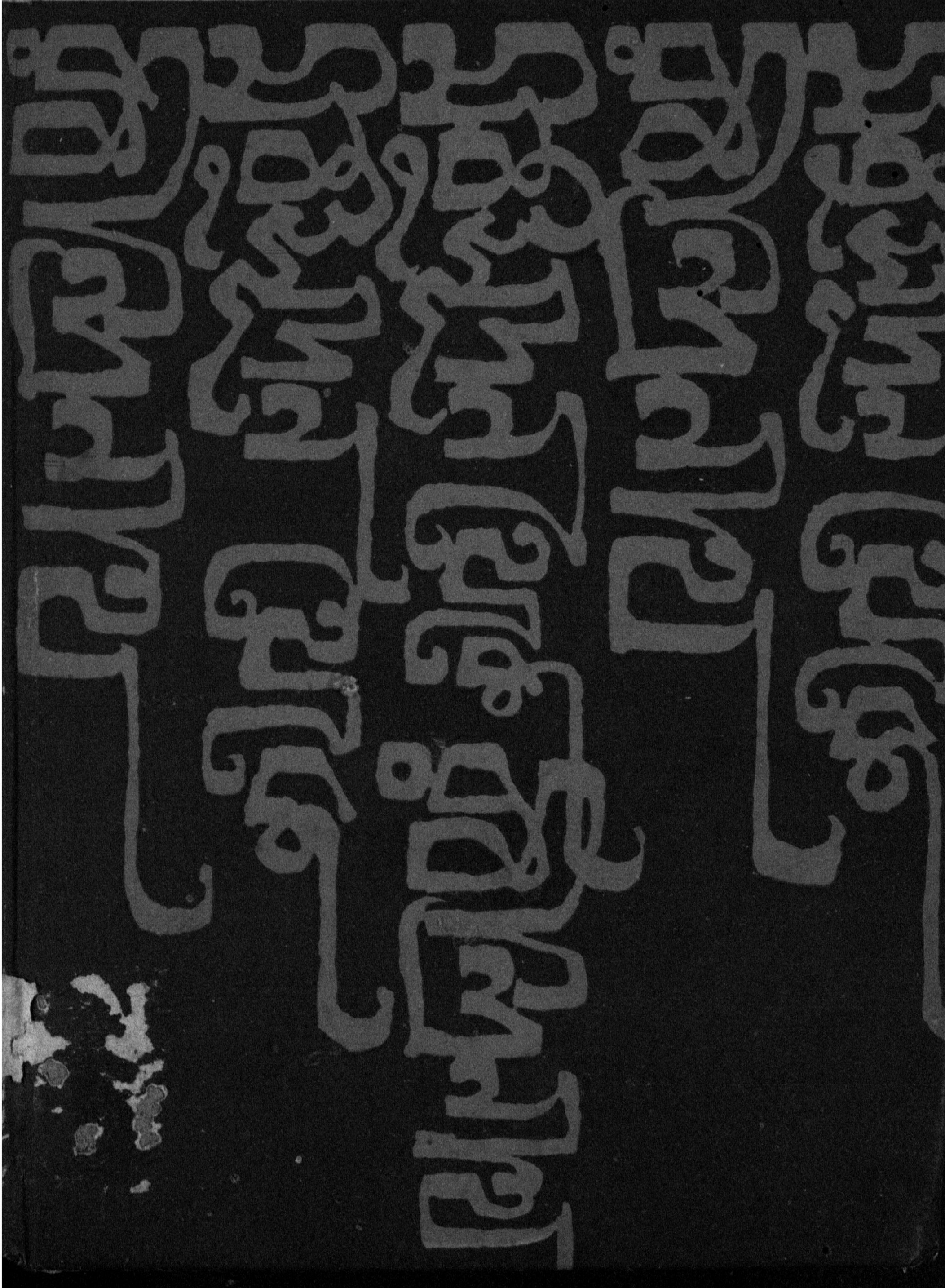
মধুসূদন থেকে রবীন্দ্রনাথ

প্রমথনাথ বিশী



মধুসূদন থেকে রবীন্দ্রনাথ

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

করুণা প্রকাশনী। কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
ভাদ্র ১৩৮১

প্রকাশক
রামচরণ মুখোপাধ্যায়
১৮-এ, টেমার লেন
কলকাতা-৯

মুদ্রাকর
শ্রীযামিনীভূষণ উকিল
দি মুকুল প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২০৯-এ, বিধান সরণী
কলকাতা-৬

প্রচ্ছদশিল্পী
খালেদ চৌধুরী

সূচীপত্র

আজি হতে শতবর্ষ পরে

১৯৯০ সালে বিপুল রবীন্দ্র সাহিত্য কপি রাইটের সীমা অতিক্রম করবে—তখন অবাধ প্রকাশে বাধা থাকবে না। ১৮৯৬ সালে কবি লিখেছিলেন ১৯৯০ সাল নামে কবিতাটি "আজি হতে শতবর্ষ পরে। কে তুমি পড়িছ বসি আমার কবিতাখানি। কৌতূহলভরে।" ১৯৯০ সালের পাঁচ বছর পরে রবীন্দ্রনাথের অভীষ্ট শতবর্ষপূর্ণ হবে। আর অদূরে, মাত্র চার বছর পরেই এক বিংশ শতকের দিগন্ত। তিনটি বছরের ১৮৯৬, ১৯৯০ আর ১৯৯০ সালেব বড়ই তাৎপর্যপূর্ণ ঘনিষ্ঠতা। এই বছর তিনটি মনে তিনটি প্রশ্ন জাগায়।

কপি রাইটের সীমা অতিক্রম করলে প্রকাশকগণ রবীন্দ্রনাথের কোন্ কোন্ কাব্য (এখানে কাব্য নিয়েই আলোচনা) আগ্রহ সহকারে প্রকাশ করবে! নূতন কাব্য সঞ্চয় প্রকাশিত হলে তাতে কোন্ কোন্ কাব্য প্রধান স্থান অধিকার করবে, তা কি কবিকৃত সঞ্চয়িতার নীতি অনুসরণ করবে, কিংবা তৎকালীন পাঠকের রুচিগ্রাহী নূতন কবিতায় পূর্ণ হয়ে উঠবে? দ্বিতীয় প্রশ্ন, 'শতবর্ষ পরের' পাঠক কোন্ কাব্য ও কোন্ কোন্ কবিতা কৌতূহলভরে পাঠ করবে? তৃতীয় প্রশ্ন, এক বিংশ শতকের প্রথম অংশের পাঠকদের চোখ রবীন্দ্রনাথ কী দৃষ্টিতে দেখবে? আজ যেমন আমরা তাঁকে মহাকবি, বিশ্বকবি (কেহ কেহ বলে থাকেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবি) মনে করি তারাও কি তাই করবে? তিনটি প্রশ্নই দূরত্বজনিত সংশয়ে পূর্ণ। তবু আলোচনা করতে বাধা নেই।

ঊনবিংশ শতকের অষ্টম দশকে বায়রন সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখতে গিয়ে ম্যাথু আর্নল্ড মন্তব্য করেছিলেন যে, ১৯০০ সালে যখন ইংরাজী কাব্যের সন তামামি হিসাব হবে দেখা যাবে যে প্রধান দুটি নাম

ওয়ার্ডস্বার্থ ও বায়রনের। প্রথম জন সম্বন্ধে তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হলেও বায়রন সম্বন্ধে সত্য হয় নি, অন্ততঃ ১৯০০ শতকের প্রারম্ভে। ব্যবসায়ের বাজারে তেজি মন্দির মতো সাহিত্যের বাজারেও উক্ত রীতি সক্রিয়। ওয়ার্ডস্বার্থের দীর্ঘ জীবনের প্রথম ভাগ মন্দির মধ্যে কাটলেও শেষে তেজিতে এসে পৌঁছেছিলেন। তাঁর সে প্রতিষ্ঠার বিশেষ ইতরবিশেষ হয় নি, টেনিসনের বিপুল জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও হয় নি। বায়রনের স্বল্পায়ত জীবনের গোড়া থেকেই তেজি অবস্থা, মৃত্যুর পরেও কিছুকাল তা ছিল, পরে আরম্ভ হয় মন্দি। ১৯০০ শতকের প্রারম্ভেও তা কেটে যায় নি। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে বায়রনের কোনো কোনো কাব্য তেজি হয়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে তা বোধকরি আরও বেড়েছে। সামাজিক দৃষ্টির পরিবর্তনেই এমন ঘটেছে। আরও কিছুকাল গেলে একবিংশ শতকের প্রারম্ভে হয় তো সত্য হবে ম্যাথ্যু আর্নল্ডের ভবিষ্যদ্বাণী। ইংরাজী সাহিত্যে পল্লবগ্রাহী বিদেশী পাঠকের মতের যদি কোনো মূল্য থাকে তবে বায়রনের কাব্যের স্থান অবশ্যই ঠিক ওয়ার্ডস্বার্থের নিচেই এবং আর সকলের উর্ধ্বে।

ম্যাথ্যু আর্নল্ডের একটা সুবিধা ছিল, অনেক সমকক্ষ-প্রায় কবিদের মধ্যে তুলনায় একটা সিদ্ধান্তে এসেছিলেন। আমাদের বেলায় সে সুবিধা নেই—রবীন্দ্রনাথের ধারে কাছে পৌঁছতে পারে এমন কবি বাংলা সাহিত্যে দেখা দেয় নি, তিনি অদ্বিতীয় আছেন আর তাই থেকে যাবেন। তবে তাঁর দীর্ঘ কবি জীবনের এক পর্বের পাশে অন্য পর্বের তুলনা করবার সুযোগ আছে। সেই সুযোগ গ্রহণের চেষ্টা করা যাক।

এবারে প্রথম ও দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করি, দুটি একই প্রশ্নের রূপান্তর, কেন না প্রকাশক ও পাঠক পরস্পরের প্রতি নির্ভরশীল। পাঠকের চাহিদা অনুসারে প্রকাশক চালিত—এমন প্রকাশক এখনও দেখা দিল না যারা পাঠকের রুচিকে তৈরি করতে

পারে। আর অগ্রসর হওয়ার আগে একটা কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া আবশ্যক। সমগ্র রবীন্দ্র রচনাবলীর গদ্য ও পদ্যর বিভিন্ন সংস্করণ অবশ্যই প্রকাশিত হতে থাকবে, আর রবীন্দ্র সাহিত্য বিশেষজ্ঞগণ অবশ্যই সমগ্র অধ্যয়ন করবেন, রবীন্দ্রনাথ লিখিত অতি তুচ্ছ চিরকুটখানিও তাঁরা অবহেলা করতে পারেন না, স্বর্ণকারের দোকানের ধূলিকণার মধ্যেও সোনার কণা গোপনে থেকে যায়। এখানে বিশেষজ্ঞগণ আমার লক্ষ্য নন, লক্ষ্য সাধারণ পাঠক।

এখানে একটা আনুষঙ্গিক প্রশ্নের উত্তর সেরে নেওয়া যেতে পারে। তখন আদৌ কবিতা লোকে পড়বে কি ? এখনই পড়ে কি ? বই বিক্রির হিসাবের যদি কোন অর্থ থাকে তবে স্বীকার করতে হয় রবীন্দ্রনাথের ছাড়া অন্য কোন মানের কবিতা বড় কেউ পড়ে না, কবি ও কম্পোজিটার বাদে। ১৯৬০ সালে যে এ অবস্থার পরিবর্তন হবে এমন কোন্ কথা। এই প্রসঙ্গে উঠবে এক সময়ে তো লোকে কবিতা পড়তো, তবে এখন পড়ে না কেন ? ইংলণ্ডে উনিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত কাব্যই ছিল মনের চলাচলের সদর রাস্তা। তারপরে স্কটের ও ডিকেন্সের উপন্যাসের আকর্ষণ পথের ও মতের বদল হল তবু তখনো প্রভূত কাটতি টেনিসনের কবিতার। বিংশ শতকের প্রারম্ভ থেকে অবশ্য পাকাপাকি পথান্তর ও মতান্তর হল। তবু তারই মধ্যে এক সময়ে নেসফিল্ডের কাব্য প্রচুর বিক্রি হয়েছে। এই সেদিন বিখ্যাত এক ইংরেজ সমালোচকের বইয়ে পড়লাম যে, হালের কবিরা Rupert Brooke-কে অকবি প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করা সত্ত্বেও তার কবিতার বিক্রি ঐ সব কবিদের চেয়ে অনেক বেশি—Rupert Brooke-এর মৃত্যু ঘটেছে এক কম পঞ্চাশ বছর আগে। আমার বিশ্বাস লোকে কবিতা পড়বার জন্যে ব্যগ্র কেবল পড়বার মতো এমন কবিতা পাচ্ছে না যা তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিধ্বনি করে। তবে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে কবিতা আর আগেকার প্রশস্ত পথটি ফিরে পাবে না। সত্য কথা বলতে কি

শুধু কবিতা নয় গদ্য সাহিত্যও স্থানভ্রষ্ট হতে চলেছে। কেন? মেকলে বলেছেন বিজ্ঞানের উন্নতিতে সাহিত্যের অবনতি। বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের সঙ্গে সাহিত্যের শক্রতা নেই। বিজ্ঞান নয় - গদ্য পদ্য যাবতীয় উচ্চাঙ্গ সাহিত্যের শত্রু টেকনোলজি—আরো বেশি দূর যাওয়া যেতে পারে। টেকনোলজি নাকি মানুষের বন্ধু কিন্তু মনুষ্যত্বের শত্রু। মানুষের নিচের দুটো স্তরে সে জৈব মানুষ এবং ইকনমিক মানুষ টেকনোলজির কৃপায় তার প্রভূত উপকার হচ্ছে। কিন্তু এ দুই স্তরের উপরে মানুষের জীবনের যদি আর কোন স্তর থাকে (আছে বলে অনেকের বিশ্বাস) যেখানে প্রকৃত মনুষ্যত্বের মূল—টেকনোলজি তার গোড়ায় আঘাত করছে। ফলে মানুষ অধিকতর বিত্তশালী ও শক্তিমান হওয়া সত্ত্বেও ক্রমেই মনুষ্যত্বে দেউলে হয়ে পড়ছে। সাহিত্য মনুষ্য জীবনের নিচের দুই স্তরের চাহিদা মেটাতে অক্ষম, কাজেই মানুষ সাহিত্য সম্বন্ধে ক্রমেই উদাসীন হয়ে পড়ছে। তবে কোন একটা অবস্থা যদি চিরন্তন না হয় তবে একদিন টেকনোলজির প্রতাপ হ্রাস পাবে। সে অবস্থা একবিংশ শতকে হবে কি দ্বাবিংশ শতকে হবে যার যেমন অনুমান। তখন আবার কবির ডাক পড়বে। আমার বিশ্বাস সে কাল দূরবর্তী নয়. মনুষ্যত্ব ভিতরে ভিতরে ব্যথিয়ে উঠেছে। এবারে আনুষঙ্গিক ছেড়ে প্রাসঙ্গিকে ফিরে আসা যাক।

কালাতিক্রমে সাহিত্যে রুচি বদলায়। নানা কারণ সামাজিক, রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত। রোমান্টিক গেটের সাহিত্য প্রকৃতিতে বদল ঘটলো পরিণত বয়সে যখন তিনি ইটালীতে গিয়ে প্রাচীন গ্রীক স্থাপত্য ও মূর্তির চাক্ষুষ পরিচয় পেলেন। ফরাসী বিপ্লবের সূচনায় উল্লসিত তরুণ ওয়ার্ডস্বার্থের কাব্যপ্রকৃতি বদলালো যখন তিনি ফরাসী বিপ্লবের অবিচার লক্ষ্য করলেন। এ দুটি ব্যক্তিগত কারণ। আবার ফরাসী বিপ্লবোত্তর ফরাসী সাহিত্য যে রোমান্টিক হয়ে উঠলো তার প্রেরণা যুগিয়েছিল ফরাসী বিপ্লব এবং নেপোলিয়ানের (যিনি

ব্যক্তিগতভাবে ক্লাসিকাল রীতির পক্ষপাতী ছিলেন) বিস্ময়কর জীবনেতিহাস। এটা রাজনৈতিক কারণ। আবার তরুণ কীটস গোঁড়া রক্ষণশীল সমালোচকদের কাছে গান গেয়ে মরলেন যেহেতু তিনি ছিলেন রাজদ্রোহের অপরাধে জেল-খাটা নী হাণ্টের বন্ধু। এ-ও রাজনৈতিক কারণ। শেলী ও বায়রন সামাজিক কারণে বিদ্রোহী। সাহিত্যের ইতিহাস খুঁজলে এমন ঋতু বদলের নজির সর্বত্র পাওয়া যাবে।

আমাদের দেশে ইংরেজির প্রভাবে যে ঋতু বদল হল তার ফসল মধুসূদন বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতির রচনা। এইসব বদলের হয়তো একটা নিয়ম আবিষ্কার করা সম্ভব হতো কিন্তু আধুনিক যুগে তাতে একটা বাধা দেখা দিয়েছে। এ যুগের প্রায় প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের একটি সাহিত্যিক মতবাদ আছে আর নানা উপায়ে সেই মতবাদকে সমাজে প্রচারিত করছে, ফলে লেখকের ও পাঠকের উদ্‌ভ্রান্তি ঘটছে। এ রকমটি আগের কালে ছিল না। সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের হেতু আপন নিয়মে আসে। কিন্তু এখন সেই হেতুটাকে কৃত্রিম উপায়ে জীবিত করে রাখবার চেষ্টা হচ্ছে। তাই নিশ্চয়ভাবে বলা সম্ভব নয় আজ থেকে পঁচিশ বছর পরে সাহিত্যের রুচি কি রকম দাঁড়াবে। রবীন্দ্র সাহিত্য সম্বন্ধেও সম্ভব নয়—কারণ দীর্ঘকালব্যাপী এই সাধনার ধনে নানা উপাদান আছে। "আজি হতে শতবর্ষ" পরে-কার অর্থাৎ এখন হতে পঁচিশ বছর পরেকার পাঠক কবির কোন্ জাতীয় রচনা 'কৌতূহল ভরে' পাঠ করবে অনুমান করা সহজ নয়। তবু সহজ বুদ্ধির উপরে নির্ভর করে অনুমান করবার চেষ্টা করা যেতে পারে। এবার আসল প্রসঙ্গে আসা যাক। তার আগে আর একবার বিষয়ের সীমা নির্দেশ করে নেই।

সমগ্র রবীন্দ্র সাহিত্য আমার আলোচ্য বিষয় নয়, আলোচ্য বিষয় রবীন্দ্র কাব্য। রবীন্দ্র কাব্যের শ্রেষ্ঠ অংশ তাঁর গানগুলি। তবু তাদের বাদ দিতে হল নতুবা প্রবন্ধের আয়তন আয়ত্তের বাইরে চলে যেতো।

আবার ঐ কারণেই সমগ্র কাব্যকেও আলোচনা করতে সাহস করি নি, বলাকা ও পলাতকায় এসে থামতে বাধ্য হয়েছি। তা হলে দাঁড়ালো এই যে গোড়া থেঁকে বলাকা পলাতকা পর্যন্ত বর্তমান প্রবন্ধে আমার আলোচ্য—আর আলোচনার বিষয় এই সব কাব্যের কোন্ কোন্ কবিতা পাঠক 'আজি হতে শতবর্ষ পরে'—'কৌতূহল ভরে' পাঠ করতে পারে।

২

সন্ধ্যা সঙ্গীত, প্রভাত সঙ্গীত, ছবি ও গান, কড়ি ও কোমল কাব্য চারখানার তেমন সমাদর থাকবে বলে মনে হয় না। তবে প্রভাত সঙ্গীতের নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ কবিতাটির প্রথম কয়েক ছত্র এবং কড়ি ও কোমলের প্রাণ কবিতাটি সমাদৃত হতে থাকবে। খুব সম্ভব তখনকার সাধারণ পাঠক মানসী কাব্য থেকেই রবীন্দ্রকাব্যের সূত্রপাত বলে মনে করবে। মানসী কাব্যের উপহার, সিন্ধুতরঙ্গ, নারীর উক্তি, পুরুষের উক্তি, ব্যক্তপ্রেম, গুপ্তপ্রেম, বধূ, মেঘদূত কবিতাগুলির সমাদর বাড়বে বলেই মনে হয়।

সোনার তরী কাব্যের সোনার তরীর স্থায়িত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ নই, তবে কবির বহু ঘোষিত সমর্থন ও তিন প্রজন্ম কালের অনুমোদনের ফলে কবিতাটি টিকে যেতেও পারে। যেতে নাহি দিব, মানস সুন্দরী (শেষের চব্বিশ ছত্র বাদে) বসুন্ধরা (মানস ভ্রমণ অংশ বাদে) নিরুদ্দেশ যাত্রা, হৃদয় যমুনা, পরশপাথর (চতুর্থ শ্লোক বাদে), বৈষ্ণব কবিতা ও দুর্বোধ কবিতার সমাদর বাড়বে বই কমবে না। পুরস্কার কবিতাটির অনভিপ্রেত দৈর্ঘ্য এর স্থায়িত্বের অন্তরায়।

চিত্রা কাব্যের প্রেমের অভিষেক, উর্বশী, স্বর্গ হইতে বিদায়, দিন-শেষে, রাত্রে ও প্রভাতে, ১৯০০ সাল, জ্যোৎস্না রাত্রে, সুখ অবশ্যই সমাদর পেতে থাকবে। তবে জীবনদেবতা বিষয়ক কবিতাগুলি মার খাবে, ওদের মধ্যে গভীরতার ও অভিজ্ঞতার অভাব।

চৈতালি কাব্যের যে সমাদর হওয়া উচিত ছিল হয় নি, ওর বাহ্যিক সরলতার ফলেই পাঠক প্রতারিত হয়েছে। কালান্তরে চৈতালি রবীন্দ্রকাব্যের একটি শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলেই পরিগণিত হবে। ওর অল্প কবিতাই বাদ পড়বে।—গীতহীন, স্বপ্ন, আশার সীমা, পল্লীগ্রামে, কর্ম, দুই উপমা, অভিমান, পরিবেশ, সমাপ্তি, তত্ত্বজ্ঞানহীন, গান, ভক্তের প্রতি, নদীযাত্রা, মৃত্যুমাধুরী, স্মৃতি, বিলয়, প্রথম চুম্বন, শেষ চুম্বন, যাত্রী, তৃণ ঐশ্বর্য, স্বার্থ, প্রেয়সী, শান্তিমন্ত্র, প্রার্থনা, আশিস গ্রহণ, বিদায় কবিতাগুলি ছাড়া আর সমস্তই বর্ধিত সমাদরে টিকে থাকবে।

কণিকা হচ্ছে কবিতাকণার পুঞ্জ, ওদের সম্বন্ধে আলাদা আলোচনা সম্ভব নয়। তবে ঐ সব কবিতাকণার অনেকগুলিই ইতিমধ্যে প্রবাদে পরিণত হয়েছে—ভবিষ্যতে এদের সংখ্যা বাড়বে বই কমবে না।

কল্পনাকাব্যের বর্ষামঙ্গল, স্বপ্ন, মদনভস্মের পূর্বে, মদনভস্মের পরে, বর্ষশেষ, প্রকাশ, বসন্ত ও বৈশাখ কবিতার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ নাই।

কথা ও কাহিনী কাব্যের কথা অংশের সমগ্র চিরস্থায়ী হবে, তবে পরিশোধ কবিতাটির নৃত্যনাট্যরূপ শ্যামার অধিকতর সমাদর মূল কবিতাটির গৌরবহানির কারণ হবে বলে বিশ্বাস। কাহিনী অংশের পুরাতন ভৃত্য, দুই বিঘা জমি ও দেবতার গ্রাস এখনো জনপ্রিয়, তখনো তাই থাকবে। বোদ্ধা পাঠকগণের কাছে গানভঙ্গ কবিতাটির সমাদর থাকবে।

এখানে কাহিনী নামে পরিচিত নাট্য কাব্যগুলির আলোচনা সেরে নেওয়া যেতে পারে। গান্ধারীর আবেদন, কর্ণকুন্তী সংবাদ, নরকবাস, বিদায় অভিশাপ, লক্ষ্মীর পরীক্ষা অবশ্যই স্থায়ীভাবে থাকবে। বিশেষ কারণে সতী নাট্যকাব্যটির এখন সমাদর কম, কিন্তু এটি রবীন্দ্রনাথের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। উক্ত গ্রন্থে প্রথিত ভাষা ও ছন্দ এবং পতিতা কবিতা দুটিও সমাদর পেতে থাকবে—তবে হয়তো এদের অংশবিশেষ বাদ পড়তে পারে।

শিশুকাব্যের সমগ্র অর্থাৎ গোড়া থেকে নদী কবিতা পর্যন্ত স্থায়ী

সম্পদরূপে থাকবে, তবে রুচিভেদে সমাদরের মাত্রায় কমবেশি হওয়া অসম্ভব নয়। পরবর্তী অংশের বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর ছড়াটি শিশুদের মুখে মুখে অমর হয়ে বিরাজ করবে।

উৎসর্গ কাব্যের মরীচিকা, আমি চঞ্চল হে, প্রবাসী, মরণ মিলন, জন্ম ও মরণ, নমস্কার এবং শিবাজি উৎসবের ভাবী সমাদর সম্বন্ধে সন্দেহ নাই।

ক্ষণিকা কাব্যের যে কবিতাগুলি কবিকৃত সঞ্চয়িতায় স্থান পেয়েছে সেই কয়টিই ক্ষণিকার শ্রেষ্ঠ কবিতা। এখানে সঞ্চয়িতার ইঙ্গিত গ্রহণ করা যেতে পারে।

নৈবেদ্য সম্বন্ধেও সঞ্চয়িতার ইঙ্গিত গ্রহণ করা যেতে পারে।

খেয়ার কবিতাগুলি সম্বন্ধে রুচিভেদ অপারিহার্য। এই কাব্যে ৫৬টি কবিতা আছে—তন্মধ্যে মাত্র দশটি সঞ্চয়িতায় স্থান পেয়েছে। শেষ পর্যন্ত ঐ সংখ্যক কবিতা স্থায়ী হতে পারে—তবে ঠিক ঐ কবিতাগুলি হয়তো নয়। শুভক্ষণ ও ত্যাগ (একত্রে), অনাহত, বাঁশি, অনাবশ্যক, লীলা, কৃপণ কুয়ার ধারে, নীড় ও আকাশ, কোকিল, গানশোনা, বর্ষাপ্রভাত কবিতা কয়টির অমরতা সন্দেহাতীত। খেয়ার দুঃখবাদ জাত কবিতাগুলি তত্ত্বরূপে যতই মূল্যবান হোক কাব্য হিসাবে তাদের তত মূল্য নেই।

বহুকাল আগে লিখেছিলাম যে, স্মরণ কাব্যখানি তেমন সার্থক হয় নি। রবীন্দ্রনাথের পত্নীবিচ্ছেদের শ্রেষ্ঠ কাব্য শিশু কাব্যখানি, যাতে শিশু সন্তানের মাতারূপে পত্নী চিত্রিত। কোন ব্যক্তি বা ঘটনা দূরগত না হলে রবীন্দ্রনাথের কল্পনাকে উদ্বোধিত করতে পারে না এই জন্যেই রবীন্দ্র সাহিত্যে সাময়িক কবিতার স্বল্পতা। স্মরণ কাব্য ঘটনার বড় কাছাকাছি লিখিত, শিশুর কবিতাগুলি বছর দুই পরে। আমার বিবেচনায় স্মরণ কাব্যের দুটি মাত্র কবিতা ভাবী সমাদরের বস্তু হবে 'দেখিলাম খান কয় পুরাতন চিঠি' (এটি সঞ্চয়িতায় নাই) এবং 'যেভাবে রমণীরূপে আপন মাধুরী ?'

অতঃপর গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য ও গীতালি। এ তিনখানি মিলে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলেও গানের সমষ্টি। রবীন্দ্রনাথের গানগুলিকে আলোচনা থেকে বাদ দিয়েছি; তাদের সংখ্যা ও উৎকর্ষ বিচারে নিবৃত্ত হতে হয়েছে। কবির গানের জন্য স্বতন্ত্র সঞ্চয়ন গ্রন্থের প্রয়োজন হবে। এখানে এইটুকু বলাই যথেষ্ট যে, গীতাঞ্জলির উপরে নোবেল পুরস্কারের ছাপ থাকায় তার বিক্রয় ও সমাদর কখনো কমবে না—যদিচ আমার বিশ্বাস কাব্য হিসাবে গীতিমাল্যর স্থান তিনখানির মধ্যে সবার উপরে।

বলাকার কবিতা সংখ্যা পঁয়তাল্লিশটি। সঞ্চয়িতায় স্থান পেয়েছে মাত্র সাতটি। বলাকার প্রকাশকালের গৌরব আর নাই—স্বয়ং কবির চোখেও নাই। বলাকার ৫।৭টি কবিতা সমাদৃত হতে থাকবে, তবে কবি নির্বাচিত সবগুলি হয়তো নয়। নিম্নোক্তগুলি অধিকতর সমাদৃত হতে থাকবে বলে বিশ্বাস। 'পউষের পাতাঝরা তপোবনে' (১৩), 'কত লক্ষ বরষের তপস্যার ফলে' (১৫), 'ওরে তোদের ত্বর সহে না আর' (২১), 'কোন্‌ক্ষণে। সৃজনের সমুদ্র মন্থনে' (২৩), 'যে বসন্ত একদিন করে ছিল কত কোলাহল' (২৫), 'সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি' (৩৬) এবং 'দূর হতে শুনিস কি মৃত্যুর গর্জন, ওরে দীন' (৩৭)। তত্ত্বভূয়িষ্ঠ কবিতাগুলির প্রকাশকালের গৌরব এখন আর নাই, ভাবীকালে আরও কমবার আশঙ্কা।

পলাতকা কাব্যে যে সব কবিতায় গল্প বেশ পূর্ণাঙ্গ ও পরিণত সেইগুলির টিকে থাকবার সম্ভাবনা। ফাকি, মায়ের সম্মান, নিষ্কৃতি, সেই ধরনের কবিতা। এই সঙ্গে শেষ গান কবিতাটির উল্লেখ করা আবশ্যক—যদিচ ইহা কাহিনী নয়, তবে কবি কাহিনী বটে।

এবারে থামতে হল। পরবর্তী কাব্যসমূহের বিচার করতে গেলে বিব্রত হতে হবে। প্রথম কারণ তাদের অজস্রতা ও বৈচিত্র্য, দ্বিতীয় কারণ গদ্যকবিতা সম্বন্ধে আমি এখনো মনস্থির করতে পারি নি, কাজেই তাদের স্থিরতার হিসাব আমার পক্ষে কেমন করে সম্ভব।

তবে এই পর্যন্ত বলতে পারি রোগশয্যায়, আরোগ্য, জন্মদিনে এবং শেষ লেখা কাব্যগুলিতে যে নূতনত্বের চমক আছে ভাষায়, ছন্দে ও ভাবে যে ঠাটভাঙা অভিনবত্ব আছে তার বিস্ময়করতা কখনো কমবে বলে মনে হয় না। রবীন্দ্রনাথের কাছে পাঠক যে নূতনত্বের দাবি করতে অভ্যস্ত সেই দাবির চরম মূল্য কবি দিয়ে গিয়েছেন জীবনপ্রদীপ নিভবার উষা মুহূর্তে।

রবীন্দ্রনাথের কবিতা বাছাই করবার একটি প্রধান অসুবিধা এই যে, সোনারতরী থেকে আরম্ভ করে শেষ মুহূর্ত অবধি লিখিত কবিতা-গুলির মধ্যে একটা শ্রেণীগত সাম্য আছে। প্রথম শ্রেণীর কবিতা প্রচুর, দ্বিতীয় শ্রেণীরও আছে, তবে তার নিচে আরও নামে নাই। ওয়ার্ডসওয়ার্থের কাব্যের অভাবিত উচ্চাবচতা তার কাব্যে নাই। এদিক দিয়ে বিচার করলে গ্যেটের দীর্ঘ জীবনের কাব্য সম্পদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মিল দেখতে পাওয়া যায়। ওয়ার্ডসওয়ার্থ একটি তত্ত্বকে চরম তত্ত্ব বলে স্বীকার করে নিয়ে সারা জীবন তারই চারদিকে পাক খেয়ে মরেছেন। তিনি হয়তো শান্তি পেয়েছেন কিন্তু তাঁর শান্তি পাঠকের শাস্তি। গ্যেটে ও রবীন্দ্রনাথ কোন তত্ত্বকেই চরম বলে মেনে নেন নি, সেইজন্যে তাঁরা শান্তি পান নি, তাই শেষ পর্যন্ত তাঁদের বাজন্ত বীণায় নিত্য নূতন গানের চরম স্ফুরিত হয়েছে।

একে তো সঙ্কলন গ্রন্থ দিয়ে পাঠক সাধারণকে খুশি করা যায় না, তার উপরে আবার ভাবীকালের পাঠকের রুচি অনুমান করে নিয়ে কাব্য সঙ্কলন প্রায় অসম্ভব। তবে অসম্ভব কাজেও তো মানুষ হাত দেয়। এ সেই শ্রেণীর প্রচেষ্টা। আজ থেকে পঁচিশ বছর পরেকার পাঠক এখনো যারা অজাত বা নিতান্ত শিশু, কি পছন্দ করবে তা আন্দাজ করে নিয়ে সঙ্কলন জলে বিম্বিত মৎস্যচক্র ভেদ করবার মতোই অসম্ভব। আর আগেই তো বলেছি মানুষ তো কখনো কখনো অসম্ভব কাজেও হাত দিয়ে থাকে।

রবীন্দ্রনাথের লিপিকা

রবীন্দ্রনাথের লিপিকা কাব্যখানি—কাব্যই বলা যাক, দু-চারটি রচনা ছাড়া সমস্তই কাব্যধর্মী—রবীন্দ্র সাহিত্যের উপেক্ষিতা। ১৯২২ সালে প্রথম প্রকাশের পর থেকে এ পর্যন্ত পঞ্চাশ বছরে নয়বার মাত্র মুদ্রিত হয়েছে। পুস্তকে মুদ্রণ-সংখ্যা লিখিত না থাকায় সাকুল্যে কতগুলি বই বিক্রয় হয়েছে বলা সম্ভব নয়। তাই গ্রন্থখানির বৈশিষ্ট্য ও মহার্ঘ্যতা বিবেচনা করলে উপেক্ষিতা বলেই ধরতে হয়। এমন হওয়ার কারণ দুর্বোধ্য নয়। সাধারণ পাঠকের গল্পগ্রাসী ক্ষুধা তে-আঁঠিয়া তাল প্রত্যাশা করে। লিপিকা আদৌ সে জাতের নয়। এমন-কি একে ছোটগল্প বলাও চলবে না। আর চললেই বা কী লাভ হত, কারণ ছোটগল্পে বইয়ের বিক্রয় আশাজনক নয়। পাঠকে মাসিক পত্রে ছোটগল্প পড়ে, বই হয়ে প্রকাশিত হলে কাছে ঘেঁষতে চায় না। তাই বাধ্য হয়ে অনেক লেখক ছোটগল্প ও উপন্যাসের আপসে এক-শ্রেণীর 'মোরগরু' জাতীয় রচনা করতে শুরু করেছেন। পাঠকে ভোলে কিনা জানি না, তবে দীর্ঘকাল নিশ্চয় ভুলবে না, ততদিনে বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ্ ছোটগল্প জাত-খুইয়ে বসে থাকবে। পাঠকে গল্প পছন্দ করে তবে তা একটানা হবে, বিভিন্ন গল্পের রস থেকে রসান্তরে সংক্রমণে তার মন দ্বিধাগ্রস্ত। এমন পাঠকের কাছে থেকে লিপিকার সমাদর প্রত্যাশা করা উচিত নয়। লিপিকার রচনাগুলি আয়তনে ছোটগল্পের চেয়েও ছোট, আর গল্পের রস অধিকাংশ রচনাতেই নেই। লিপিকা ভাঙা আয়নার টুকরা, একখানাই বটে, তবে এখন অনেকখানা হয়ে ছড়িয়ে পড়ে বিচিত্রকে প্রতিবিম্বিত করছে।

এ তো গেল লিপিকা কী নয় তার বর্ণনা, এবারে দেখা যাক এর

মৌলিক গুণ কী, তাতে করে আগের বক্তব্য আরও বিশদ হয়ে উঠবে। রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ ছোটগল্প লঘু তুলির টানে অঙ্কিত, এখানে সে টান লঘুতর হয়েছে। সে টান এত আলগোছে টানা যে মনে হয় এগুলো তুলির ছবি নয়, পেন্সিলের স্কেচ ; এ-সব রেখা বিরল, বর্ণ বিরল, বিষয় বিরল জাপানী ছবির সগোত্র। পূর্ণিমার আকাশে অতি উর্ধ্বে উড্ডীয়মান টিট্টিভ পক্ষীটি যেমন রেখামাত্র অথচ দৃষ্টিগোচর, তার ডাকটি শব্দের আভাসমাত্র অথচ শ্রুতিগোচর, লিপিকার অধিকাংশ রচনা ঠিক তেমনি। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, এগুলি গদ্যকবিতায় পৌঁছবার পথে প্রথম পদক্ষেপ ; ইচ্ছা করলে বলতে পারতেন লিপিকা রচনা কালে যে গানের ধারা অবিচ্ছিন্ন স্রোতে প্রবাহিত হচ্ছিল এগুলি গদ্যে তাদেরই শেষ পদক্ষেপ, কারণ গদ্যকে এর চেয়ে বর্ণবিরল, রেখাবিরল, বিষয়বিরল করা বোধ করি আর সম্ভব নয়। বস্তুতঃ এদিক থেকে বিচার করলে গদ্য কবিতার চেয়ে গান-গুলোর সঙ্গে এদের আত্মীয়তা ঘনিষ্ঠতর। গদ্য কবিতাতে সূক্ষ্ম তুলির কাজ আছে সত্য, কিন্তু সে কাজ খাঁটি সোনার ভারী অলংকারের উপরে। গদ্য কবিতার প্রধান ঐশ্বর্য অলংকার, লিপিকার প্রধান ঐশ্বর্য অলংকারবিরলতা ; গদ্য কবিতার আর-একটি ঐশ্বর্য ভাষার ইন্দ্রজাল, আর লিপিকা হচ্ছে বর্ষণবিরত আকাশের সেই ইন্দ্রধনু মিলিয়ে যাওয়ার পূর্ব মুহূর্তে আপন বর্ণগুলিকে যে বর্ণাতীত করে তুলেছে।

"তুই মানুষের মাঝে যে অসীম আকাশ সেখানে সব চুপ, সেখানে কথা চলে না। সেই মস্ত চুপকে বাঁশির সুর দিয়ে ভরিয়ে দিতে হয়। অনন্ত আকাশের ফাঁক না পেলে বাঁশি বাজে না।"

—মেঘদূত, লিপিকা

"জীবন লয়ে যতন করি
যদি সরল বাঁশি গড়ি,
আপন সুরে দিয়ে ভরি
সকল ছিদ্র তার।"

—গীতাঞ্জলি, ১২৫

এ দুই এক জাতের রচনা, অন্তরে পদ্য বাইরে গদ্য। গদ্য কবিতায় ও লিপিকায় এমন আত্মীয়তা আছে বলে মনে হয় না। কবির নিবাস উত্তরায়ণের পশ্চিম বারান্দায় বসলে তরুবিরল দিগন্তে বর্ণবিরল সূর্যাস্ত-রেখার সঙ্গে লিপিকার শিল্পধর্মের মিল; তার পরেই আকাশ ওঠে সোনালি তারার বিপুল সমারোহে, সেই গদ্য কবিতার সম্ভার। এখন বুঝতে পারা যাবে কেন গদ্য কবিতার অনুরাগী পাঠক জুটেছে, জোটে নি লিপিকা কাব্যের। অধিকাংশ পাঠক সোনার দরের সঙ্গে সোনার ভার চায়। যে রচনা নিজের ভারকে ত্যাগ করেছে আর দরকে লুকিয়েছে—তার কী আশা!

আরও এক বাধা আছে। কবি লিপিকার রচনাগুলিতে তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত ক'রে সাজিয়েছেন। কবি-কৃত বিভাগ লোকে শিরোধার্য ক'রে নিয়েছে, তবে তাদের মন মেনেছে কিনা সন্দেহ। কবি-কৃত এই রকম বিভাগ আছে গীতবিতান গ্রন্থে, প্রেম পূজা প্রভৃতি প্রকৃতি পর্যায়ভাগে। এ রকম বিভাগ যুক্তিসম্মত কি না সন্দেহ। যে-সব গান তিনি এক পর্যায়ে ফেলেছেন, অপর পর্যায়ভুক্ত করলে তাদের রসের কোনো ব্যতিক্রম ঘটে না। বস্তুতঃ তাঁর অধিকাংশ গান এরকম জল-অচল কোঠায় ভাগ করা অসম্ভব। কপি-রাইটের সীমানা অতিক্রম করলে এ-সব গান আবার নূতন পর্যায়ে সজ্জিত হবে নিঃসন্দেহ। তবে লিপিকার রচনায় এ সমস্যা তেমন গুরুতর নয়। তৃতীয় পর্যায়ের রচনা অন্য সমস্ত রচনা থেকে ভিন্ন স্বাদের।

ঘোড়া, কর্তার ভূত ও তোতা-কাহিনী স্যাটায়ার, তাদের রস কিঞ্চিৎ কটু। আর স্বর্গমর্ত একটি অভীষ্ট নাটকের ভূমিকা। এগুলো এ বইয়ে না থাকলেই সমগ্রর রস অখণ্ডিত থাকতো, আর যদি এ বইয়ে দেওয়াই হ'ল তবে তাদের জন্য নূতন কোঠা নির্দিষ্ট করলেই মানানসই হত। আগে এদের নিয়ে আলোচনা করা যাক, পরে খাস লিপিকায় প্রবেশ করলেই চলবে।

স্বর্গমর্ত যে অলিখিত নাটকের ভূমিকা তার সম্বন্ধে নিশ্চয় করে

কিছু বলা সম্ভব নয়, তবে ভূমিকা প'ড়ে মনে হয় যে দেবতাদের কাছে হঠাৎ স্বর্গ অবাস্তব হতে শুরু করেছে, কেননা তাঁরা অনুভব করছেন যে মর্তের সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় স্বর্গ নিরর্থক হয়ে পড়েছে, তারা যেন নির্বাসন ভোগ করছেন। স্বর্গকে পুনরায় স্বপ্রতিষ্ঠিত করতে হলে তাঁদের মর্তে জন্মগ্রহণ আবশ্যক। যখন এই ভূমিকা লিখিত হচ্ছিল তখন আমরা শান্তিনিকেতনে। শুনতে পেলাম কবি একটি নূতন নাটক রচনা করছেন। আমাদের উৎসাহের অন্ত নাই। কিন্তু উৎসাহ পরিণামে পৌঁছতে পারল না, ভূমিকা পর্যন্ত এসেই কবির উৎসাহ থেমে গেল। যতদূর মনে পড়ে এই প্রসঙ্গে "আজ তারায় তারায় দীপ্তশিখার অগ্নি জ্বলে" গানটি লিখিত হয়েছিল, এই গানটির মধ্যেই নাটকটির আসল কথা আছে—এখনো সেই ধারণা পোষণ করছি।

স্বর্গ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ধারণা সাধারণের থেকে কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্র। মর্ত সম্পর্কহীন স্বর্গ অসম্পূর্ণ, স্বর্গে মর্তে মিলে তার পূর্ণতা। এই ভাবটির সম্পূর্ণ প্রকাশ 'স্বর্গ হইতে বিদায়' কবিতায়। স্বর্গ তাঁর কাছে মনোরম খেলনাপাত্র, "আমরা দুজনা স্বর্গ খেলনা গড়িব না ধরণীতে।" এইভাবের উদাহরণ অজস্র ছড়িয়ে আছে তাঁর রচনার মধ্যে।

ঘোড়া, কর্তার ভূত ও তোতা-কাহিনীর মধ্যে শেষেরটি সমধিক প্রসিদ্ধ এবং খুব সম্ভব কবির ব্যঙ্গরচনার মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এর বিষয়টা হচ্ছে বিদ্যার চেয়ে শিক্ষার আয়োজন বেশি হলে তার ভারে ও নীরসতায় ছাত্র শুকিয়ে মারা যায়। বিশেষভাবে আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা এর লক্ষ্য হলেও যে-কোনো সমাজ সম্বন্ধে প্রযোজ্য হতে পারে।

কর্তার ভূতের ভূত হচ্ছে ভূত বা অতীতকাল। যে-সমাজ বর্তমান ও ভবিষ্যতের উপর অতীতকে প্রাধান্য দেয়—"তন্ত্রমন্ত্র সংহিতায় [তার] চরণ না সরে"; তার যে দশা হতে পারে তাই এখানে বিম্বিত। এরও প্রাথমিক লক্ষ্য ভারতবর্ষ, কারণ এ দেশের প্রাচীন ইতিহাস দীর্ঘ-কালের হওয়ায় তার বোঝা দুর্বহভাবে আমাদের ঘাড়ে চেপে ধরেছে।

যে-সব দেশের ইতিহাস সবে আরম্ভ হয়েছে এখনোও কর্তা সেখানে ম'রে ভূতত্ব প্রাপ্ত হয় নি। তার উপরে আমাদের প্রাচ্যস্বভাব জড়ত্ব-ধর্মী হওয়ায় ভূতে সুবিধা পেয়েছে। কালে কালে এ দেশে মোগল পাঠান ইংরেজ অনেক ভূতের রোজা এসেছে, বিশেষ সুবিধা করতে পারে নি। কারণ ভূত যদি-বা ছাড়তে চায় আমাদের সাহস হয় না তাকে ছাড়তে। কোনো কোনো দুঃসাহসী হাত জোড় ক'রে বলে, 'কর্তা, এখনো কি ছাড়বার সময় হয় নি?' কর্তা বলেন, 'ওরে অবোধ, আমার ধরাও নেই, ছাড়াও নেই, তোরা ছাড়লেই আমার ছাড়া।' তারা বলে, 'ভয় করে যে কর্তা।' কর্তা বলেন, 'সেইখানেই ভূত।' নূতন কালের সঙ্গে মোকাবিলা করবার সাহসের অভাবেই ভূতের প্রকোপ। রবীন্দ্র-পরিভাষায় এর নাম "অচলায়তন"। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা আবশ্যক যে সমাজে ঐতিহ্যের সূত্র দীর্ঘ নয়, তার ঘাড়ে ভর করে ভূত কালের বদলে বর্তমান কাল, অর্থাৎ কর্তার ভূতের বদলে স্বয়ং কর্তা। তাদের ব্যাধি আবার আর এক রকমের—উদাহরণ অচলায়তন নাটকের শোণপাংশুর দল। অচলায়তনিকদের ঘাড়ে যদি কর্তার ভূত, এদের ঘাড়ে স্বয়ং কর্তা। বর্তমান কালের বেশি না জানাটাও একপ্রকার ব্যাধি। ঘোড়া স্পষ্টতঃ ভারতবর্ষীয় প্রকৃতি। তার মধ্যে স্থিতি অপ্‌ তেজের চেয়ে মরুৎ ব্যোমের পরিমাণ অধিক, তাই সংসারের কাজে সে বড় লাগে না। এ পর্যন্ত বেশ সরল। তার পরেই কিঞ্চিৎ অস্পষ্টতা। মানুষ কারা? ঘোড়ার মুখে লাগাম পরাবার উদ্দেশ্য কী? তাকে আস্তাবলে টেনে নেওয়াই বা কেন। আর ঘোড়ার পায়ে বাঁধন পরিয়ে তাকে সৃষ্টিকর্তার দৃষ্টিতে হেয় প্রমাণ করাই বা কেন? খুব সম্ভব ভারতের তদানীন্তন বৃটিশ শাসকব্যূহ কর্তৃক দূরদেশবাসী বৃটিশ অধিকর্তাদের কাছে ভারতকে স্বায়ত্ত-শাসনের খোলা মাঠে ছেড়ে দেওয়ার আপত্তিটাই এখানে ব্যঙ্গের লক্ষ্য। ব্যঙ্গ রচনার মধ্যে লক্ষ্যের দ্বিত্ব ঘটলে সেই দ্বৈতের ফাঁক দিয়ে শক্তির অনেকটা অপচয় ঘটে। এখানে সেইরকম ঘটেছে কি?

এই ক'টি রচনা বাদ দিলে আর সমস্ত রচনাই প্রধানতঃ লিরিক-ধর্মী, তবে কোনো কোনো রচনায় রূপকথার ছোঁয়াচ আছে, কোনো কোনো রচনায় লৌকিক গল্পের; তবু তাদের লিরিকত্ব নষ্ট হয়েছে বলে মনে হয় না।

ছেলেবেলা গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে বাল্যকালে সরু করে সুপুরি কাটায় তাঁর দক্ষতা ছিল, তবে বয়স বাড়াতে সুপুরি কাটার প্রয়োজন শেষ হলে সেই সরু কাজের দক্ষতা অন্যত্র লাগিয়েছেন। সেই সরু কাজের পরিচয় রবীন্দ্র-সাহিত্যের সর্বত্র, রূঢ়তা ও স্থূলতার স্থান তাতে নেই। কিন্তু এই সরু বা সূক্ষ্ম কাজের চরম বোধ করি লিপিকার রচনাগুলিতে। গীতাঞ্জলি প্রভৃতি গীতাখ্য কাব্যত্রয়েও সূক্ষ্ম কাজ আছে, তবে স্বল্পায়ত গান স্বভাবতই সূক্ষ্ম কাজের স্থান। গদ্য সম্বন্ধে এ কথা এমন নিঃসংশয়ে বলা চলে না। গদ্যের আসর মস্ত বলেই তাতে সরু মোটা বিচিত্র রূপ প্রবেশের দাবি জানায়। লিপিকায় মোটা ও রূঢ় সরাসরি নিষিদ্ধপ্রবেশ। উদাহরণ-স্বরূপ যে-কোনো রচনা গ্রহণ করা যেতে পারে। পরীর পরিচয় রচনাটি বিচার করা যাক। ওর শেষ ছত্রে পরীর যথার্থ পরিচয় লিপিবদ্ধ—"রাজপুত্র বললে, 'চলে গিয়ে পরী আপন পরিচয় দিয়ে যায়, আর তখন তাকে পাওয়া যায় না।' অর্থাৎ "কাছে যবে ছিল পাশে হ'ল না যাওয়া। চলে যবে গেল তারি লাগিল হাওয়া।" এই মন্তব্যটি নিয়ে এ পর্যন্ত সংসারে অসংখ্য কাব্য কবিতা নাটক নভেল ছোটগল্প লিখিত হয়েছে কিন্তু পরীর পরিচয়ের মতো এমন সূক্ষ্ম আকারে লিখিত হয়েছে বলে মনে হয় না। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের গানে এমন সূক্ষ্ম রস যথেষ্ট আছে—তবে আগেই তো বলেছি গান সূক্ষ্ম রসের সহজসিদ্ধ স্থান।

আর-একটি উদাহরণ লওয়া যাক। লিপিকার সন্ধ্যা ও প্রভাত-এর সঙ্গে প্রথম যৌবনে লিখিত পুষ্পাঞ্জলি (গ্রন্থপরিচয়, জীবনস্মৃতি : রবীন্দ্র-রচনাবলী, সপ্তদশ খণ্ড, দ্রষ্টব্য) মিলিয়ে পড়লেই দুই রসের প্রভেদ বুঝতে পারা যাবে। পুষ্পাঞ্জলি ঠিক স্থূল পর্যায়ের রচনা নয়,

তবে বিস্তারিত বিলাপ, সদ্যপ্রাপ্ত আঘাতে বিচলিত লেখনী সব লক্ষ্যাভিমুখী থাকে নাই, ইতস্তত নড়বার ফলে অনেক দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে বাধ্য হয়েছে যার অনেকটাই অবান্তর। অনাবশ্যক দৈর্ঘ্যও একপ্রকার স্থূলতা। তার পরে চৌত্রিশ বছরের মধ্য দিয়ে চোলাই হয়ে এসে অপরিহার্যতম অতিসূক্ষ্ম রূপ নিয়েছে সন্ধ্যা ও প্রভাত রচনাটিতে। কৃতঘ্ন শোক, সতেরো বছর, এবং প্রথম শোক রচনাগুলিও বোধ করি পুষ্পাঞ্জলির প্রেরণাজাত। কিন্তু কী তফাৎ! গোড়ায় "যা ছিল শোক আজ তাই হ'য়েছে শান্তি"। শোক যখন শান্তিতে পরিণত হয় তখনই শিল্পসৃষ্টির অনুকূল অবস্থা—"Emotions recollected in tranquility"।

এবারে আর-এক শ্রেণীর কয়েকটি রচনা লওয়া যাক। প্রাণমন, আগমনী ও কথিকা। ইচ্ছা করলে এদের রূপক পর্যায় বলা যায়। মনের তুলনায় প্রাণের অস্তিত্বের দলিল অনেক বেশি পাকা, বয়সেও বড় সে, তবু কেন জানি না মনটা সর্বত্র মোড়লি ক'রে বেড়ায়, প্রাণের উপরেও। এই রচনাগুলিতে পাত্র তিন জন—প্রাণ, মন, আর কবি। গাছপালার মধ্যে প্রাণের আদিতম ও অকৃত্রিমতম প্রকাশ; মানুষে দু-ই আছে তবে কোনোটাই ঠিক বিশুদ্ধ নয়, দুয়ে মিশোল। কিন্তু কোনো কোনো শুভক্ষণে মানুষের যখন দৃষ্টি পড়ে বটগাছটার দিকে, প্রাণের অনাবিল প্রকাশে তাকে চমকে দেয়, অমনি শুরু হয়ে যায় মনের সঙ্গে বাক্‌যুদ্ধ। সুন্দরের বীণায় মূল সুরটি বেঁধে রেখে দিয়েছে প্রাণ; নানা স্বর সংকটের মধ্যেও সে ঘোষণা করেছে সুন্দরের জয়, আনন্দের জয়। সুন্দর বলো আনন্দ বলো, সবই তো প্রাণের বিভূতি, মনের সঙ্গে তাদের তেমন বনিবনাও নেই। মনটা বিষয়ী, সঞ্চয়ের সাতমহলা বাড়ি তুলে ভাবে খুব মস্ত হল, ভুলে যায় যে আকাশ ও পৃথিবী আরও অনেক মস্ত। এমন সময়ে প্রাণের প্রথম প্রকাশ নিয়ে এসে উপস্থিত হয় একটি শিশু। বিষয়ী মন বুঝতে পারে না কেন চরাচর আগমনীর অর্ঘ্য সাজায় ঐ ক্ষুদ্র শিশুটির উদ্দেশে

প্রাণের জয়ঘোষণা সত্ত্বেও বুঝতে পারা যায় যে এই ক'টি রচনাতে মনেরই জয় হয়েছে। কবি এখানে মনশ্চালিত ভাবুক, প্রাণপ্রেরিত শিল্পী নন।

আগে পরীর পরিচয় সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এটি স্পষ্টতঃ রূপকথার ছাঁচে তৈরি। এইসঙ্গে আরও কয়েকটির উল্লেখ করা যেতে পারে, যথা, সিদ্ধি, রথযাত্রা, মুক্তি প্রভৃতি। রূপকথা ধাঁচের রচনার প্রতি রবীন্দ্রনাথের গোড়া থেকেই ঝোঁক ছিল। সোনার তরী কাব্যের বিম্ববতী, রাজার ছেলে ও রাজার মেয়ে, নিদ্রিতা, সুপ্তোত্থিতা এবং গল্পগুচ্ছের একটি আষাঢ়ে গল্প (যার নাট্যরূপ তাসের দেশ) এই শ্রেণীর। রূপকথা রচনায় সূক্ষ্ম তুলির প্রয়োজন ; একটু এদিক-ওদিক হলেই রসভ্রষ্ট হওয়ার আশঙ্কা। বাস্তব ও অসম্ভবের মধ্যে সন্তর্পণে তাকে পথ কেটে চলতে হয়। রূপকথা আর কিছুই নয়, বাস্তবের সোনার খাঁচায় অসম্ভবের বুনো পাখি। এ কাজ কঠিন। সূক্ষ্মের উপরে পুরোপুরি দখল রাখতে হয় বলেই কঠিন। অবনীন্দ্রনাথ, যিনি সরু তুলির কাজে দক্ষ, রূপকথার জাদুকর।

এবারে আর-এক ধরনের রচনার আলোচনা করা যাক। অস্পষ্ট, পট, নতুন পুতুল, উপসংহার, পুনরাবৃত্তি, প্রথম চিঠি প্রভৃতি লৌকিক গল্পের ছোঁয়াচ লাগে। এগুলি পূর্ণতর আকার নিয়ে গল্পগুচ্ছের ঐশ্বর্য বৃদ্ধি করতে পারত, কিংবা আর-একটু ভোল বদলিয়ে এবং অলংকারে সমৃদ্ধ হয়ে গদ্য কবিতার শ্রেণীকে দীর্ঘতর করতে পারত। মাঝখানকার ঠিক সংকীর্ণ পথ দিয়ে চলাতেই এদের অসামান্যতা। এতক্ষণে আমরা লিপিকার তৃতীয় পর্যায়ের আলোচনা শেষ করলাম। এবারে দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রবেশ করা যেতে পারে।

এই পর্যায়ের প্রথম রচনাটির নাম গল্প। এখানেও কবি শিল্পী নন, ভাবুক। এর মূল কথাটি হচ্ছে "বিধাতার রচা ইতিহাস আর মানুষের রচা কাহিনী এই দুইয়ে মিলে মানুষের সংসার।" যাবতীয় সাহিত্যের ভূমিকাস্বরূপ এই ছত্রটিকে উদ্ধার করা যেতে পারে।

মীনু গল্পটির মীনু পলাতকা কাব্যের ফাঁকি কবিতাটির বিনুকে স্মরণ করিয়ে দেয়। দুটিই প্রায় একই সময়ের রচনা। পুত্রহীনা রুগ্‌ণা যুবতীর বেদনায় গল্পটি পূর্ণ। রুগ্‌ণা যুবতী রবীন্দ্র-সাহিত্যে একটি প্রধান উপাদান জুটিয়েছে। মধ্যবর্তিনী, নিশীথে, দুই বোন, মালঞ্চ, এমন আরও নাম করা যেতে পারে। নামের খেলা রচনায় শিশু ভাগনে ও বয়স্ক মামার একই দশা, দু'জনেই নামের খেলার নেশায় উন্মত্ত। তবে ভাগনে শিশু বলে তার অবস্থা করুণার উদ্রেক করে, মামার অবস্থা করে হাস্যের। সুয়োরানীর সাধ দুয়োরানীর মতো দুঃখী হবে—কিন্তু রাজবাড়িতে বাস করে কেমনভাবে তা সম্ভব। দুঃখও যে সাধনা করে পেতে হয় রাজসোহাগিনী তা জানবে কেমন করে! বিদূষক চিরকাল রাজসঙ্গী, সেটা তার দুর্ভাগ্য আর রাজার সৌভাগ্য। হাসি হচ্ছে তার সমালোচনা social criticism। দুষ্মন্ত যদি বিদূষককে আর-একটু বিশ্বাস করত, শকুন্তলার সঙ্গে প্রণয়কে পরিহাসবিজল্পিতম্ বলে ঢাকা না দিত, তবে দুষ্মন্ত শকুন্তলার কাহিনী অন্য আকার ধারণ করত। দুর্বাসার অভিশাপে পিতারও সাধ্য ছিল না বিদূষকের চোখকে ঠকায়। কালিদাস এ কথা জানতেন বলেই শকুন্তলা প্রত্যাখ্যান-কালে বিদূষককে রঙ্গমঞ্চে আনেন নি। কাঞ্চীরাজের সভা থেকে বিদূষক বিদায় প্রার্থনা করেছে—কেননা রাজার যা অবস্থা তাতে তিনি social criticism-এর অতীত।

ভুল স্বর্গ ও রাজপুত্তুর রচনা দুটি রূপক ও রূপকথার মিশোলে তৈরি। লৌকিক গল্পের লৌকিকতার ঊর্ধ্বে তাদের স্থান। শিল্পী মাত্রেই ভুল স্বর্গের কারিগর, তারা যা রচে কেজো লোকের বিচারে তা অকাজ। কোনো কোনো মেয়ে হয়তো বোঝে, কারুকলাকে নয়, কারিগরকে। অকর্মার প্রতি তাদের অহৈতুক টান।

লিপিকার প্রথম পর্যায়ের সমস্ত রচনাই বিশুদ্ধ লিরিক। এগুলি কাল হিসাবেও প্রাথমিক। আমার মনে হয় এগুলি লিখতে গিয়ে দেখলেন এই শ্রেণীর রচনা শুধু ভাবের বাহন হয়ে থাকবে কেন,

এদের দিয়ে ঘটনা ঘটানো এবং গল্প বলানোই বা চলবে না কেন? নৃত্যনাট্য রচনার বেলাতেও এমনি বিবর্তন ঘটেছিল। বসন্ত, শেষবর্ষণ, নবীন প্রভৃতি প্রথম দিকের রচনাগুলি গানের মালার সঙ্গে নাচ, কখনো কখনো গানে গানে জুড়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে দু'চারটে বাক্য। তারপরে অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সঙ্গে নৃত্যকে ঘটনা ও কাহিনীর বাহন করে তুললেন, শাপমোচন, চিত্রাঙ্গদা, চণ্ডালিকা, তাসের দেশ প্রভৃতি। লিপিকার প্রথম পর্যায়ের সঙ্গে পরবর্তী দুই পর্যায়কে মিলিয়ে পড়লে ঐ রকম একটা বিবর্তন ও পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়।

শেষে প্রশ্ন দাঁড়ায় লিপিকার বৈশিষ্ট্য কি? আগে যা বলেন নি এমন কোনো নূতন কথা লিপিকায় নেই। আর সাহিত্যে নূতন কথাই বা কোথায়? দেশ ও কালের প্রভাবে পুরাতন নূতন হয়ে দেখা দেয়—এই তো সাহিত্য। অবশ্য কোনো কোনো রচনায় ছায়া পূর্বগামিনী—পরে যা আসবে তারই পূর্বছায়াপাত। কাজেই ভাবের নূতনত্বে এর বৈশিষ্ট্য নয়। অভিনব এর টেকনিক বা লিপিকুশলতা। অলংকার-বিরল, বর্ণ-বিরল, বিষয়বিরল, অতি সূক্ষ্ম রেখামাত্রে আলগোছে অঙ্কন; অতিপ্রয়োজনকে রক্ষণ, অনতি-প্রয়োজনকে বর্জন, বিশেষণবাহুল্য বিসর্জন; সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রেখার অনুধাবন; এবং বিন্দুতে সিন্ধু প্রদর্শন—এই হচ্ছে লিপিকার টেকনিকের অভিনবত্ব। লিপিকা গদ্য কবিতার প্রথম পদক্ষেপ নয়, গীতাঞ্জলি-গীতালির গানগুলির শেষ পদক্ষেপ, কারণ ভাষাকে আর দৃশ্যাতিরিক্ত ক'রে তোলা বোধ করি সম্ভব নয়।

রবীন্দ্রসাহিত্যে রুগ্‌ণা নারী

বিপুল রবীন্দ্র-সাহিত্যে গদ্যে ও পদ্যে রুগ্‌ণা নারীর কাহিনী অনেক আছে, এখানে তাদের সকলের কথা আমাদের আলোচ্য নয়। বিশেষ কয়েকটি কাহিনী নির্বাচিত করে নিয়েছি, এই কাহিনী ক'টি সমস্তই গদ্যে লিখিত, তিনটি ছোট গল্প, দুটি ছোট উপন্যাস যাকে আমি অন্যত্র খণ্ডোপন্যাস বলেছি। এই কটিতেই দেখা যাবে যে স্ত্রী রুগ্‌ণা হয়ে পড়লে, অনেক স্থানেই জীবনের আশা আর নেই মনে করে স্বামীকে পুনরায় দার পরিগ্রহ করবার জন্যে পীড়াপীড়ি করেছে; কখনো বা অন্য অবিবাহিত নারী ঘটনাচক্রে এসে পড়েছে; তাদের কেউ কেউ দূর সম্পর্কীয়া হলেও বিবাহে বাধা নেই; স্বামী স্ত্রীর মধ্যে এই সব নারী উৎক্ষিপ্ত হয়ে এসে পড়ে নিদারুণ প্রণয়-সঙ্কট সৃষ্টি করে তুলেছে। মোটামুটি কাঠামোটা এই রকম, তবে অবস্থা ভেদে রূপ ভেদ। আর অধিক অগ্রসর হওয়ার আগে গল্প ও উপন্যাসগুলির নাম ও রচনাকাল উল্লেখ করছি।

মধ্যবর্তিনী, ১৮৯৩
নিশীথে, ˙৮৯৫
দৃষ্টিদান, ১৮৯৮-৯৯
দুই বোন, ১৯৩৩
মালঞ্চ, ১৯৩৪

প্রথম তিনটি ছোট গল্প, শেষের দুটি ছোট উপন্যাস।

এগুলির রচনাকাল অনুধাবন করলে দেখা যাবে যে ছোট গল্প রচনার সূচনাকাল থেকে শুরু হয়ে কবি জীবনের শেষ পর্যন্ত চলে এসেছে, মাঝে মাঝে কালের ব্যবধান, প্রথম তিনটি ও শেষ দুটির মাঝে দীর্ঘকালের, ত্রিশ বছরের উপরে ব্যবধান। এক্ষেত্রে দীর্ঘ ব্যবধানটা বিশেষ অর্থবহ।

যখন কোন একটা theme বা কথাবস্তু লেখককে পেয়ে বসে তার সমস্ত সম্ভাবনাকে নিঃশেষে চুকিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত তার ছুটি মঞ্জুর হয় না। এ এক রকম ভূতে পাওয়া। ঝাড়-ফুক দেওয়া আরম্ভ হলে ভূতে নানা রকম কীর্তিকলাপ দেখায় তারপরে যখন যেতে বাধ্য হয় বটগাছের ডালটা ভেঙে দিয়ে প্রস্থানের প্রমাণ রেখে যায়। মালঞ্চ উপন্যাসে ভূত পালিয়েছে তবে যাওয়ার আগে নীরজাকে শেষ করে দিয়ে গিয়েছে।

এখন, এই যে একটি বিশেষ theme বা কথাবস্তু লেখককে দীর্ঘকাল ছায়ার মত অনুসরণ করেছে, নানা বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে তার কলমকে চালিত করেছে এর মূলে কোন গভীর মনস্তত্ত্বঘটিত রহস্য আছে কিনা বলতে পারি না। তবে অনেক সমালোচক কথাবস্তু বিশেষের পৌনঃপুনিক আবর্তন দেখে মনস্তত্ত্বের জটিল রহস্যের সন্ধান পেয়ে থাকেন বলে শুনেছি। তাঁরা বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করুন, আমার তাতে প্রয়োজন নেই। আমার উদ্দেশ্য এই সব বিচিত্র খেলা কি রকম জমেছে তারই বর্ণনা। সে তো গল্পগুলোর মধ্যেই আছে আবার কেন? আবার এই জন্যে যা চল্লিশ বৎসর কালের মধ্যে ছড়িয়ে আছে তাদের পাশাপাশি এনে দাঁড় করিয়ে দিলে পরস্পরের সান্নিধ্যে ঘনতর হয়ে নূতন অর্থ প্রকাশ করতে পারে এই আশায়।

সুস্থ মানুষ এবং রুগ্‌ণ মানুষের মধ্যে, বিশেষ সে রোগ যদি দীর্ঘ হয়ে জীবনেচ্ছা নষ্ট করে দেয় তবে একটা গুরুতর পরিবর্তন ঘটে, সে পরিবর্তন শারীরিক সীমা ছাড়িয়ে মানসিক সীমান্ত অবধি পৌঁছায়। এ পরিবর্তন কেবল মাত্রাগত নয় গুণগত। তখন মানুষের কাছে অসাধ্য সাধ্য মনে হয়, অদেয়কে দেয় মনে হয়, রক্ত-মাংসের দাবি দুর্বল হয় বলেই প্রকৃতির অন্তর্নিহিত ভাবটি তার কাছে তখন অতিশয় সহজ ও স্বাভাবিক বলে মনে হয়। আবার সেই রুগ্‌ণ ব্যক্তিটি যদি পত্নী হয় তবে তার মনে হয় স্বামীর জন্য বড় একটা ত্যাগ স্বীকারের দ্বারাই জীবনটা স্পৃহনীয় উপসংহারে এসে থামুক। হায় অবোধ

নারী বুঝিতে পারে না এ সমস্তই ব্যাধির ব্যাধক্রিয়া—যে মৃগটি তার লক্ষ্য বাস্তবক্ষেত্রে সে-ই হয়ে দাঁড়াবে পরম বিচ্ছেদের স্বর্ণমৃগী। এই মনোভাবের ছলনায় পড়ে রুগ্ণা হরসুন্দরী "একটি নোলকপরা অশ্রুভরা ছোটখাটো মেয়ের সহিত" স্বামীর বিবাহ দিল। তখন সে রোগমুক্ত বটে রোগের মনস্তত্ত্বমুক্ত নয়। তারপর নিবারণ নূতন বধূতে আসক্ত হয়ে উঠল ততদিনে রক্তমাংস তার স্বাভাবিক দাবির বাঁশ গাড়ি করেছে হরসুন্দরীর দেহে মনে। এবারে অদৃষ্ট নিষ্ঠুর রসের খেলায় অক্ষপাত শুরু করে দিল। কিন্তু অদৃষ্টের উপরে বিধাতা, একটি মৃত সন্তান প্রসব করে শৈলবালা মারা গেল। হরসুন্দরী আবার স্বামীর শয্যায় যথাস্থানে শায়িত হল—"কিন্তু ঠিক মাঝখানে একটি মৃত বালিকা শুইয়া রহিল, কেহ তাহাকে লঙ্ঘন করিতে পারিল না।" বিষবৃক্ষে কুন্দনন্দিনীর মৃত্যু উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছেন যে কুন্দনন্দিনী মরলো বলেই মনে করা উচিত হবে না যে নগেন্দ্র ও সূর্যমুখীর আবার মিলন ঘটলো, তাদের মধ্যে কুন্দনন্দিনীর ছায়া। কুন্দকে বিবাহ করে নগেন্দ্রনাথের মতো শৈলকে বিবাহ করে নিবারণও আবিষ্কার করলো যে সকল সুখেরই সীমা আছে, হরসুন্দরীও। সূর্যমুখীর দুঃখভোগ আগেই হয়ে গিয়েছে, হরসুন্দরীর আরম্ভ হল পরে; দুজনেই বড় ত্যাগ স্বীকার করতে চেয়েছিল, তার জন্যে হরসুন্দরীর প্রয়োজন ছিল নিদারুণ রোগের, তার কাজের জন্য সে সম্পূর্ণ দায়ী নয়, সূর্যমুখী স্বচ্ছ ও শুদ্ধচিত্তে স্বামীর বিবাহের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। তুলনাটা বেশি দূর টেনে নেওয়া উচিত হবে না, কারণ হরসুন্দরী সূর্যমুখী নয়।

নিশীথে গল্পের নায়ক দক্ষিণাচরণবাবুর প্রথম পক্ষের স্ত্রী অনারোগ্য কঠিন ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে হরসুন্দরীর মতোই স্বামীকে অনুরোধ করলো সে যেন আর একটি বিবাহ করে। নিবারণের মতো তিনিও কথাটা প্রথমে গ্রাহ্য করলেন না। ব্যাধির সূত্রে ডাক্তার এলো, ডাক্তারের ঘরে অবিবাহিত বয়ঃপ্রাপ্তা কন্যা মনোরমা। দক্ষিণাবাবুর

অগোচরে ক্রমে ক্রমে মনোরমা অধিকার করতে লাগলো দক্ষিণা-চরণের হৃদয়। একদিন মনোরমা রুগ্ণাকে দেখতে এলো, ঘরের আলো আঁধারিতে তাকে দেখে রুগ্ণা স্ত্রী বলে উঠল ও কে গো! সে বুঝতে পারল মনোরমা তার স্থান অধিকার করে বসেছে, তখন মালিশের বিষাক্ত ঔষধ পান করে সমস্ত জ্বালা জুড়ালো। মনোরমাকে বিবাহ করলেন দক্ষিণাবাবু। এর পরেই আরম্ভ হল অদৃষ্টের নিষ্ঠুর খেলা। রুগ্ণা স্ত্রীর অন্তিম জিজ্ঞাসা 'ও কে গো' দুঃখের ধুয়াতে পরিণত হয়ে তার নিশীথ রাত্রির শান্তি ও নিদ্রাকে কণ্টকিত করে তুলল। দিনের বেলায় তিনি স্বাভাবিক, রাতের বেলায় 'ও কে গো' ধ্বনির কন্টক শয্যায় শায়িত। গল্পটিতে মনস্তত্ত্বের যে সূক্ষ্ম কারুকার্য আছে তা হরসুন্দরী ও নিবারণের জীবনে অসম্ভব। তারা শান্তি না হোক স্বস্তি পেয়েছে, দক্ষিণাচরণবাবুর কাছে দুটোই দুষ্প্রাপ্য। theme বা কথাবস্তু একই তবে পাত্রভেদে তার সীমা ভিন্ন।

দৃষ্টিদান রবীন্দ্রনাথের একটি পয়লা নম্বরের গল্প। কুমুর চোখের অসুখ ছিল। তার স্বামী নতুন পাস করা ডাক্তার, চোখের চিকিৎসা করতে গিয়ে স্ত্রীকে অন্ধ ক'রে ফেলল। তারপর যা অনিবার্য তাই ঘটলো। স্বামীকে আর একবার বিবাহ করতে অনুরোধ করলো। এখানেও সর্বনাশের সূত্র ব্যাধি—অন্ধত্ব ব্যাধি বই কি। এমন সময়ে তার পিসশাশুড়ির আবির্ভাব। তিনি এমন মত প্রকাশ করলেন যে, অবিলম্বে ভাইপোর বিবাহ করা উচিত এবং সঙ্গে সঙ্গে আমদানি করলেন হেমাঙ্গিনী নামে একটি ভাইঝির। কুমুর স্বামীর মন টলল, কিন্তু হেমাঙ্গিনী শৈলবালা বা মনোরমা নয়, শক্ত মেয়ে। কুমুর স্বামী যখন বিবাহ করতে যাত্রা করলো তার আগেই কুমুর দাদার সঙ্গে হেমাঙ্গিনীর বিবাহ কার্য সুসম্পন্ন হয়ে গিয়েছে। অনুতপ্ত স্বামী ফিরে এলো স্ত্রীর কাছে—কুমুর অন্ধত্ব ঘুচলো না, তবে চক্ষুষ্মান স্বামী এতদিনে যথার্থ দৃষ্টি লাভ করলো। সেই একই কথাবস্তু অদৃষ্টের ঝাপটায় নৌকাখানা জখম হ'লেও বানচাল হয় নি, শেষ পর্যন্ত কূলে

ভিড়তে সক্ষম হয়েছে। এই গেল একই কথাবস্তু অবলম্বনে লিখিত তিন স্বাদের গল্প তিনটি। এবারে খণ্ডোপন্যাস দুটি।

দুই বোন এবং মালঞ্চ বই দু'খানাকে একত্রে বিচার করা যেতে পারে, দুই বোনে যার পরিচেষ্টা মালঞ্চে তার পরিস্ফুর্তি। দুই বোনে অভীষ্টের কাছে গিয়ে বল্‌গা টেনে ধরেছেন। চোখের বালি, নৌকা-ডুবিতেও একই প্রক্রিয়া অভীষ্টের কাছে গিয়ে অনভীষ্ট বলগা টেনে ধরা। মালঞ্চে সর্বনাশের ঘোড়া নিদারুণ অন্তিম পর্যন্ত গিয়েছে—কবি কোথাও বাধা দেন নাই। সত্য কথা বলতে কি এই জন্যেই মালঞ্চ বইখানা ভারি তৃপ্তিদায়ক অন্তত: আমার তাই মনে হয়। দুই ক্ষেত্রেই কথাবস্তু এক তবে রসে ভিন্ন।

দুই বোনের প্রারম্ভে কবি লিখেছেন—"মেয়েরা দুইজাতের, কোন কোন পণ্ডিতের কাছে এমন কথা শুনেছি। একজাত প্রধানত মা, আর একজন প্রিয়া। ঋতুর সঙ্গে তুলনা করা যায় যদি, মা হলেন বর্ষা ঋতু। জলদান করেন, ফলদান করেন, নিবারণ করেন তাপ, ঊর্ধ্বলোক থেকে আপনাকে যেন বিগলিত ক'রে, দূর করেন শুষ্কতা, ভরিয়ে দেন অভাব। আর প্রিয়া বসন্ত ঋতু। গভীর তার রহস্য, মধুর তার মায়া মন্ত্র; তার চাঞ্চল্য রক্তে তোলে তরঙ্গ, পৌঁছয় চিত্তের সেই মণিকোঠায় যেখানে সোনার বীণায় একটি নিভৃত তার রয়েছে নীরবে, ঝঙ্কারের অপেক্ষায়, যে ঝঙ্কারে বেজে ওঠে সর্ব দেহে মনে অনির্বচনীয়ের বাণী।" এই কথা ক'টিকে দুই বোন এবং মালঞ্চের মর্ম বলে গ্রহণ করা যেতে পারে।

কালিদাস যখন লিখেছিলেন—

"গৃহিনী সচিবঃ সখী মিথঃ।
প্রিয় শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ।"

তখন তিনি একটি আদর্শ চিত্র অঙ্কিত করছিলেন। এই আদর্শই কণ্বের তপোবনের শকুন্তলায় এবং মারীচের তপোবনের শকুন্তলায় এক দেহে পূর্ণতা লাভ করেছিল। এ-ও আদর্শ ছিল। আবার

রবীন্দ্রনাথ যখন চিত্রাঙ্গদার চিত্র অঙ্কিত করছিলেন তখনও এই প্রিয়া ও জননীকে এক দেহে দেখিয়েছেন এ-ও আদর্শ।

পরবর্তীকালে আর তিনি এ দুইকে একত্র চিত্রিত করতে চেষ্টা করেন নি—সম্ভবতঃ তাঁর ধারণা হয়েছিল এমনটি হয় না। তখন তার বক্তব্য সৃজনের সমুদ্র মন্থনে দুই নারী জন্মগ্রহণ করে, একজন উর্বশী, আর একজন লক্ষ্মী—একজন প্রিয়া, একজন মাতা। প্রিয়া ও মাতার সমন্বয় একদেহে কোটিকে গোটিক হয়—অর্থাৎ হয় না।

আধুনিক লেখক যখন লৌকিক কাহিনী অর্থাৎ উপন্যাস লিখতে বসেন, আদর্শ ছেড়ে তাঁকে বাস্তবে নেমে আসতে হয়—তখন আঁকতে হয় শর্মিলা ও ঊর্মিমালা, নীরজা ও সরলা।

প্রত্যেক পুরুষের মনে অগোচরে এই স্বাদেরই আকাঙ্ক্ষা থাকে, তবে সামাজিক ও অর্থনৈতিক চাপে সে আকাঙ্ক্ষা অঙ্কুরের অধিক এগোতে পারে না। তা ছাড়া অধিকাংশ পুরুষের মন স্থূল তন্তুতে গড়া, সূক্ষ্ম ভেদ করতে অক্ষম যা হয় হাতের কাছে পেলেই সন্তুষ্ট হ'ল মনে করে। নিবারণের মন এই জাতের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। দক্ষিণাচরণবাবুর মন অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্মগ্রাহী—তিনি একবার কালিদাসের পূর্বোক্ত শ্লোকটি আবৃত্তি করেছিলেন আর তার পরবর্তী দুর্দশার মূলেও হয়তো ঐ শ্লোকের প্রতিক্রিয়াজাত। দুই বোন ও মালঞ্চে ঐ শ্লোকের অর্থ প্রক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে অন্তিমে পৌঁচেছে মালঞ্চে অন্তিমতমে।

শশাঙ্ক ও আদিত্যের মনে প্রিয়া ও জননীর আকাঙ্ক্ষার ফাটল দিয়ে প্রবেশ করেছে ঊর্মিমালা ও সরলা, সুযোগ করে দিয়েছে শর্মিলা ও নীরজার দীর্ঘায়ত ব্যাধি। তাই বলেছি যে কাহিনী দুটিরই কথাবস্তু এক।

অসুস্থ শর্মিলা সংসার দেখা শোনা করবার জন্যে ঊর্মিমালাকে ডেকে পাঠালো, ঊর্মিমালা তার সহোদরা এতদিন পর্যন্ত শর্মিলা সংসার দেখা শোনা করেছে, স্বামীকে জোর করে অপমানকর চাকুরি

থেকে ইস্তাফা দিতে বাধ্য করেছে, তারপর নিজের টাকা ঢেলে নূতন ব্যবসায়ে নিযুক্ত ক'রে দিয়েছে শশাঙ্ককে—অর্থাৎ সে জননীর কর্তব্য করে গিয়েছে। শশাঙ্কর নূতন ব্যবসা যখন বেশ ফেঁপে উঠেছে তখন সে অসুস্থ হয়ে পড়লো। ডাক পড়লো উর্মিমালার।

উর্মিমালা পুরুষের চিত্তে তুফান জাগানো মেয়ে, স্বভাবতঃ সে প্রিয়া জাতীয়া। উর্মির পিতা মৃত, প্রচুর টাকা। নীরদ নামে একটা অপদার্থ ব্যক্তির সঙ্গে পিতা বিবাহ স্থির করে গিয়েছিলেন। সে চলে গেল বিলাতে, ফিরে এসে হাসপাতাল স্থাপন করবে, উর্মি ও নীরদ ডাক্তার হয়ে সেখানে সেবা ও গবেষণা করবে স্থির আছে। এ হেন সময়ে উর্মি এলো দিদির সংসারে। তাকে পেয়ে শশাঙ্ক মেতে উঠ্‌ল, সেই স্বাদ পেলো এতদিন যা অতৃপ্ত ছিল। উর্মির প্রতি নিঃসপত্ন মনোযোগের ফলে শশাঙ্কের ব্যবসা ডুবলো তার আগেই উর্মির আসাতে সে নিজে ডুবু ডুবু। শর্মিলা সবই দেখছে, সবই বুঝছে। অবশেষে তিনজনে মিলে স্থির করলো যে নেপাল দরবারে শশাঙ্ক চাকরি নিয়ে যাবে, সেখানে বাংলাদেশের সামাজিক পরিবেশ থেকে দূরে তাদের হবে বিয়ে। শর্মিলা বুঝিয়েছে উর্মিমালাকে বোন সতীনের ঘর কি কেউ করে না। শেষ মুহূর্তে শশাঙ্কের পৌরুষ জাগ্রত হয়ে উঠল, না, সে পালাবে না, এখানেই বিয়ে করবে। পালালো উর্মিমালা, একখানা চিঠিতে নিজের ত্রুটি স্বীকার করে সে সমুদ্র পাড়ি দিল। গল্পটাও সেই সঙ্গে সমুদ্রে ডুবলো। এরই নাম গল্পের উপরে অনভীষ্ট হস্তক্ষেপ যে ভুল সংশোধিত হয়েছে মালঞ্চ উপন্যাসে।

মালঞ্চ উপন্যাসখানার কথাবস্তু ও কাঠামো দুইবোনের মতোই। আদিত্য ও নীরজা স্বামী স্ত্রী, তাদের দুজনের বাগিচার ব্যবসা। দুজনে মিলে নানা জাতীয় দেশী বিদেশী ফুলে বাগানটি ভ'রে তুলেছে। মূলে যা ছিল ব্যবসায় স্বামীস্ত্রীর যুগ্ম ব্যক্তিত্বের প্রক্ষেপে বাগানের চেয়ে তা অধিক হয়ে উঠেছে। নিঃসন্তান নীরজার বাগানটা সন্তানের অধিক, কারণ ওর মধ্যে স্বামীকেও যে দেখতে পায়। এমন সময়ে গুরুতর

অসুস্থ হয়ে পড়লো সে। তখন স্বামীকে দিয়ে ডাকিয়ে পাঠালো সরলাকে। সরলা ও আদিত্য কৈশোর পর্যন্ত একত্র মানুষ হ'য়েছিল সরলাদের পরিবারের মধ্যে। সরলার পিতা তার মেসোমশায়। সেখানেই ফুলের চাষে তার হাতে খড়ি, দুজনেরই বটে।

সরলাকে আনা হয়েছিল সংসার দেখবার জন্যে কিন্তু সেই সরলা যখন ফুলের বাগানে আদিত্যের সহযোগিতা করতে শুরু করলো, অসহ্য হয়ে উঠল নীরজার, এ যেন স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধের মধ্যে হস্তক্ষেপ। এ মালঞ্চ যে তাদের দাম্পত্য সম্বন্ধের প্রতীক, সেখানে তৃতীয় ব্যক্তির স্থান নেই। শুধু তাই নয় সে লক্ষ্য করলো স্বামীর মনে পরিবর্তন ঘটতে আরম্ভ হয়েছে। কৈশোরে যে প্রেম প্রচ্ছন্ন ছিল এখন তা বিকশিত হওয়ার মুখে।

ভ্রমরের ফুল বাগানের মতোই নীরজার মালঞ্চ। দুটোই প্রতীকে পরিণত। গোবিন্দলাল গৃহত্যাগ করবার পরে ফুলবাগান শুকিয়ে গেল, নীরজাও মনে মনে কামনা করতো তার মালঞ্চ ধ্বংস হয়ে যাক অবশেষে আর গোপন রইলো না আদিত্য-সরলার সম্বন্ধ। আদিত্যকে সঙ্কট থেকে উদ্ধার করবার আশায় অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে জেলে গেল সরলা। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল নীরজা। কিন্তু নিশ্বাস মিলিয়ে যাওয়ার আগেই সরলার প্রত্যাবর্তন—জেলে স্থানাভাব বশতঃ সরলা খালাস পেয়েছে। সরলা ফিরে এসে নীরজার ঘরে ঢুকতেই ঢিলে শেমিজপরা মুমূর্ষু রোগী শয্যাত্যাগ করে দাঁড়িয়ে উঠে বারবার অভিসম্পাত দিতে লাগলো সরলাকে। নীরজা ভাঙা গলায় বলে উঠল, "পারলুম না, পারলুম না, দিতে পারবো না, পারবো না।" বলতে বলতে অস্বাভাবিক জোর এল দেহে, চোখের তারা প্রসারিত হয়ে জ্বলতে লাগলো। চেপে ধরলো সরলার হাত, কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ হল। বললে, জায়গা হবে না তোর রাক্ষসী, জায়গা হবে না। আমি থাকবো, থাকবো, থাকবো। হঠাৎ ঢিলে শেমিজপরা পাণ্ডুবর্ণ শীর্ণ মূর্তি বিছানা ছেড়ে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে উঠল। অদ্ভুত গলায়

বললে, পালা পালা পালা এখনই। নইলে দিনে দিনে শেল বিঁধব তোর বুকে, শুকিয়ে ফেলব তোর রক্ত। বলেই পড়ে গেল মেঝের উপরে। গলার স্বর শুনে আদিত্য ছুটে এল ঘরে, প্রাণের সমস্ত শক্তি ফুরিয়ে ফেলে দিয়ে নীরজার শেষ কথা তখন স্তব্ধ হয়ে গেছে।" নীরজা কিছুই হাতে রাখেনি, লেখকও। একেই বলে গল্পের বল্‌গা ছেড়ে দিয়ে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে দেওয়া। মুমূর্ষু নারীর অভিসম্পাতমুখর এহেন অন্তিম চিত্র রবীন্দ্রসাহিত্যে আর নাই—আমার যতদূর জানা আছে অন্য কোন সাহিত্যেও নয়। ১৮৯৩ সালে গতানুগতিকভাবে যে কথাবস্তুর সূত্রপাত ১৯৩৪-এ এসে তার অভীষ্ট পরিসমাপ্তি। এখানেই আমাদের কথাবস্তু বিচারের শেষ।

কথাবস্তু সর্বদা অশরীরী আত্মার মতো লেখকের আশ্রয় খুঁজে বেড়ায়—সুযোগ পেলেই ঘাড়ে চাপে। কোন্ বস্তু কোন্ লেখককে আশ্রয় করবে তার হয়তো একটা নিয়ম আছে। বর্তমান কথাবস্তু রবীন্দ্রনাথকে আশ্রয় করেছিল; রবীন্দ্রনাথ পাঁচবার চেষ্টা ক'রে তাকে ঘাড় থেকে নামিয়েছেন; তার সমস্ত দাবি মিটিয়ে চূড়ান্তভাবে নামিয়ে দিয়েছেন মালঞ্চ উপন্যাসে। উপন্যাসখানা লিখবার পরে তিনি মাত্র বছর সাতেক জীবিত ছিলেন, কিন্তু আরও কুড়ি বছর বাঁচলেও এ কথাবস্তু নিয়ে আর লিখতেন মনে হয় না—কারণ তার সমস্ত সম্ভাবনা নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল নীরজার শোচনীয় মৃত্যুতে।

রবীন্দ্রকাব্যপ্রকৃতি ও জীবনসাধনার উপরে দেবেন্দ্রনাথের প্রভাব

রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও জীবনের সম্বন্ধে রীতিমতো আলোচনা করা চলছে বাংলাদেশে। এটি একটি শুভলক্ষণ। নানা জনে বিভিন্ন দিক থেকে অনুসন্ধানের আলো নিক্ষেপ করছেন, নূতন নূতন তথ্য উদ্‌ঘাটন করছেন, নূতন তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার উপক্রম চলছে, আর এই কাজে কেবল ব্যক্তি বিশেষ মাত্র নয়, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহও যোগদান করছেন। বলাবাহুল্য ব্যক্তিগত ক্ষমতার চেয়ে নানা কারণে প্রতিষ্ঠানের শক্তি অনেক বেশি।

এখন এইসব বিষয় বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে এই আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের কাল ও সমাজ, সংস্কৃত শাস্ত্র ও কাব্য, বাংলা সাহিত্য ও সাহিত্যিক, বিদেশী সাহিত্যিক প্রভৃতি অনেকগুলি তন্ত্র আছে। সেই সঙ্গে আছেন অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি, বিশেষতঃ কবির অল্প বয়সে যাঁরা তাঁর কাছাকাছি ছিলেন। এ সমস্তই বা এঁদের সকলেই এই বিরাট জীবন ও সাহিত্য সাধনায় বলাধান ও প্রভাব বিস্তার করেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রভাব সম্বন্ধে তেমনভাবে আলোচনা হয় নি—অথচ পিতা তাঁর কনিষ্ঠপুত্রকে যত প্রভাবিত করেছেন এমন আর কেউ নন। রবীন্দ্রনাথের জীবনসাধনার উপরে উপনিষদের অপরিসীম প্রভাব। কিন্তু সেটাও মহর্ষির প্রভাবের পরোক্ষ ফল। উপনিষদের গহন অরণ্যের মধ্য দিয়ে মহর্ষি যে পথে চলেছেন, পুত্রও সেই পথের পথিক। মহর্ষি-সংকলিত ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থ রবীন্দ্রনাথের উপনিষদ-সাধনার ভিত্তি। আবার, তাঁর শান্তিনিকেতন উপদেশমালার তথা ইংরাজি সাধনা ও পার্সনালিটি গ্রন্থদ্বয়ের ভিত্তি মহর্ষি-সংকলিত ব্রাহ্ম-ধর্ম ও মহর্ষি-ব্যাখ্যাত ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান। শেষোক্ত বই দুখানাতে

উপনিষদ ও অন্য শাস্ত্রের যে রূপটি বর্তমান রবীন্দ্রনাথ কদাচিৎ তার বাইরে গিয়েছেন। তবে ভিত্তি বই দুখানার উপরে হলেও সৌধের চূড়া অনেক উঁচু হয়ে উঠেছে। এ বিষয়ে পিতার কাছে পুত্রের ঋণ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা হওয়া আবশ্যক, অবশ্য সংস্কৃত শাস্ত্রে তথা বর্তমান বিষয়ে যাঁরা অধিকারী তাঁদের দ্বারাই এ আলোচনা হওয়া সম্ভব। মহর্ষির প্রভাবের বিস্তার সম্বন্ধে ইঙ্গিত দেওয়ার উদ্দেশ্যেই এখানে বিষয়টির উল্লেখ করলাম। পরে হয়তো আর একবার অপেক্ষাকৃত বিস্তারিত উল্লেখ করতে হবে।

রবীন্দ্রনাথের আর একখানি গ্রন্থের আদর্শ পাওয়া যায় মহর্ষি-লিখিত অন্য একখানি গ্রন্থে। জীবনস্মৃতি ও আত্ম-জীবনীর মধ্যে মিল নিশ্চয় অনেকের চোখে পড়েছে। এ বিষয়ে পরে বিস্তারিত আলোচনা করতে হবে, এখন উল্লেখমাত্রই যথেষ্ট।

পিতার কাছে পুত্রের ঋণ সম্বন্ধে যদি আর-কোনো প্রমাণ না থাকত তবু পূর্বোক্ত দলিলের উপরে নির্ভর করেই তার বিপুলতা অনুভব করা যেতে পারত। বলা বাহুল্য প্রমাণ এখানেই শুধু সীমাবদ্ধ নয়।

পুত্রের উপরে পিতার প্রভাবকে আর-একটি অভাবিত দিক থেকে বিচার করা যেতে পারে। এটি অভাবিত এবং নেতিবাচক তবু হয়তো বিষয়টি বুঝতে কিছু সাহায্য করতে পারে। কল্পনা করা যাক রবীন্দ্রনাথ মহর্ষি-গৃহে সন্তানরূপে জন্মগ্রহণ না করে বাংলা-দেশেরই অন্য কোনো ধনী হিন্দুগৃহে জন্মগ্রহণ করলেন যেখানে পূজাপার্বণ ও আচার-অনুষ্ঠান নিয়মিত চলে। যেমন, ধরা যাক, বঙ্কিমচন্দ্র জন্মেছিলেন। সে রকম ক্ষেত্রে রবীন্দ্রসাহিত্য কি আকার ধারণ করত? রবীন্দ্রসাহিত্য বলতে এখন যে বিশেষ গুণবিশিষ্ট রচনা বুঝি ঠিক সেই রকমটি হত কি? অবশ্য যে ঘরেই তিনি জন্মগ্রহণ করুন বিপুল প্রতিভা আপন পথ তৈরি করে নিত, পূর্ব-বাহিনী হয়ে ব্রহ্মপুত্রধারা যদি বা না হয়, পশ্চিমবাহিনী হয়ে নিশ্চয় সিন্ধুধারায় পরিণত হত। কিন্তু সে সাহিত্যের বিশিষ্ট লক্ষণ এখনকার

মতো হত মনে হয় না। "স্টপফোর্ড ব্রুকের সঙ্গে যখন আমার আলাপ হয়েছিল তখন তিনি আমাকে বললেন যে, কোনো-একটা বিশেষ সাম্প্রদায়িক দলের কথা বা বিশেষ দেশের বা কালের প্রচলিত রূপক ধর্মমত বা বিশ্বাসের সঙ্গে আমার কবিতা জড়িত নয় বলে আমার কবিতা পড়ে তাঁদের আনন্দ ও উপকার হয়েছে।" [অগ্রসর হওয়ার আহ্বান, শান্তিনিকেতন]। আমাদের কাল্পনিক হিন্দুঘরে জন্মগ্রহণ করলে স্টপ্‌ফোর্ড ব্রুক-কথিত গুণটি কি রবীন্দ্রসাহিত্যে থাকত? থাকত না বলেই মনে হয়। মহর্ষির সাধনা ও তাঁর গৃহের প্রভাবেই এই প্রভেদটি ঘটেছে। তা যদি স্বীকার করি তবে স্বীকার না করে উপায় থাকে না যে কী বিপুল প্রভাব পিতার ও তাঁর গৃহের। যেসব ব্যক্তি রবীন্দ্রজীবনকে প্রভাবিত করেছেন যেমন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বিহারীলাল কাদম্বরী দেবী (আমার বিশ্বাস তাঁর প্রভাবের প্রকৃতি অনেকে অকারণে খুব বাড়িয়ে দেখেন) কিংবা আন্না তড়খড়, তাঁদের কারো বা সকলের অভাবে রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রকৃতিতে বেশি ইতর-বিশেষ হত না, কিন্তু মহর্ষি ও তজ্জনিত প্রভাব ব্যতিরেকে রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রকৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপ গ্রহণ করতে পারত। মহর্ষির সাধনার শিখর জলবিভাজন রেখার কাজ করেছে এ ক্ষেত্রে; এ দিকটায় অবস্থিত বলে তার বর্তমান রূপ; বিপরীত দিকে অবস্থিত হলে সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপ ধারণ করত। একে অনেকে জল্পনা মনে করতে পারেন, কিন্তু বৃথা জল্পনা নয়। কেননা, অন্য হিন্দুঘরে জন্মগ্রহণ করবার সম্ভবনাই ছিল স্বাভাবিক, তবে অদৃষ্টের দুর্জ্ঞেয় বিধানে এমন ঘটেছে যা 'কোটিকে গোটিক হয়'; তখনকার দিনে বাংলাদেশে যে একটিমাত্র ঘর ছিল যা অসাম্প্রদায়িক ধর্মসাধনার ক্ষেত্র, সেখানে হল রবীন্দ্রনাথের জন্ম। অসম্ভবের মুঠো থেকে কখনো কখনো যে রত্ন-কণিকা খসে পড়ে এ যেন সেইরকম একটা দুর্লভ রত্ন। এত কথা বলবার মূল কারণ নেতির দিক থেকে এবং ইতির দুই দিক থেকে মহর্ষির প্রভাব সম্বন্ধে ইঙ্গিত দান।

পিতা নানাভাবে পুত্রকে প্রভাবিত করতে পারেন। পিতার বা তৎপূর্ববর্তীদের অনেক গুণ পুত্রের রক্তে সংক্রামিত হয়ে থাকে। এর উপরে মানুষের হাত নেই, এ রক্তের লীলা। মহর্ষির সন্তানগণের সকলেই অল্পবিস্তর প্রভাবিত হয়েছেন রক্তের লীলায়, তবে এই লীলা সবচেয়ে বেশি প্রকট কনিষ্ঠের মধ্যে। মহর্ষির জীবনে সবচেয়ে লক্ষ্য করবার বিষয় একটি ভারসাম্যের ভাব, সংসারকে অবহেলা না করেও সংসারাতীত সম্বন্ধে আগ্রহ তাঁর সাধনাকে একটি বৈশিষ্ট্য দিয়েছে। প্রথমজীবনে বরঞ্চ এই ভারসাম্যের ভার তেমন প্রকট নয়, বিষয় সম্বন্ধে উদাসীনতাই প্রবল। এই উদাসীনতাই তাঁকে পিতৃঋণ শোধ করবার জন্য প্রণোদিত করেছে; ধীরে সুস্থে অগ্রসর হলে বিষয়ের আরো অনেকটা রক্ষা করে পিতৃঋণের দায় থেকে তিনি মুক্ত হতে পারতেন। কিন্তু সে ধীরতা তাঁর ছিল না। হিমালয় থেকে তপস্যা শেষ করে, পার্বত্য নদীর গতির মধ্যে ভগবৎ ইঙ্গিত লক্ষ্য করে যখন তিনি প্রত্যাবর্তন করলেন তখন থেকে ক্রমেই এই ভারসাম্যের ভাব প্রকট হয়ে উঠতে লাগল, এ ভাব শেষ পর্যন্ত ছিল। আধ্যাত্মিক পুরুষগণের উদাসীনতাতে আমরা যতটা অভ্যস্ত, তাঁদের জীবনের ভারসাম্যে ততটা নই। সেইজন্যে মহর্ষির সাধনাকে অনেকের বুঝতে অসুবিধা হয়। রবীন্দ্রনাথের জীবনেও সবচেয়ে লক্ষ্য করবার বিষয় এই ভারসাম্যের ভাব। এ ভাব যে সব সময়ে সমান প্রকট ছিল এমন নয়। পত্নীবিয়োগের পর থেকে বেশ কিছুকাল, দশ বারো বছর তো হবেই, একটা উদাসীনতার ভাব লক্ষ্যগোচর হয় তাঁর জীবনে। সংসারের দায় হাল্কা করে ফেলে, বিষয়আশয়ের বিলিব্যবস্থা বা হস্তান্তর করবার জন্য একটা উৎকট আগ্রহ দেখা যায়। এই সময়ে রথীন্দ্রনাথকে লিখিত চিঠিপত্রে তার সাক্ষ্য আছে। তার পরে ক্রমে ক্রমে, ধরা যাক ফাল্গুনী ও বলাকা লিখবার পরে ভারসাম্যের ভাব ফিরে এসে শেষ পর্যন্ত ছিল। এই বিষয়টি যাঁরা বুঝতে অভ্যস্ত নন তাঁদের কাছে কবি রবীন্দ্রনাথকে বুঝতে অসুবিধা হয়।

মহর্ষির ধ্যানরস-রসিকতার ভাবটি বোধ করি তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্রে সমধিক বিকশিত হলেও বলা বাহুল্য কনিষ্ঠ এ গুণেরও বিশেষ অধিকারী ছিলেন। তবে তাঁর ধ্যান নিয়েছে গানের পথ, সেইজন্যে অনেক সময়ে বুঝতে ভুল হয়ে থাকে।

মহর্ষির প্রকৃতিতে একজন কবি ছিল, সেই কবির চোখে প্রকৃতির সৌন্দর্য দেখে তিনি মুগ্ধ হয়েছেন, আবার একজন ধ্যানী বা ভাগবৎ পুরুষ ছিল তার চোখ প্রকৃতির সৌন্দর্যের মধ্যে ভগবানের মহিমা প্রত্যক্ষ করে ধন্য হয়েছেন। হিমালয়ের দুর্গম শিখরে বিচিত্র বন্যপুষ্প প্রস্ফুটিত দেখে মহর্ষি বলছেন "কত জাতি পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া রহিয়াছে, তাহা সহজে গণনা করা যায় না। শ্বেতবর্ণ পীতবর্ণ নীলবর্ণ স্বর্ণবর্ণ, সকল বর্ণেরই পুষ্প যথাতথা হইতে নয়নকে আকর্ষণ করিতেছে। এই পুষ্পসকলের সৌন্দর্য ও লাবণ্য, তাহাদিগের নিষ্কলঙ্ক পবিত্রতা দেখিয়া সেই পরম পবিত্র পুরুষের হস্তের চিহ্ন তাহাতে বর্তমান বোধ হইল।...আমার সঙ্গের এক ভৃত্য এক বনলতা হইতে তাহার পুষ্পিত শাখা আমার হস্তে দিল। এমন সুন্দর পুষ্পের লতা আমি আর কখনো দেখি নাই। আমার চক্ষু খুলিয়া গেল, আমার হৃদয় বিকশিত হইল। আমি সেই ছোট ছোট শ্বেত পুষ্পগুলির উপরে অখিলমাতার হস্ত পড়িয়া রহিয়াছে, দেখিলাম।...নাথ! যখন এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুষ্পগুলির উপরে তোমার এত করুণা, তখন আমাদের উপর না জানি তোমার কত করুণা।"

পিতার এই অভিজ্ঞতার প্রতিধ্বনি পুত্রের সঙ্গীতে।

এই-যে তোমার প্রেম, ওগো
হৃদয়হরণ,
এই-যে পাতার আলো নাচে
সোনার বরন।
এই-যে মধুর আলসভরে
মেঘ ভেসে যায় আকাশ 'পরে,

এই-যে বাতাস দেহে করে
অমৃতক্ষরণ !

কিংবা

তুমি নব নব রূপে এসো প্রাণে,
এসো গন্ধে বরনে এসো গানে।

যদিচ দুই ক্ষেত্রেই ধ্বনিকে প্রতিধ্বনি অনেক দূর ছাড়িয়ে গিয়েছে তৎসত্ত্বেও লক্ষ্য করবার বিষয় প্রকৃতিকে ভগবদ্ মহিমার ইনটারপ্রেটার বা দোভাষীরূপে দাঁড় করাবার চেষ্টা। ভগবদ্ মহিমার দোভাষী বা ব্যাখ্যাতারূপে প্রকৃতিকে অনেক স্থানে দেখা যাবে মহর্ষির রচনায়, অবশ্য রবীন্দ্রনাথের কাছে মানুষ ও ভগবান দুয়েরই দোভাষী হচ্ছে প্রকৃতি। তিনি প্রকৃতির স্বভাষী বলেই সহজে বোঝেন তার ব্যাখ্যা। কবিত্বে পুত্র অনেক দূর ছাড়িয়ে গিয়েছেন পিতাকে, কিন্তু ভগবদ্ মহিমা উপলব্ধিতে গিয়েছেন কি না বলবার অধিকারী আমি নই।

আর-এক বিষয়ে পুত্র অনেক দূর ছাড়িয়ে গিয়েছেন পিতাকে, যদিচ মূল প্রেরণাটা পেয়েছেন রক্তের উত্তরাধিকারে। মহর্ষি ভ্রমণ-রসিক ব্যক্তি ছিলেন। রেলপথ বসবার আগে দুর্গম পাঞ্জাবে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে হি.ালয়ে তিনি গিয়েছেন। হিমালয়ের আকর্ষণ বারে বারে তাঁকে নিয়ে গিয়েছে সিমলায় মুসৌরিতে ডালহৌসিতে; গঙ্গাবক্ষে ও পদ্মায় ভ্রমণে তাঁর আনন্দ ছিল; আবার দুই দফা ভারতের বাইরে গিয়েছেন, একবার সিংহলে একবার চীনদেশে।

রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণের ইতিহাস বিস্তারিত বলা অনাবশ্যক। অস্ট্রেলিয়া ছাড়া পৃথিবীর আর সব অঞ্চলেই তিনি একাধিকবার গিয়েছেন। তাঁর ভ্রমণের সীমা পৃথিবীর সীমা বললে অত্যুক্তি হয় না। ভারতের এমন কোনো প্রদেশ নেই, এমন কোনো প্রধান শহর নেই যেখানে তিনি না গিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ বলতেন পাহাড় তাঁর তেমন প্রিয় নয়, তৎসত্ত্বেও কাশ্মীর থেকে শিলং অবধি (শিলং ঠিক হিমালয়ে নয়) হিমালয়ের প্রায় সর্বত্র তিনি গিয়েছেন, অনেক স্থানে

একাধিকবার। আর গঙ্গা ও পদ্মার সঙ্গে তো তাঁর মাতৃস্তন্যের সম্পর্ক ছিল। পিতার এমন রস-রসিকতা কনিষ্ঠ পুত্রের রক্তে পূর্ণতর বেগে সংক্রামিত হয়ে গিয়েছিল। বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথের পক্ষে ভ্রমণজনিত গতিটাও তাঁর জীবনোপলব্ধির একটা পন্থা ছিল। সাধনার ক্ষেত্রে পৌঁছবার উদ্দেশ্যে মহর্ষি ভ্রমণে বের হতেন, রবীন্দ্রনাথে ভ্রমণটাই ছিল সাধনা। "পথের দুধারে আছে মোর দেবালয়"।

মহর্ষির সহজাত সংগঠনী প্রতিভা ছিল। এ প্রতিভা সকলের থাকে না। এ বিশেষ এক ধরণের শক্তি। বিচিত্র প্রকৃতির বহু লোককে এক ভাবতন্ত্রের পরিধির মধ্যে নিয়ে এসে কোনো প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলায় এই প্রতিভার বিকাশ। মহর্ষির ক্ষেত্রে এর ফল ব্রাহ্মসমাজ। রামমোহন যে বীজ বপন করে গিয়েছিলেন, যাকে লালন করে বর্ধিত করবার সুযোগ তাঁর হয় নি সেই অঙ্কুরকে ব্রাহ্মসমাজ মহীরুহে পরিণত করে ফলবান করে তুললেন মহর্ষি। ব্রাহ্মসমাজ বলতে যা বোঝায় তা মহর্ষির কীর্তি। বহুলোক যখন একটি ভাবতন্ত্রের মধ্যে এসে উপনীত হল তখন অনেক রকম বিষয়ে তাঁকে চিন্তা করতে হয়েছে। বেদ অভ্রান্ত নয় স্থির হল, বেদের সমস্ত বচন যখন ব্রাহ্মগণ কর্তৃক আর স্বীকার করা সম্ভব হল না তখন মহর্ষিকে সংকলন করতে হল ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থখানি। একে ব্রাহ্মোপনিষদ বললে অন্যায় হয় না। আবার এই গ্রন্থের তথা ব্রাহ্মধর্মের তত্ত্ব বোঝাবার উদ্দেশ্যেই তাঁকে ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান রচনা করতে হল। আর ব্রাহ্মধর্মের মুখপত্রে পরিণত হল তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা। কিন্তু ক্রমেই নানা রকম সমস্যা দেখা দিতে লাগল। যেসব ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করলেন তাঁদের সন্তানদের উপনয়ন হবে কি না, হলে তাতে কোন্ আচার অনুষ্ঠান হবে। জাতকর্ম বিবাহ শ্রাদ্ধাদি কিভাবে অনুষ্ঠিত হবে। ব্রাহ্মসমাজে তখন কিভাবে কোন্ অনুষ্ঠান ও উৎসব হবে। এসমস্ত বিষয় তাঁকে ধীরভাবে চিন্তা করতে হয়েছে এবং অনেক সময় প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে অগ্রসর হতে হয়েছে। ধীরতা সহিষ্ণুতা ও অপ্রমত্তবুদ্ধির সাহায্যে

ক্রমে ক্রমে তাঁকে যে সংস্থা গড়ে তুলতে হয়েছিল তারই নাম ব্রাহ্ম-সমাজ। পরবর্তীকালে সমাজ যখন দ্বিধা ও ত্রিধা বিভক্ত হয়ে গেল তখনো তারা মহর্ষি-প্রবর্তিত কাঠামোটিকে গ্রহণ করেছিল। মহর্ষির শ্রেষ্ঠ কীর্তি এই ব্রাহ্মসমাজ গঠন।

তাঁর সন্তানগণের মধ্যে একমাত্র রবীন্দ্রনাথই উত্তরাধিকারসূত্রে এই গুণটি পেয়েছিলেন। শান্তি-নিকেতন সেই গুণের ফল। শান্তিনিকেতন শ্রীনিকেতন মিলিয়ে বিশ্বভারতীরূপ মহাপ্রতিষ্ঠান রবীন্দ্রসংগঠনী প্রতিভার শ্রেষ্ঠ কীর্তি। অনেকে মনে করতে পারেন এ সচেতন প্রয়াসের ফল। অনেকটা অবশ্য তাই, কিন্তু কেবল সচেতনপ্রয়াসে পূর্বেতিহাসহীন কোনো প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা সম্ভব নয়, তার জন্য আবশ্যক বিশেষ যে শক্তি তার প্রেরণা থাকে রক্তের মধ্যে। এ ক্ষেত্রে পিতার রক্ত থেকে সেই প্রেরণা এসেছিল পুত্রে।

পিতার রক্তের গুণে মহর্ষির সন্তানগণ সকলেই সুপুরুষ ও অতুলনীয় স্বাস্থ্যের অধিকারী। শোনা যায় মহর্ষির সন্তানগণের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের রঙটাই নাকি সবচেয়ে কালো ছিল। তবে শোনার সঙ্গে দেখা এখানে মেলে না। দ্বিজেন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্রনাথ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ চার জনকেই চোখে দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। মহর্ষির শেষজীবনের চেহারার সঙ্গে (ছবিতে দেখে যতদূর বুঝতে পারা যায়) রবীন্দ্রনাথের শেষজীবনের চেহারার মিল অত্যন্ত সুপ্রকট। তাঁর অন্য তিন সন্তানকেও তাঁদের শেষজীবনে দেখেছি, এমন মিল আর কারো মধ্যে দেখি নি। আবার এই দুই মহাপুরুষের মৃত্যুতেও মিল ফুটে উঠেছে। সুপরিণত বয়সে অস্ত্রো-পচারের পরে দিবা দ্বিপ্রহরান্তে অসতো মা সদ্‌গময়ো মন্ত্র শুনতে শুনতে দুজনের তিরোধান ঘটে। এত মিলকে যারা আকস্মিকমাত্র মনে করেন করুন, তবে অন্য রকম ব্যাখ্যাও অসম্ভব নয়। সে ব্যাখ্যায় সূত্র রক্তের সূত্র মনে করা অন্যায় নয়।

রক্তের অধিকার ছাড়া আর একভাবে পিতার প্রভাব ফলবান হয় পুত্রে। সেটা সচেতন প্রয়াস। পুত্রগণের অকুণ্ঠ-ভক্তির অধিকারী ছিলেন মহর্ষি। সব পিতা এমন সৌভাগ্যবান হলে সংসারের চেহারা অন্য রকম হত। এ ক্ষেত্রে পিতা ও পুত্র সকলকেই সৌভাগ্যবান বলতে হবে। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা আবশ্যক যে পুত্রগণ সকলেই অল্পাধিক প্রতিভাবান, তাদের পথ ও কর্মক্ষেত্রও এক নয়। তৎসত্ত্বেও তাঁদের সকলেরই জীবনে মহর্ষির জীবনটি উত্তুঙ্গ গিরিশিখরের মতো নিত্য বিরাজমান ছিল, তাঁরা যত দূরেই যান ঐ গিরিশিখরটি কখনো নজরের বাইরে পড়ে নি।

রবীন্দ্রনাথের কথা শুনবার সৌভাগ্য যাঁদের হয়েছে তাঁরা নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন যে মহর্ষির উল্লেখ করবার সময় পিতৃদেব ও বাবামশায় বলতে তাঁর কণ্ঠে ও চোখে-মুখে কী গভীর ভক্তি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠত। এখানে রবীন্দ্রনাথের একটি পত্রখণ্ড উদ্ধার করছি মহর্ষির উপরে চরম নির্ভরশীলতার একটি দৃষ্টান্তরূপে। মাঘোৎসবে গীত হওয়ার উদ্দেশ্যে একজন আত্মীয়ার লিখিত একটি গান ইন্দিরা দেবী পাঠিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথকে। রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করছেন "একটা কথা মনে রাখিস, 'সর্ব্বং খলু ব্রহ্ম' এমত আদি বা সাধারণ বা কোনো ব্রাহ্মসমাজেরই নয়।" ··"সর্ব্ব জীবে আছে ব্রহ্ম" বললে দোষ খণ্ডন হয়, হয় তো "সর্ব্বগত ব্রহ্ম" ছন্দে মিলতে পারে, মিলুক বা না মিলুক সর্ব্বং খলু ব্রহ্ম কোনো মতেই যেন ব্যবহার না করা হয়—মনে রাখিস বাবামশায় থাকলে তিনি কিছুতেই সহ্য করতেন না" [১৩ই জানুয়ারী ১৯৩৫]। তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স চুয়াত্তর, এই সুপরিণত বয়সেও মহর্ষির উপরে কী গভীর নির্ভরশীলতা! মহর্ষির সাধনার উত্তুঙ্গ শিখর সর্বদা চোখে জাগছে কিনা।

৭ই পৌষ মহর্ষির দীক্ষা-দিবস। এটি রবীন্দ্রনাথের কাছে একটি পবিত্রতম দিন। ৭ই পৌষের তাৎপর্য ও মাহাত্ম্য ব্যাখ্যাত্মক অগণিত উল্লেখ ও রচনা আছে রবীন্দ্রসাহিত্যে। এই তারিখটির সঙ্গেই

জোড় মিলিয়ে ৮ই পৌষ হল শান্তিনিকেতন আশ্রমের প্রতিষ্ঠা দিবস। এই দিনটি নির্বাচন করবার সময় হয়তো কবি ভেবেছিলেন যে দিন-সান্নিধ্যে শান্তিনিকেতন আশ্রম যদি লাভ করতে পারে ৭ই পৌষের কিছু মহিমা। এ বিষয়ে শান্তিনিকেতনিকদের কাছে অধিক ব্যাখ্যা অনাবশ্যক। তবে একটি বিষয়ের উল্লেখ না করে পারছি না, হয়তো সেটি অনেকের চোখ এড়িয়ে গিয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের শেষজীবনের আবাস উত্তরায়ণ। এর মধ্যেও প্রচ্ছন্নভাবে ৭ই পৌষকে তিনি স্মরণ করে গিয়েছেন বলে মনে হয়। মাঘাদি ছয় মাস রবির উত্তরায়ণ হলেও বস্তুতঃ উত্তরায়ণের আরম্ভ ২২ শে ডিসেম্বর বা ৭ই পৌষ। কবির ক্রান্তদর্শী চোখে যে এটি এড়িয়ে গিয়েছে মনে হয় না। যদি আমার অনুমান সত্য হয় তবে বুঝতে হবে যে ৭ই পৌষের মহিমাচ্ছায়ায় মণ্ডিত আবাসে শেষজীবন যাপন করেছেন রবীন্দ্রনাথ।

আমার বক্তব্য এই যে, একদিকে রক্তের অধিকারে যেমন তিনি অনেক পিতৃগুণের অধিকারী হয়ে ছিলেন, তেমনি আর-এক দিকে সচেতন চিন্তা ও প্রয়াসের দ্বারা নিজের জীবনকে একটি রূপ দিতে চেষ্টা করেছিলেন তিনি যার আদর্শ ছিল মহর্ষির জীবনে ও সাধনায়।

এ ছাড়াও আর-এক ভাবে মিল দেখা যায় পিতা ও পুত্রের জীবনে। প্রথমে গেল রক্তের প্রেরণা, তার পরে সচেতন চিন্তা ও প্রয়াস। তৃতীয়টিকে কি নাম দেব জানি না। তবে তা উত্তরাধিকার বা সচেতনপ্রয়াস নয়, তদতিরিক্ত কিছু। নাম দেওয়ার আগে বস্তুটির স্বরূপ দেখা যাক।

মহর্ষির ও রবীন্দ্রনাথের দুজনের জীবনেই একটি করে পরম অভিজ্ঞতা আছে যাকে তাঁদের জীবনের ধ্রুববিন্দু আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। তাঁদের আর সব অভিজ্ঞতার মূল্য কালক্রমে বেড়েছে কমেছে, কখনো কখনো লোপ পেয়েছে, কিন্তু পূর্বোক্ত অভিজ্ঞতা অচল অটল

হয়ে বিরাজ করেছে। এই ধ্রুববিন্দু দুটির সঙ্গে তুলনা ও পরিমাপ করে আর সব অভিজ্ঞতার মূল্য বুঝতে হবে। বস্তুতঃ এই ধ্রুববিন্দু থেকেই তাঁদের সত্যকার জীবনের সূত্রপাত। এ দুটি তাঁদের মহত্বের গঙ্গোত্রী।

মহর্ষি আত্মজীবনীতে লিখছেন—"দিদিমার মৃত্যুর পূর্বদিন রাত্রিতে আমি ঐ চালার নিকটবর্ত্তী নিমতলার ঘাটে একখানা চাঁচের উপরে বসিয়া আছি। ঐ দিন পূর্ণিমার রাত্রি, চন্দ্রোদয় হইয়াছে, নিকটে শ্মশান। তখন দিদিমার নিকট সঙ্কীর্তন হইতেছিল—'এমন দিন কি হবে, হরিনাম বলিয়া প্রাণ যাবে'; বায়ুর সঙ্গে তাহা অল্প অল্প আমার কাণে আসিতেছিল। এই অবসরে হঠাৎ আমার মনে এক আশ্চর্য্য উদাসভাব উপস্থিত হইল। আমি যেন আর পূর্ব্বের মানুষ নই। ঐশ্বর্য্যের উপর একেবারে বিরাগ জন্মিল। যে চাঁচের উপর বসিয়া আছি, তাহাই আমার পক্ষে ঠিক বোধ হইল; গালিচা দুলিচা সকল হেয় বোধ হইল; মনের মধ্যে এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দ উপস্থিত হইল।...শ্মশানের সেই উদাস আনন্দ, তৎকালের সেই স্বাভাবিক সহজ আনন্দ, মনে আর ধরে না। ভাষা সর্ব্বথা দুর্ব্বল, আমি সেই আনন্দ কিরূপে লোককে বুঝাইব?...এই ঔদাস্য ও আনন্দ লইয়া রাত্রি দুই প্রহরের সময় আমি বাড়ীতে আসিলাম। সে রাত্রিতে আমার আর নিদ্রা হইল না। এ অনিদ্রার কারণ, আনন্দ। সারা রাত্রি যেন একটা আনন্দ-জ্যোৎস্না আমার হৃদয়ে জাগিয়া রহিল।...পরে, দিদিমার মৃত্যুর পূর্ব্বদিন রাত্রে যেরূপ আনন্দ পাইয়াছিলাম, তাহা পাইবার জন্য আবার চেষ্টা হইল। কিন্তু তাহা আর পাইলাম না। এই সময়ে আমার মনে কেবলই ঔদাস্য আর বিষাদ। সেই রাত্রিতে ঔদাস্যের সহিত আনন্দ পাইয়াছিলাম, এখন সেই আনন্দের অভাবে ঘন বিষাদ আসিয়া আমার মনকে আচ্ছন্ন করিল। কিরূপে আবার সেই আনন্দ পাইব, তাহার জন্য মনে বড়ই ব্যাকুলতা জন্মিল।"

রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে লিখছেন—"সদর স্ট্রীটের রাস্তাটা

যেখানে গিয়া শেষ হইয়াছে সেইখানে বোধকরি ফ্রী-স্কুলের বাগানের গাছ দেখা যায়। একদিন সকালে বারান্দায় দাঁড়াইয়া আমি সেইদিকে চাহিলাম। তখন সেই গাছগুলির পল্লবান্তরাল হইতে সূর্যোদয় হইতেছিল। চাহিয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ এক মুহূর্তের মধ্যে আমার চোখের উপর হইতে যেন একটা পর্দা সরিয়া গেল। দেখিলাম একটি অপরূপ মহিমায় বিশ্বসংসার সমাচ্ছন্ন, আনন্দে এবং সৌন্দর্যে সর্বত্রই তরঙ্গিত। আমার হৃদয়ে স্তরে স্তরে যে-একটা বিষাদের আচ্ছাদন ছিল তাহা এক নিমেষেই ভেদ করিয়া আমার সমস্ত ভিতরটাতে বিশ্বের আলোক একেবারে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িল।··কিছু কাল আমার এইরূপ আত্মহারা আনন্দের অবস্থা ছিল। এমন সময়ে জ্যোতিদাদারা স্থির করিলেন, তাঁহারা দার্জিলিঙে যাইবেন। আমি ভাবিলাম, এ আমার হইল ভালো— সদর স্ট্রীটে শহরের ভিড়ের মধ্যে যাহা দেখিলাম হিমালয়ের উদার শৈলশিখরে তাহাই আরও ভালো করিয়া, গভীর করিয়া দেখিতে পাইব।···কিন্তু, সদর স্ট্রীটের সেই বাড়িটারই জিত হইল।···আমি দেবদারুবনে ঘুরিলাম, ঝরনার ধারে বসিলাম, তাহার জলে স্নান করিলাম, কাঞ্চনশৃঙ্গের মেঘমুক্ত মহিমার দিকে তাকাইয়া রহিলাম— কিন্তু যেখানে পাওয়া সুস 'য মনে করিয়াছিলাম সেইখানেই কিছু খুঁজিয়া পাইলাম না। রত্ন দেখিতেছিলাম, হঠাৎ তাহা বন্ধ হইয়া এখন কৌটা দেখিতেছি।'

পূর্বোক্ত অভিজ্ঞতার সময়ে মহর্ষির ও রবীন্দ্রনাথের দুজনেরই বয়েস একুশ বৎসর কয়েক মাস। বয়সের ও অভিজ্ঞতার সাম্য কি কেবল কাকতালীয় মিল? কাকতালীয় হোক আর অন্যপ্রকার হোক এ দুটি যে মহর্ষির ও রবীন্দ্রনাথের জীবনের পরম অভিজ্ঞতা বা ধ্রুববিন্দু সে সন্দেহ কাহারো থাকা উচিত নয়। দুজনেই এই অভিজ্ঞতার আলোতে নিজ পথ দেখতে পেলেন; একজনের অধ্যাত্মধর্ম, অন্যজনের কবিধর্ম; পথ আলাদা, কিন্তু সমস্ত পথ শেষ

পর্যন্ত যে একলক্ষ্যে গিয়ে পৌঁছায় না, তাই বা কে বলবে। সেদিনের ক্ষণিক আনন্দকে স্থায়ীভাবে জীবনে লাভ করবার উদ্দেশ্যে দুজনেই চেষ্টা করেছেন, বস্তুতঃ এই চেষ্টাকে তাঁদের সাধনা বললে অত্যুক্তি হয় না। তাঁদের সাধনার সমগ্র ইতিহাস আছে তাঁদের সমগ্র রচনা ও জীবনের মধ্যে, তবে সূত্রপাত ও রহস্যোদ্ধারপ্রয়াস আত্মজীবনী ও জীবনস্মৃতি গ্রন্থদ্বয়ে। এই কারণে বই দুখানার বিশেষ মূল্য, অবশ্য অন্য মূল্যেরও অভাব নাই।

আগে সেই অন্য মূল্য অর্থাৎ সাহিত্যমূল্যের পরিচয় সেরে নেওয়া আশা করি অপ্রাসঙ্গিক হবে না। জীবনস্মৃতির সাহিত্যমূল্যের আলোচনা অনাবশ্যক, যেহেতু তা সুবিদিত। তবে আত্মজীবনীর সাহিত্যমূল্যের বিচার আবশ্যক। অনেকের ধারণা বইখানায় যেহেতু অধ্যাত্ম অভিজ্ঞতার বিবরণ মুখ্য বিষয় সেহেতু বইখানা নীরস। এ ধারণা আদৌ সত্য নয়। অধ্যাত্ম অভিজ্ঞতাই অবশ্য মুখ্য বিষয়, তাই বলে নীরস হবে কেন? অধ্যাত্ম অভিজ্ঞতার বর্ণনার পরিচ্ছেদগুলোর মাঝে মাঝে এমন সব পরিচ্ছেদ আছে যা অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক, এমন কি তাদের রোমাঞ্চকর বললে বইখানার মহিমা ক্ষুণ্ণ করা হয় না। উদাহরণ স্বরূপ ত্রয়োদশ চতুর্দশ পঞ্চদশ ও ষোড়শ পরিচ্ছেদের উল্লেখ করা যেতে পারে। চতুর্দশ পরিচ্ছেদের ঝড়ের ও পিতার মৃত্যুসংবাদ প্রাপ্তির বিবরণ এমন চিত্তাকর্ষকভাবে লিখিত যে মনে হয় বঙ্কিমচন্দ্রের কোনো অলিখিত উপন্যাসের অংশবিশেষ পাঠ করছি। তার পরে একত্রিংশ থেকে উনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ সবগুলোই সমান চিত্তাকর্ষক; বিশেষ সিমলায় বাস, সিপাহি বিদ্রোহের আতঙ্ক ও সিদ্ধিলাভান্তে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তনের বিবরণও সমান চিত্তগ্রাহী। বিচিত্র ঘটনাসমূহ ও আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে পরিচ্ছেদের পরে পরিচ্ছেদ জোড়া দিয়ে এমন সুনিপুণভাবে গ্রথিত যে কোথাও ক্লান্তি অনুভূত হয় না, মনোযোগ সমান জাগ্রত থাকে। তা ছাড়া প্রসঙ্গত এমন-সব সামাজিক ঘটনা বিবৃত হয়েছে যার নিজস্ব মূল্য আছে।

বস্তুতঃ যেদিক দিয়েই বিচার করা যাক আত্মজীবনী বাংলা ভাষায় একখানি অবিস্মরণীয় গ্রন্থ।

এবারে আসল কথায় আসা যেতে পারে। জীবনস্মৃতি ও আত্মজীবনী দুই ভিন্ন কলমের লেখা হলেও এদের মধ্যে অমিলের চেয়ে মিল বেশি।

কোনোখানাই গতানুগতিক জীবনচরিত নয়। একখানার বিষয় অধ্যাত্ম অভিজ্ঞতার উন্মেষ ও বিকাশ; অন্যখানার কবিধর্মের উন্মেষ-বিকাশ। কোনোখানাই সমগ্র জীবনের কাহিনী নয়; উন্মেষ ও বিকাশ দেখবার পরেই সমাপ্ত। তাই দুখানাতেই জীবনখণ্ডের পরিচয়। আত্মজীবনীর কালপরিধি মহর্ষির জীবনের একুশ বছর থেকে একচল্লিশ বছর; জীবনস্মৃতির বাল্যকাল থেকে পঁচিশ বছর পর্যন্ত। আগে যে কথা বলেছি তারই পুনরুল্লেখ করে এ প্রবন্ধ সমাপ্ত করা যেতে পারে। জীবনস্মৃতি লিখবার আগে সচেতন মনের কাছে আত্মজীবনী আদর্শরূপে নিশ্চয় উপস্থিত ছিল। একখানা লিখিত না হলে অপরখানা এই আকারে লিখিত হত কি না সন্দেহ, যেমন সন্দেহ ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান লিখিত না হলে শান্তিনিকেতন উপদেশমালা লেখা সম্বন্ধে, এখানেও একটি অপরটির সচেতন আদর্শ।

মহর্ষি-কৃত ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান গ্রন্থের তিনটি অংশ। প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকরণে ব্যাখ্যান অংশ, তা ছাড়া মাসিক ব্রাহ্মসমাজের উপদেশ অংশ। এখানে আমাদের আলোচ্য ব্যাখ্যান অংশ। প্রথম প্রকরণে দ্বাবিংশটি ও দ্বিতীয় প্রকরণে এগারোটি ব্যাখ্যান; সবশুদ্ধ সাঁইত্রিশটি।

রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন উপদেশাবলী প্রথমে ছোট ছোট পুস্তিকা আকারে প্রকাশিত হয়ে সতেরো খণ্ড পর্যন্ত চলে। তার পরে একত্রিত হয়ে দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়। এই উপদেশগুলি সংখ্যায় এক শ চুয়ান্ন। এই এক শ চুয়ান্নটির মধ্যে কতকগুলি ঠিক

উপদেশাবলী পর্যায়ের নয়, বিষয়ের মিল থাকলেও রীতিমত প্রবন্ধ। তবে অধিকাংশই আকারে ছোট, দৈর্ঘ্যে মহর্ষি-কৃত ব্যাখ্যানের মতো।

উপদেশদানের আগে মহর্ষি ব্যাখ্যানগুলি লিখে নিয়ে যেতেন; রবীন্দ্রনাথ আগে মুখে বলে তার পরে ঘরে ফিরে এসে লিখে ফেলতেন। এই সময়ে পিতা ও পুত্র দুজনেরই বয়স চল্লিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে, পঞ্চাশের দিকেই বয়সের রেখা বেঁকে পড়েছে।

আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনের কাছে শুনেছি যে এই সময়টায় শেষ-রাতে উঠে রবীন্দ্রনাথ বসতেন, সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ধ্যানভঙ্গ হত। ক্ষিতিমোহন সেন প্রমুখ তৎকালীন কয়েকজন শান্তিনিকেতনিকের আকিঞ্চনে ধ্যানভঙ্গান্তে রবীন্দ্রনাথ কিছু উপদেশ দিতে রাজি হন। তখন মুখে মুখে বলতেন পরে লিখে ফেলতেন। এইভাবে শান্তিনিকেতন উপদেশাবলীর রচনা। তৎকালীন জিজ্ঞাসুগণ আগ্রহ প্রকাশ না করলে এগুলি নিশ্চয় বর্তমান আকারে লিখিত হত না।

ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান ও শান্তিনিকেতন উপদেশাবলীর বিস্তারিত তুলনামূলক আলোচনা হওয়া আবশ্যক। এভাবে আলোচনা হলে পিতা পুত্র দুই সাধকের অধ্যাত্মজীবনের অনেক নিগূঢ় সত্য প্রকাশিত হবে। বর্তমান প্রবন্ধে সে চেষ্টা করব না, কেবল কয়েকটি ব্যাখ্যান ও উপদেশের মধ্যে তুলনার ইঙ্গিত দিয়ে সংক্ষেপে নিবৃত্ত হব।

১ ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যানের দ্বিতীয় ব্যাখ্যান এবং শান্তিনিকেতনের প্রবন্ধ সৌন্দর্য দুয়েরই ব্যাখ্যার বিষয় আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি।

২. ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যানের অষ্টম ব্যাখ্যান এবং শান্তিনিকেতনের প্রবন্ধ প্রেমের অধিকার দুয়েরই ব্যাখ্যার বিষয় দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া ইতি প্রসিদ্ধ শ্লোকটি।

৩. ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যানের বিংশ ব্যাখ্যান এবং শান্তিনিকেতন প্রবন্ধ দিন দুয়েরই ব্যাখ্যার বিষয় যোবৈ ভূমা তৎসুখং নাল্পে সুখমস্তি।

৪. ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যানের দ্বিতীয় প্রকরণের অন্তর্গত নবম

ব্যাখ্যান এবং শান্তিনিকেতনের প্রবন্ধ প্রার্থনা দুয়েরই ব্যাখ্যার বিষয় যেনাহং নামৃতাস্যাম কিমহং তেন কুর্য্যাম্।

৫. ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যানের দ্বিতীয় প্রকরণের অন্তর্গত তৃতীয় ব্যাখ্যান এবং শান্তিনিকেতন প্রবন্ধ তিন-এর ব্যাখ্যার বিষয় শান্তং শিবমদ্বৈতম্।

এই রচনাগুলি মিলিয়ে পড়লে দেখা যাবে দুজনের দৃষ্টিতে প্রভেদ নেই, দুজনেই এক সত্যের অভিমুখী, তবে প্রকাশে অবশ্যই প্রভেদ আছে। মহর্ষি শ্লোকটি ছেড়ে বেশি দূরে যান নি, তার ব্যাখ্যা করেছেন, উদাহরণ স্বরূপ নিজের অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ নিজের অভিজ্ঞতা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে উদাহরণ স্বরূপ শ্লোকগুলির উল্লেখ করেছেন। প্রকাশের এই পার্থক্য ছেড়ে দিলে দেখা যাবে যে দুজনেরই সাধনা-প্রবাহের শিখর এক, লক্ষ্যও এক ; তবে পিতার খাতে যদি গভীরতা বেশি হয়, পুত্রের খাতে প্রসার বেশি, পিতার খাত যদি অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ হয় তবে তার বেগও বেশি ; আবার পুত্রের খাত অধিকতর প্রশস্ত বলেই তাতে সৌন্দর্য ও সংগীত সুপ্রকট। তৎসত্ত্বেও স্বীকার না করে উপায় নেই যে একটি অপরটির আদর্শ, যেমন আদর্শ বলেছি একটি জীবনীগ্রন্থ অপরটির।

অনেক দূরে এসে পড়েছি এখন একবার দাঁড়িয়ে পিছনে ফিরে তাকানো যেতে পারে। এ পর্যন্ত বলতে চেষ্টা করেছি রবীন্দ্রনাথ তিন প্রকারে মহর্ষির সাধনা ও প্রভাবকে আত্মসাৎ করতে চেষ্টা করেছেন। প্রথমতঃ রক্তের অধিকারে, যার উপরে তাঁর কর্তৃত্ব ছিল না ; দ্বিতীয়তঃ অজ্ঞেয় কোনো একটা শক্তির লীলায়, তার উপরেও কোনো কর্তৃত্ব ছিল না কবির ; তৃতীয়তঃ সচেতন প্রয়াসে নানাভাবে পিতার আদর্শকে সম্মুখে রেখে চলবার চেষ্টা করেছেন। এখন, পুত্রের জীবন যদি অধিকতর ঐশ্বর্যে ভূষিত হয়ে থাকে, তার আবেদন যদি ব্রাহ্মসমাজ ও হিন্দুসমাজের সীমাকে অতিক্রম করে থাকে,

তবে স্বাভাবিক বলেই মেনে নেওয়া উচিত কেননা বীজের স্বভাবের মধ্যেই মহীরুহ বিদ্যমান।

এতক্ষণ আমরা পিতাপুত্রের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে মিল ও অমিল এবং একের উপরে অপরের প্রভাব দেখাবার চেষ্টা করেছি। এবারে আর এক দিক থেকে বিষয়টি দেখাবার চেষ্টা করতে হবে। এ হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের চোখ দিয়ে মহর্ষিকে দেখবার প্রয়াস। মহর্ষি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের রচনার পরিমাণ নিতান্ত কম নয়।- জীবনস্মৃতিতে চারিত্রপূজায় শান্তিনিকেতন উপদেশমালায় এবং প্রসঙ্গতঃ অন্যত্র আছে, তা ছাড়া আছে কয়েকটি কবিতা ও গান। (বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ এদের পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করলে পারেন, যেমন তাঁরা করেছেন বুদ্ধ খ্রীষ্ট রামমোহন ও গান্ধী সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের রচনাবলী)।

মহর্ষি একদা উপনিষদের একখানি ছিন্নপত্র কুড়িয়ে পেয়ে যে শ্লোকটি আবিষ্কার করেন, সেই

ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা, মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনং॥

মন্ত্রের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ মহর্ষির জীবনের সার্থকতা লক্ষ্য করেছেন। বিপুল বিত্তের উত্তরাধিকারীর মাথার উপরে অতর্কিতে যখন অভ্রভেদী ঋণের অট্টালিকা ভেঙে পড়ল সেদিন এক বিষম পরীক্ষার সময়। সুবুদ্ধি আত্মীয়স্বজনগণ দেউলিয়া হয়ে সম্পত্তি রক্ষার পরামর্শ দিচ্ছেন, বিরাট পরিবারের সম্মুখে ভয়াবহ দারিদ্র্যের বিভীষিকা, এমন সংকটে অনেকেই সাংসারিক সুবুদ্ধির সুযোগ গ্রহণ করে। কিন্তু সেই ধর্মসংকট মহর্ষি যে অকুতোভয়ে অতিক্রম করে গেলেন তার মূলে ছিল মা গৃধঃ মন্ত্র। তিনি ঐশ্বর্যের মধ্যে ঈশ্বরমুখীন ছিলেন, সংকটের মধ্যে তিনি ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করলেন। সংকটে অভিভূত না হয়েও যে তিনি বিষয়ের অনেকটা অংশ রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিলেন, তাতেও তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়। মহর্ষির বৈষয়িক বুদ্ধি ছিল কিন্তু

তিনি বিষয়ী ছিলেন না ; তিনি নিরাসক্ত ছিলেন কিন্তু সংসার সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন না ; তিনি ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন কিন্তু সমাজকে ধর্মের উপর স্থান দেন নি। তাঁর চরিত্রে এইসব বিপরীত গুণের সমন্বয় হয়েছিল বলেই তিনি ব্রহ্মনিষ্ঠ হতে পেরেছিলেন। "তাঁহার দৃষ্টান্ত আমাদের সম্মুখে উপস্থিত ছিল"—কত বড় ভরসা তাঁর পুত্রগণের। রবীন্দ্রনাথ অন্যত্র বলেছেন "হে পরমপিতঃ, হে পিতৃতমঃ পিতৃণাম্, এ সংসারে যাঁহার পিতৃভাবের মধ্য দিয়া তোমাকে পিতা বলিয়া জানিয়াছি।—" মহর্ষি সম্বন্ধে এই দুটি উক্তি বিশেষভাবে স্মরণীয়, কারণ এদের মধ্যেই পাওয়া যাবে রবীন্দ্রকাব্যে ভগবদ্‌ধারণার নিগূঢ় রহস্যসন্ধান। সে আলোচনা যথাস্থানে হবে।

এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না মনে করে একটা বিষয়ের উল্লেখ করা যেতে পারে। দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা হওয়া সত্ত্বেও শান্তিনিকেতনে যে আশ্রমটি স্থাপন করলেন তা কোনো সম্প্রদায়বিশেষের স্থান হল না এবং আজ পর্যন্ত শান্তিনিকেতন সেই অসাম্প্রদায়িক লক্ষণ রক্ষা করে এসেছে। কিন্তু যাঁরা পুরানো কালের খবর রাখেন তাঁরা বলতে পারবেন এই আশ্রমকে সাম্প্রদায়িক করে তুলবার চেষ্টা কখনো কখনো হয়েছে। তখন পিতার দৃষ্টান্ত স্মরণ করে নির্মমহস্তে রবীন্দ্রনাথকে ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হয়েছে।— "তাঁহার দৃষ্টান্ত আমাদের সম্মুখে ছিল।"

আরও একটি কথা। রবীন্দ্রনাথ অনেকবার বলেছেন যে রামমোহন তাঁর hero, অর্থাৎ তাঁর চোখে আদর্শপুরুষ। এ রামমোহন কি বাস্তব মানুষটি না অন্য কিছু? এখানেও দেখতে পাব যে পিতার চোখে দেখা মানুষকেই তিনি রামমোহন রূপে গ্রহণ করেছেন।

"একদা পিতৃদেবের নিকট শুনিয়াছিলাম যে, বাল্যকালে অনেক সময়ে রামমোহন রায় তাঁহাকে গাড়ি করিয়া স্কুলে লইয়া যাইতেন ; তিনি রামমোহন রায়ের সম্মুখবর্তী আসনে বসিয়া সেই মহাপুরুষের মুখ হইতে মুগ্ধদৃষ্টি ফিরাইতে পারিতেন না, তাঁহার মুখচ্ছবিতে এমন

একটি সুগভীর সুগম্ভীর সুমহৎ বিষাদাচ্ছায়া সর্বদা বিরাজমান ছিল। পিতার নিকট বর্ণনা শ্রবণকালে রামমোহন রায়ের একটি অপূর্ব মানসী-মূর্তি আমার মনে জাজ্জ্বল্যমান হইয়া উঠে। তাঁহার মুখশ্রীর সেই পরিব্যাপ্ত বিষাদমহিমা, বঙ্গদেশের সুদূর ভবিষ্যৎকালের সীমান্ত পর্যন্ত, স্নেহচিন্তাকুল কল্যাণকামনার কোমল রশ্মিজালরূপে বিকীর্ণ দেখিতে পাই।·· আমি কল্পনা করিতেছি যে শকটে রামমোহন রায় আমার পিতাকে বিদ্যালয়ে লইয়া গিয়াছিলেন সেই শকটে অদ্য আমরা তাঁহার সম্মুখবর্তী আসনে উপবিষ্ট রহিয়াছি, তাঁহার মুখ হইতে মুগ্ধদৃষ্টি ফিরাইতে পারিতেছি না। দেখিতে পাইতেছি, এখনও তাঁহার সমুন্নত ললাটে ও উদার নেত্রযুগল হইতে সেই পুরাতন বিষাদচ্ছায়া অপনীত হয় নাই, এখনও তিনি ভবিষ্যতের দিগন্তাভিমুখে তাঁহার সেই গভীর চিন্তাবিষ্ট দূরদৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন।"

—ভারতপথিক রামমোহন রায়

এর পরে আর সন্দেহ থাকা উচিত নয় রবীন্দ্রনাথের রামমোহনের ধারণা সম্বন্ধে। এ বাস্তব মানুষটি নয়, রবীন্দ্রনাথদৃষ্ট 'একটি অপূর্ব মানসীমূর্তি'। এ মূর্তির কতকটা বাস্তবের সঙ্গে মিলতে পারে, অনেকটাই মিলবে না। রবীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত শিবাজী ও গুরু গোবিন্দ সিংহ যেমন বাস্তবে কল্পনায় মিলিয়ে, এ রামমোহনও তেমনি। আর সে কল্পনার ছটা এসেছে দেবেন্দ্রনাথের চোখ থেকে। বালক দেবেন্দ্রনাথ রামমোহনকে দেখে একটি মানসীমূর্তি গড়েছিলেন, বালক রবীন্দ্রনাথ সেই মূর্তির উপরে তাঁর ধারণা আরোপিত করে তাকে উন্নততর ও অধিকতর মহিমান্বিত করে তুলেছেন। এ রামমোহন পিতার হাত থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত। এ ক্ষেত্রেও দেবেন্দ্রনাথের বিপুল প্রভাব সুপ্রকট। এতক্ষণ যা বললাম তার নির্গলিতার্থ দাঁড়ায় এই যে রবীন্দ্রনাথের চোখ পিতার মধ্যে একটি মন্ত্রের মানবরূপ দেখেছে; সম্প্রদায়ের উপরে ধর্মকে কি ভাবে স্থাপন করতে হয় তার দৃষ্টান্ত দেখেছে; আদর্শ ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের প্রতিমূর্তি দেখেছে;

আর ভগবানকে যে পিতৃভাবের মধ্যে দিয়ে উপলব্ধি করবার সুযোগ পেয়েছেন সেও সাধকপিতার দৃষ্টান্তে।—"তাঁহার দৃষ্টান্ত আমাদের সম্মুখে ছিল।" সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথের আদর্শপুরুষ রামমোহন দেবেন্দ্রনাথের চোখে দেখা মানুষ, অপূর্ব মানসীমূর্তি। আর, আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রের বিশেষ উপনিষদের প্রতি রবীন্দ্রনাথের গভীর শ্রদ্ধা ও নির্ভর সেও দেবেন্দ্রনাথের কল্যাণে।

শৈশবে বাল্যকালে ও যৌবনে যখন মানুষের অন্তঃপ্রকৃতি ধীরে ধীরে গঠিত হয়ে উঠে নির্দিষ্ট আকার লাভ করে, এবং তাকে ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত করতে থাকে তখন দেবেন্দ্রনাথের চেয়ে মহত্তর মানুষ দেখবার সুযোগ রবীন্দ্রনাথের হয় নি; এই মহাপুরুষের নিত্য-সান্নিধ্য অগোচরে ও সগোচরে তাঁর মন ও মতামত গঠিত করে তুলেছে; পিতা ও পুত্র ভিন্ন পথের পথিক হলেও পুত্রকে এমন পাথেয় দিয়েছে যে পুঁজি কখনো নিঃশেষ হয় নি, বরঞ্চ পুত্রের প্রতিভার সংযোগে ঐশ্বর্যে পরিণত হয়েছে। দেবেন্দ্রনাথের দৃষ্টান্ত নিরন্তর তাঁর সম্মুখে না থাকলে এ সমস্তর ব্যতিক্রম হওয়া অসম্ভব ছিল না।

এতক্ষণ দেখলাম রবীন্দ্রনাথের চোখ দিয়ে দেবেন্দ্রনাথকে। এবারে দেখতে চেষ্টা করব আমাদের অর্থাৎ সাহিত্যপাঠকের চোখ দিয়ে রবীন্দ্রসাহিত্যে দেবেন্দ্রনাথের অনতিপ্রচ্ছন্ন মূর্তিকে।

বিপুল রবীন্দ্রসাহিত্যে দেবেন্দ্রনাথ কোথাও আছেন কি? মনে রাখতে হবে যে রবীন্দ্রনাথের দেখা মানুষের অনেকেই ঈষৎ রূপান্তরে রবীন্দ্রসাহিত্যে আছেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ আছেন বৈকুণ্ঠের খাতার বৈকুণ্ঠ চরিত্রে; সত্যেন্দ্রনাথ ও সরলাদেবী যথাক্রমে আছেন চিরকুমার সভায় চন্দ্রমাধববাবু ও নির্মলা চরিত্রে; শ্রীকণ্ঠ সিংহের প্রথম রূপান্তর বৌঠাকুরানীর হাটের বসন্ত রায় এবং পরবর্তীকালের ঠাকুর্দা চরিত্র সমূহে। খুব সম্ভব ব্রহ্মবান্ধব ও নিবেদিতার কতক উপাদান আছে

গোরা উপন্যাসের নায়কের মধ্যে। এমন আরও থাকা অসম্ভব নয়। দেবেন্দ্রনাথ রূপান্তরে কোথাও আছেন কি? আমার ধারণা রাজর্ষি উপন্যাসের নায়ক গোবিন্দমাণিক্য অনেক পরিমাণে দেবেন্দ্রনাথের ছাঁচে তৈরি। সেই ঐশ্বর্যের মধ্যে নিরাসক্ত ভাব, বিপদে সম্পদে অপ্রমত্ত বুদ্ধি এবং ধর্ম রক্ষার্থ অবিচলিত দৃঢ়তা দুই ক্ষেত্রেই সমান প্রকট। বস্তুতঃ দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন রবীন্দ্রনাথের চোখে রাজর্ষি, সেই রাজর্ষি ভাবটিরই প্রক্ষেপ রাজর্ষি গোবিন্দমাণিক্যে। আবার দেবেন্দ্রনাথের চরিত্রের কতক উপাদান পাওয়া যাবে গোরা উপন্যাসের পরেশবাবুতে; দুজনকেই ধর্মকে সম্প্রদায়ের উপরে স্থান দিতে গিয়ে প্রিয়জনের অপ্রিয়তা স্বীকার করতে হয়েছে। মানবরূপে আর কোথাও আছেন বলে আমার চোখে পড়ে নি।

এবারে যা বলতে যাচ্ছি তার তুলনায় এসব গৌণ। রবীন্দ্র-সাহিত্যে দেবেন্দ্রনাথের মানবরূপের চেয়ে ভাবরূপটাই অনেক বেশি প্রকট, যদিচ তা এমন প্রত্যক্ষ নয়।

রবীন্দ্রনাথের ভগবদ্‌ধারণা বহুল পরিমাণে মহর্ষির প্রভাবে গঠিত। রবীন্দ্রনাথ ভগবানকে পিতৃরূপেই ধারণা করতে অভ্যস্ত। এ অবশ্য ব্রাহ্মধর্মের সাধনা, তার মন্ত্র পিতা নোঽসি। কিন্তু যখন তিনি বলেন, "হে পরমপিতঃ, হে পিতৃতমঃ পিতৃনাম, এ সংসারে যাঁহার পিতৃভাবের মধ্য দিয়া তোমাকে পিতা বলিয়া জানিয়াছি"— তখন ব্রাহ্মধর্মের সাধনার সঙ্গে আর-একটি প্রভাব এসে যুক্ত হয়। মহর্ষির মতো পিতা পাওয়ার সৌভাগ্য না হলেও নিশ্চয় তিনি ব্রাহ্মধর্মের সাধনপন্থাই অনুসরণ করতেন, কিন্তু আদর্শ পিতা লাভ করবার ফলে ভগবানের পিতৃরূপ তাঁর মনে নিশ্চয় গভীরতর তাৎপর্য লাভ করেছে।

রবীন্দ্রনাথের ভগবান একাধারে পিতা আবার রাজা। ভগবানের প্রিয়রূপ তাঁর কাব্যে আছে কিন্তু রাজরূপটিতে তাঁর আগ্রহ সমধিক। রাজা নাটকের নায়ক রাজা ভগবান। ডাকঘরের অমল যার চিঠির

জন্য অপেক্ষা করছে সেও রাজা, যিনি নাকি ভগবান। খেয়া কাব্যে ভগবান বারে বারে রাজরূপে আবির্ভূত হয়েছেন। ভগবানের রাজরূপ তাঁর পরবর্তী অনেক কাব্যে পাওয়া যাবে। আমার বিশ্বাস ভগবানের এই রাজরূপ রাজর্ষি পিতার দৃষ্টান্ত দ্বারা উদ্বোধিত ও সম্বর্ধিত। -- "তাঁহার দৃষ্টান্ত আমাদের সম্মুখে ছিল।"

রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে বলেছেন "সীমার মধ্যেই অসীমের সহিত মিলন সাধনের পালা আমার কাব্যসাধনার একমাত্র পালা।" তাঁর কাব্য ও জীবনসাধনায় এ একটি মূলতত্ত্ব। সীমা ও অসীমের রহস্য, সীমার মধ্যে অসীমকে উপলব্ধি করবার দুরূহ প্রয়াস, দুটিকেই সমান সত্যজ্ঞানে জীবনে স্থায়িত্বদানের প্রচেষ্টা এবং মূল তত্ত্বকে জীবনে ও আধুনিক জটিল সমাজের সর্বক্ষেত্রে প্রয়োগ করবার দুঃসাহস রবীন্দ্র-কাব্য তথা রবীন্দ্রজীবনসাধনার মূলতম বিষয়। আমার বিশ্বাস এই মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রথম চেতনা, পরে আগ্রহ এবং সর্বশেষে একে জীবন-সাধনার বিষয় করে তুলবার মূলে মহর্ষির কল্যাণ প্রভাব ও মহৎ দৃষ্টান্ত সক্রিয়। তিনি বাল্যকাল থেকে দেখেছেন এই ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ কি গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে সংসারকে অগ্রাহ্য না করেও ব্রহ্মকে জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ বলে স্বীকার করেছেন; আবার ব্রহ্মকে সর্বোপরি স্থান দান করেও সাংসারিক কর্তব্যকে অবহেলা করেন নি। নিত্য সাহচর্যজাত এই উদাহরণ তাঁর মনে সীমা-অসীমের সম্বন্ধকে একটি তত্ত্বরূপে দান করেছে। প্রথম যৌবনে লিখিত রাজর্ষি উপন্যাসের গোবিন্দমাণিক্যে পিতার সাধনার যেমন পূর্ণ রূপ, তেমনি তৎপুর্বে লিখিত প্রকৃতির প্রতিশোধ নাটকের সন্ন্যাসী চরিত্রে তারই নঙর্থক রূপ। না ও হাঁ এ মিলিয়ে রবীন্দ্রসাধনার রূপটা এখানে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

মহর্ষি একান্তভাবে ভক্তিমার্গের পথিক ছিলেন, অদ্বৈতবাদের নামটি পর্যন্ত সহ্য করতে পারতেন না। "সর্বং খলু ব্রহ্ম এ মত আদি বা সাধারণ বা কোন ব্রাহ্ম সমাজেরই নয়···মনে রাখিস বাবা মশায় থাকলে তিনি কিছুতেই এ সহ্য করতেন না।" কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কি

সর্বৈব দ্বৈতবাদী ? তিনি যে বলেন "একাধারে তুমিই আকাশ তুমি নীড়।" নীড়ত্ব ও আকাশত্ব তোমারই বিভূতি তাদেরই ঘনীভূত রূপ তুমি। এ নিশ্চয় বিশুদ্ধ দ্বৈতবাদ নয়, মহর্ষির দ্বৈতবাদ তো নয়ই। তবে এমন হল কেন ?

রবীন্দ্রসাহিত্যে একটি দুরূহ contradiction আছে ; এই contradiction রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রধান আকর্ষণ ও ঐশ্বর্য। এই contradiction সঞ্জাত অভিঘাত শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রসাহিত্যকে তরঙ্গিত করে রেখেছিল, ওয়ার্ডস্বার্থের মতো নিস্তরঙ্গ সরোবরে পরিণত হতে দেয় নি। তিনি চিন্তার ক্ষেত্রে অদ্বৈতবাদী, তখন লেখেন প্রাচীন ভারতের একঃ, আবার অনুভূতির ক্ষেত্রে দ্বৈতবাদী, তখন লেখেন "তোমায় আমায় মিলন হবে বলে ফুল্ল শ্যামল ধরা।" আমাদের সৌভাগ্যবশতঃ রবীন্দ্রনাথের মধ্যে তাত্ত্বিকে ও কবিতে মিলন বা অভাবে আপোষ ঘটে যায় নি। তার ফলেই অনুসন্ধিৎসার প্রেরণায় তাঁকে নিত্য পথ চলতে হয়েছে, কোথাও থেমে যান নি। এই পথ চলাটার নাম সাধনা, আর মিলনটার নাম সিদ্ধি। কবির পক্ষে সাধনা অপরিহার্য, সিদ্ধি অনেক সময়ে বাধা। পুষ্পক রথ যতক্ষণ চলমান ততক্ষণ আকাশে তার স্থিতি, থেমে গেলেই ভূপতিত হয়। এখন এই contradiction-এর সূত্রেই রবীন্দ্রনাথের জীবনে রামমোহন এসে পড়েন, রামমোহন ও দেবেন্দ্রনাথ পাশাপাশি। রামমোহন জ্ঞানমার্গের সাধক, দেবেন্দ্রনাথ ভক্তিমার্গের। অথচ রবীন্দ্রনাথের উপরে দুজনেরই অপরিসীম প্রভাব। রামমোহন তাঁর আদর্শ, আর দেবেন্দ্রনাথ তাঁর কাছে আদর্শ পিতা। এখন, এ দুজনের সাধনাকে রবীন্দ্রনাথ কি ভাবে মিলিয়েছেন, কিংবা আদৌ মেলাতে পারেন নি, কিংবা সারাজীবন মেলাবার চেষ্টা করে গিয়েছেন, এ বিষয়ে একটি সিদ্ধান্ত হওয়া আবশ্যক। আগেই বলেছি তাত্ত্বিক রবীন্দ্রনাথ একঃ-র সাধক, কবি রবীন্দ্রনাথ দ্বৈতের সাধক। আরও বলেছি যে এ দুই স্বতোবিরুদ্ধকে মেলাবার চেষ্টা এবং সম্পূর্ণ মেলাতে

না পারবার দ্বন্দ্বরূপ contradiction রবীন্দ্রসাহিত্যে প্রধান আকর্ষণ, ঐশ্বর্য ও সঞ্জীবনী প্রেরণা। এই আদর্শ ও বাস্তবের দ্বন্দ্বটি অন্য এক প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন। জয়সিংহের মুখে গোবিন্দমাণিক্যের প্রশংসায় বিচলিত রঘুপতিকে জয়সিংহ বলছে—

প্রভু, পিতৃকোলে বসি
আকাশে বাড়ায় হাত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিশু
পূর্ণচন্দ্র পানে, দেব, তুমি পিতা মোর,
পূর্ণশশী মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য।

রবীন্দ্রনাথের পিতা বাস্তব সিদ্ধি, রামমোহন সাধিত আদর্শ। দুজনেই তাঁর চোখে মানুষের কিছু বেশি, দুজনে জীবনের দুই ভিন্ন ভাবের symbol বা প্রতীক।

এবারে কথা শেষ করবার আগে যে প্রসঙ্গ দিয়ে শুরু করেছিলাম আবার সেখানে ফিরে আসা যেতে পারে। জিজ্ঞাসা করেছিলাম রবীন্দ্রনাথ দেবেন্দ্রনাথের পুত্ররূপে তাঁর গৃহে জন্মগ্রহণ না করলে রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রকৃতি কি রকম হত; অবস্থান্তরেও মহৎ সাহিত্য সৃষ্টি হত নিঃসন্দেহে। কিন্তু যেরূপে পেয়েছি এমনটি নিশ্চয় হত না। কিন্তু সে সাহিত্য যতই মহৎ হোক এমন সার্বজনীন উদার ও বহুমুখী হত কি না সন্দেহ, হত না বলেই মনে হয়। এখন আমার এই বিশ্লেষণ ও বিচার যদি স ্য হয় তবে রবীন্দ্রনাথের কাব্য প্রকৃতি ও জীবনসাধনার উপরে দেবেন্দ্রনাথের প্রভাব সুগভীর ও সর্বব্যাপক বলে স্বীকার করতে হয়, বস্তুতঃ এমন প্রভাব আর কোনো মানুষের নয় আমি নিঃসন্দেহ।

রবীন্দ্রজন্ম শতবার্ষিক অভিভাষণ

রবীন্দ্র সাহিত্যানুরাগী সুধীসমাজের এই সভায় কোন বিতর্কের *উপস্থাপনা আজ করবার ইচ্ছা আমার নাই।* *আর তার ক্ষেত্রও এই* সভা নয় কিংবা রবীন্দ্র সাহিত্য ও জীবন সম্পর্কে কোন নূতন তথ্য ও গভীর তত্ত্ব উপস্থিত করতেও চেষ্টা করব না, কারণ তেমন শক্তির অধিকারী আমি নই। ইংরেজী চলতি বৎসরের প্রথমে নিখিল-ভারত বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের বোম্বাই অধিবেশনে কবিগুরুর জন্মের শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে যে আলোচনার সূত্রপাত হয়েছিল, নিখিল-ভারত বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের বর্তমান অধিবেশনকে তারি উপসংহার বললে, বোধকরি অন্যায় হবে না। এই এক বৎসরকাল শুধু এই সাহিত্য সম্মেলন নয়, সমগ্র দেশ যে সার্বজনীন রীতিতে কবিগুরুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছে পৃথিবীর সাহিত্যের ইতিহাসে বোধকরি তার তুলনা নেই। কোন দেশ কোন কবিকে নিয়ে এমন ব্যাপক উৎসবের আয়োজন আগে করে নি,। বোধকরি এর পরেও আর এমন দৃষ্টান্ত দেখা যাবে না। এই যে একটা অভূতপূর্ব ব্যাপার ঘটলো এর অর্থ টা ভেবে দেখবার যোগ্য। উৎসব মাত্রের মধ্যেই একটা হুজুগের ভাব আছে, গতানুগতিকতার ভাব আছে, প্রতিবেশীর সঙ্গে আড়াআড়ি করে নিজেকে জাহির করবার চেষ্টা আছে। এই ব্যাপারেও তেমন থাকা অসম্ভব নয়। কিন্তু এটাই বর্তমান উৎসবের সাকুল্যরূপ নয়। কবিগুরুর হাত থেকে সমস্ত দেশ ষাট বৎসরের উপর যে দিব্য ঐশ্বর্য গ্রহণ করেছে সেই ঋণ শোধ করবার চেষ্টা এই উৎসবের একটি প্রেরণা বলা যেতে পারে। কিন্তু আরও কিছু আছে। সমস্ত দেশ আপনার অগোচরে একটি মহৎ ঐক্যবিধায়ক প্রতীককে যেন সন্ধান করছিল। কবিগুরুর উদার ও ঐশ ব্যক্তিত্ব যেন সেই ঐক্য বিধায়ক প্রতীক। ভারতবর্ষের ইতিহাসের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে

গিয়ে তিনিই আমাদের শুনিয়েছেন যে বিরোধের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা ভারত-ইতিহাসের অন্তর্নিহিত প্রেরণা। তাঁর ব্যাখ্যার পরে থেকে এখন সকলেই কি ঐতিহাসিক, কি সাহিত্যিক, কি রাজনীতিক সকলেই এই প্রসঙ্গে বিরোধের মধ্যে ঐক্য বা "Unity in Diversity" সূত্রটার উল্লেখ করে থাকেন। কথাটা সমূহ সত্য। দেশের দিকে তাকালেই দেখা যাবে ভাষায়, ধর্মে, সম্প্রদায়ে, স্বার্থে, আচারে ও আচরণে—আপাত বিরোধ বা অনৈক্যটাই প্রত্যক্ষ হয়ে প্রকাশ। এই পুঞ্জীভূত বিরোধের মধ্যে সমতার সন্ধান পাওয়া অনেক সময় কঠিন হয়ে পড়ে। অবশ্যই ভিতরে ভিতরে কোথাও একটা ঐক্যের বন্ধন আছে—নতুবা এ দেশ সংহত হয়ে বিধৃত হয়ে আছে কোন সূত্রে? এখন এই অন্তর্নিহিত ঐক্যটাকে মানুষ চোখে দেখতে চায়। কিন্তু তেমনি একটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যরূপ পাই কোথায়? এ দেশে ধর্মগুরু, মহাপুরুষ, বীরপুরুষ প্রভৃতি অনেকে জন্মগ্রহণ করেছেন, কিন্তু একটু ভাবলেই দেখা যাবে বর্তমান পরিস্থিতিতে তাঁরা কেউ সার্বজনীন অভাব মেটাতে সক্ষম নন। বাকি থাকলো এ দেশের মহা-কবিগণ। বাল্মীকি, বেদব্যাস, কালিদাস, তুলসীদাস, প্রভৃতি অনেক কবি সার্বভৌম জন্মগ্রহণ করেছেন এ দেশে। রবীন্দ্রনাথ এই মহতী ধারারই শেষতম দৃষ্টান্ত। কিন্তু এখানে একটু ভাবলে দেখা যাবে যে, এঁদের মধ্যে সার্বজনীনতার বিপুল সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথে কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যা পূর্বসূরীদের ছিল না। তাঁরা চিরকালের মানুষের কথা শুনিয়েছেন, দেশকাল ইতিহাস নির্বিশেষে যে মানুষ দণ্ডায়মান সেই মানুষের জয়ধ্বনি করে গিয়েছেন তাঁরা। রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠও যোগ দিয়েছে সেই জয়ধ্বনিতে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে তাছাড়া আরও একটি সুর ধ্বনিত হয়েছে পূর্বসূরী "মহাকবির কল্পনাতে ছিল না যার ছবি"।

রবীন্দ্রনাথ চিরকালের মানুষের কথা বলবার সঙ্গেই হরিপদ

কেরাণীর কথা বলেছেন যে বেচারী নিতান্তই আমাদের কালের মানুষ।

রবীন্দ্রনাথ চিরকালের সুখ দুঃখের কথা বলবার সঙ্গেই বাস্তুহারা উপেনের "দুই বিঘা জমির" দুঃখের কাহিনী শুনিয়েছেন—যা নিতান্তই একালের কথা। রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্যের স্বর্গলোক সৃষ্টি করবার সঙ্গেই "স্বর্গ হইতে বিদায়ের" বার্তা শুনিয়েছেন—যা বিশেষভাবে স্বর্গভ্রষ্ট এ যুগের মানুষের মনকে স্পর্শ করে। রবীন্দ্রনাথ মহাকবি হওয়ার সঙ্গেই এ যুগের কবি, মহামানব হওয়ার সঙ্গেই এ যুগের মানব। সেইজন্যে স্বভাবতঃই এ যুগ তাঁর সঙ্গে আত্মীয়তা অনুভব করে। আরো কিছু আছে। এ যুগের মহাকবিদের কেবল প্রতিভা থাকাই যথেষ্ট নয়; সেই মহতী প্রতিভাকে স্বর্গ থেকে বিদায় নিয়ে নেমে আসতে হবে মর্ত্যের ধুলোমাটির মধ্যে। তাকে পায়ে পায়ে জরিপ করে চলতে হবে সংসারের সমস্ত তুচ্ছ সুখ দুঃখকে, সংসারের ছোট বড় সমস্ত সমস্যাকে স্পর্শ করতে হবে তার মনীষা দিয়ে। এ এক রকম দেশকে আত্মসাৎ করে নেওয়া। এই কাজটি যিনি করতে পারেন সমস্ত দেশ সংহত হয়ে তাঁর মধ্যে যেন কেন্দ্রীভূত হয়। এ হেন ব্যক্তিকে দেশের প্রতিনিধি বা প্রতীক স্থানীয় বললে বোধকরি অন্যায় হয় না। এ যুগে নিজ প্রতিভা বলে রবীন্দ্রনাথ সেই প্রতীকে পরিণত হয়েছেন। ইচ্ছা করলে তাঁর মধ্যে দেশের বিশ্বরূপ দর্শন অসম্ভব নয়। শতবর্ষ-পূর্তি উৎসবের ফলে আমাদের মধ্যে যদি সেই দৃষ্টির সামান্যমাত্র স্ফুরণও হয়ে থাকে তবে বুঝতে হবে উৎসব সার্থক হয়েছে, বুঝতে হবে উৎসবের প্রয়োজন ছিল। সত্যই প্রয়োজন ছিল, সে প্রয়োজন এখনো ফুরোয়নি, Diversityর আন্তরিক বাহুল্যের মধ্যে Unityর দর্শন লাভ যদি সার্বজনীনভাবে সত্য না হয়ে ওঠে তবে সঙ্কটের চোরা পাহাড়ে লেগে রাষ্ট্র-তরণীর যে কোন মুহূর্তে বানচাল হওয়ার আশঙ্কা। এ এমন একটা সাধারণ অভিজ্ঞতা যে বাড়িয়ে বলা অনাবশ্যক। ভরসার মধ্যে কবিগুরুর

প্রতীকী ব্যক্তিত্ব যা ঐক্যের সূত্রে ধর্ম স্বার্থ ভাষা নির্বিশেষে লোকের মনকে গ্রথিত করে রাখতে পারে। কিন্তু এ ভাবে রক্ষা পেতে হলে সাধনা আবশ্যক। শতবর্ষ-পূর্তি উৎসব সাধনার একটি অঙ্গ। সাধনার বৃহত্তর ও কঠিনতর অঙ্গ রবীন্দ্র সাহিত্য চর্চা। অবশ্য তা একদিনে হওয়ার নয়, আর সংক্ষেপে হওয়ার তো নয়ই। এই উৎসব তাতেও প্রেরণা জুগিয়েছে মনে করলে অন্যায় হবে না।

এতক্ষণ আমরা শতবর্ষ-পূর্তি উৎসবের গুরুত্ব ও প্রয়োজন বোঝাতে চেষ্টা করেছি, বলতে চেয়েছি যে ব্যাপারটাকে একটা সাময়িক উত্তেজনামাত্র মনে করা উচিত হবে না, এর মধ্যে ঐতিহাসিক একটা অভিপ্রায় আছে মনে করতে হবে,—দেশের চিত্ত অন্ধকার হাতড়ে মরছে একটা সার্বজনীন প্রতীকের সন্ধানে, ভারতব্যাপী এই উৎসবে তারই আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠা। এ কথা যদি সত্য হয় তবে এমন গভীর ব্যঞ্জনা-পূর্ণ উৎসব এদেশে কদাচিৎ ঘটেছে। কাজেই উৎসবটিকে নিয়ে যেমন গৌরব করবো তেমনি গুরুভার দায়িত্ব বহন করবার জন্যেও প্রস্তুত হতে হবে। উৎসবটির বিরাট পরিপ্রেক্ষিত মনে রাখলে সমালোচকের দায়িত্ব বেড়ে যায়। একবছর ধরে কবিগুরু সম্বন্ধে কথিত ও লিখিত আলোচনার হিমানী-স্খলন দেখলে মনে এই ধারণা জন্মায় যে কবিগুরুর প্রতি আমাদের ভক্তি ও শ্রদ্ধা যত বেশি জ্ঞান তত বেশী নয়। অবশ্য বহু লোক যেখানে লিখছে সেখানে ঐ রচনার উচ্চ মান আশা করা ঠিক নয়। কিন্তু সেই সঙ্গে সতর্কবাক্য উচ্চারণ না করাও অন্যায় হবে। এই হিমানী-স্খলন যখন সমতল ভূমিতে নেমে এসে ব্যাপক বন্যার সৃষ্টি করবে সেই প্রলয় পয়োধিজলে রবীন্দ্রচর্চার শীর্ণ তরী যদি বানচাল হয় তবে অদৃষ্টকে দোষ দিলে চলবে না। সাহিত্য বিষয়ে সকলে এক সুরে এক ছাঁদে কথা বলায় এ সম্ভবও নয়, উচিতও নয়, কিন্তু কথা বলবার অধিকার থাকা আবশ্যক। সার্বজনীন পূজায় সর্বজনের প্রবেশ স্বীকার করতে হয়, কিন্তু সর্বজনের অধিকার অঞ্জলি

দানে, নূতন নূতন মন্ত্র প্রণয়নে নয়। এখানে সেই রকম ব্যাপার ঘটেছে। এর আবার বিচিত্র প্রকৃতি। কোথাও বা অজ্ঞান কোথাও বা অতিজ্ঞান। কোথাও স্বদেশবাসীদের খুশী করবার উদ্দেশ্যে বিশেষণের পুষ্পপুঞ্জ স্তূপীকৃত হয়ে কবিগুরুর মূর্তিকে ঢেকে দিয়েছে, কোথাও বা বিদেশীদের খুশী করবার উদ্দেশ্যে প্রাপ্য পুষ্পমুষ্টি থেকে কবিগুরুকে বঞ্চিত করা হয়েছে। অবিদগ্ধ বুদ্ধির আক্রমণ এ যুগের একটা মস্ত সমস্যা। তার আক্রমণ প্রতিরোধ করতে গেলে "গণতন্ত্র নিপাত গেল" রব ওঠে; তার আক্রমণ অপ্রতিহত থাকলে সভ্য সমাজের অতলে তলিয়ে যাওয়ার আশংকা দেখা দেয়। রবীন্দ্র শতবর্ষ উৎসব এর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ, তাছাড়া প্রশংসাপত্র সংগ্রহের মনোভাবটাও পরিত্যাগ করতে হবে—বিশেষতঃ বিদেশীদের কাছ থেকে। কোথাও একটা উঁচু মাথা দেখলেই প্রশংসাপত্রের জন্য হাত বাড়িয়ে দেওয়ার মধ্যে যে হীনতা আছে, স্বার্থবুদ্ধিরূপ রিপু খুব প্রবল না হ'য়ে উঠলে তা বুঝতে কষ্ট হওয়ার কথা নয়। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখতে অনুরুদ্ধ হ'য়ে কোন বিদেশী সাহিত্যিক অধ্যাপক জানিয়েছিলেন যে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে এত বাড়াবাড়ি করবার হেতু তিনি খুঁজে পান না, তার ধারণায় Ram Prasad Sen is a greater poet than Rabindranath. এ অবশ্য শোনা কথা কিন্তু সব শোনা কথাই মিথ্যা নয়। গাল বাড়িয়ে দিয়ে অজ্ঞ ব্যক্তির হাতে চড় খাওয়া কেন। বিশেষ আঘাতের সবটা যখন প্রশংসাপত্র প্রার্থীর গায়ে লাগছে না। আবার বিদেশে গিয়ে রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্বন্ধে বক্তৃতার উপযোগিতা সম্বন্ধেও সন্দেহ আছে অনেকের মনে। যে শ্রোতৃ-মণ্ডলীর সকলেই বাংলা ভাষায় অ, আ, ক, খ সম্বন্ধে অজ্ঞ, সাধারণভাবে বাংলা সাহিত্য তথা ভারতীয় সাহিত্য সম্বন্ধেও উদাসীন তাদের মধ্যে গিয়ে গায়ে পড়ে রবীন্দ্রসাহিত্য প্রচার স্বাধীন স্বপ্রতিষ্ঠিত জাতির যোগ্য নয়। বিদেশে সত্যই যদি কারো মনে

রবীন্দ্রসাহিত্য সম্বন্ধে আগ্রহ জেগে থাকে তবে আসুক সে বাংলাদেশে, বসুক সে বাঙালী ছাত্রের সঙ্গে একাসনে, পড়ুক সে বর্ণ পরিচয়, তারপর যথা সময়ে পৌঁছবে বোধোদয়ে। রবীন্দ্রসাহিত্য তার পরের কথা। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে যথার্থ গৌরব বোধ থাকলে এই দৃষ্টিতেই দেখতাম। কিন্তু না তা হওয়ার উপায় নাই। কেননা, যুগের বিচিত্র নিয়মে রবীন্দ্রনাথ এখন রাজনৈতিক পাশা খেলার একটি ঘুঁটিতে পরিণত হয়েছেন। কোন্ জাত কত রবীন্দ্রসাহিত্য ভক্ত—এই রেষারেষির পথে সকলেই প্রবেশ করতে চেষ্টা করছে ভারতীয় রাজনীতির খাস দরবারে। ভারত সরকারও বড় গররাজি নন—রবীন্দ্র-সাহিত্যের ক্যাশ সার্টিফিকেট তারা পুরা দামে ভাঙাতে চেষ্টা করছেন বিশ্বের বাজারে। এর মধ্যেও দীনতা আছে—সে দীনতা সাবালক জাতের যোগ্য নয়।

এই উপলক্ষ্যে একটা কথা উঠেছে যে রবীন্দ্র-সাহিত্যকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিতে হবে। কথাটা আলোচনা করা যাক। রবীন্দ্র-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ অংশ গীতি-কবিতা যার তুলনা নেই বললেও চলে। কিন্তু গীতি-কবিতা তো ভাষান্তরে বহনযোগ্য নয়; ভাষান্তরে বাহিত হলে তার প্রাণ থাকে না। এহেন বস্তু ভাষান্তরে বহনের দায়িত্ব গ্রহণ করবে কে? আর ভাষান্তরে বাহিত হলেও রবীন্দ্র-প্রতিভার প্রমাণ দাখিল করতে সক্ষম হবে না। ইংরাজী গীতাঞ্জলির সাহিত্যিক সাফল্যের দৃষ্টান্ত অনেকের মনে পড়বে। কিন্তু ইংরাজী গীতাঞ্জলি তো অনুবাদ নয়—নূতন সৃষ্টি। এখন আর তা সম্ভব নয়। কাজেই রবীন্দ্র-সাহিত্যের অপেক্ষাকৃত গৌণ অংশ, বিশেষভাবে তাঁর ছোট গল্পগুলো ভাষান্তরিত করে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে। কিন্তু তাতেও পৌঁছে দেওয়া হবে না রবীন্দ্রনাথের যথার্থ পরিচয়। গীতি কবিতা যাঁর প্রধান সম্পদ তাঁর পক্ষে এরকম অসুবিধা অপরিহার্য। অতএব দেখা যাচ্ছে যে পাশ্চাত্য জগতের কাছে তাঁর প্রধান পরিচয় হবে মনীষী রূপে, ভারতের বাণীবাহকরূপে, মানব-প্রেমিক ঋষিরূপে। সেই সঙ্গে

জনশ্রুতিতে থাকবে যে তিনি একজন অসামান্য কবিও বটেন। এ মেনে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই। আরও একটা কথা। বিভিন্ন দেশে রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থের অনুবাদ হচ্ছে ; মুদ্রণ সংখ্যা চমকে দেয়—আমাদের পক্ষে গৌরব বোধ করা খুবই স্বাভাবিক। তবু, একটা সন্দেহের কুশাঙ্কুর মনের মধ্যে খোঁচা দেয়। কী অনুবাদ হচ্ছে ? সাত নকলে আসল খাস্তা হচ্ছে না তো ? জ্ঞানকৃত বিকৃতি পরিবেশিত হচ্ছে না তো ? সম্যক বুঝবার উপায় নাই—অধিকাংশ ভাষাই অধিকাংশের অজ্ঞাত। রবীন্দ্রসাহিত্য যদি ভারতের পরিচয় বহন করে, তবে সে পরিচয় যাতে বিকৃত না হয় সে দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু কে গ্রহণ করবে এ দায়িত্ব ? বিশ্বভারতী, গ্রন্থের স্বত্বাধিকারী, ভারত সরকার,—কে ? এ বিষয়ে তাঁদের হুঁস আছে মনে হয় না। আগে অনেকবার এ সমস্যা উত্থাপন করে সাড়া পাই নি। আর হুঁস থাকলেও সাহসের আবশ্যক। কেউ-ই প্রথম ঢিলটি ছুঁড়তে চান না। আর যদি এ জাতীয় বিকার রোধ করবার ক্ষমতা আইনের হাতে না থাকে তবে অবশ্যই নিরুপায়।

কবিগুরুর শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যকে স্মরণীয় করে রাখবার উদ্দেশ্যে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে রবীন্দ্র-অধ্যাপক পদ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব হয়েছে। ইতিমধ্যেই কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয় রবীন্দ্র-অধ্যাপক পদ প্রতিষ্ঠা করে পদাধিকারীর নাম ঘোষণা করেছেন। আপনলোককে অনাদর করবার স্বাভাবিক অধিকারের বলে পশ্চিমবঙ্গ এখনো নিরুদ্যত। যাবতীয় রবীন্দ্র-অধ্যাপক পদের মধ্যেও একটি অভিপ্রায়গত ছাঁচ বা প্যাটার্ন থাকা আবশ্যক। সম্প্রতি অনেকে জাতীয় সংহতি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছেন। আর রবীন্দ্র সাহিত্য যে বিচিত্র বিভেদের মধ্যে একটি ঐক্যবিধায়ক শক্তি এ কথা আগেই বলেছি। এখন এই রবীন্দ্র অধ্যাপক পদগুলি যাতে এই ঐক্যবিধায়ক শক্তির বাহনরূপে জাতীয় সংহতি সাধনে সাহায্য করতে চেষ্টা করে—সেই দিকে লক্ষ্য রেখে এই অধ্যাপক পদগুলি প্রতিষ্ঠিত ও নিয়ন্ত্রিত হওয়া

আবশ্যক। আর তা করতে হলে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের রবীন্দ্র-অধ্যাপক পদগুলির মধ্যে লক্ষ্য ও অভিপ্রায়ের সংগতি সাধনের উদ্দেশ্যে রবীন্দ্র সাহিত্যের একজন জাতীয় অধ্যাপক, ন্যাশনাল প্রফেসার নিযুক্ত হওয়া অত্যাবশ্যক। উক্ত অধ্যাপক পদগুলি যদি কেবল আনুষ্ঠানিক ব্যাপার মাত্র না হয়, যদি ঐগুলি ঐতিহাসিক অভিপ্রায়ের ধারক বাহক হয়, তবে আমার এ প্রস্তাবটি চিন্তা করে দেখবার যোগ্য বলে মনে করি। এবারে উপসংহার। গোড়াতেই বলেছি যে রবীন্দ্র সাহিত্য সম্বন্ধে গুরুতর কোন তত্ত্বের অবতারণা করব না। আশাকরি যে সে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছি। উপসংহারে সে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করব এমন আশঙ্কার কারণ নাই।

সাহিত্যিক হিসাবে গৌরব করবার সাহস দিয়েছে আমাদের মনে রবীন্দ্র-সাহিত্য। সাহিত্যকে নিছক শিল্প-কর্মের স্তর থেকে উচ্চতর পর্যায়ে টেনে তুলেছে রবীন্দ্র-সাহিত্য। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টান্তে সাহিত্যিক আজ আর শুধু শিল্পী বা বাগ্‌বণিক নয়, তার আসন আজ সাধক ও তত্ত্বজ্ঞানীর পার্শ্বে; ব্যাস-বাল্মীকি কালিদাস তুলসীদাস প্রভৃতি মহাকবির ধারা আমাদের সমকালে প্রবাহিত হ'ল রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবে। তাঁর দিব্য বাণীর বৈদ্যুৎ সূত্রে গ্রথিত হ'য়ে মানুষ আরেকটু কাছে এসে পড়েছে মানুষের, বিশ্বপ্রকৃতি আর একটু কাছে এসে পড়েছে মানুষের হৃদয়ের, ভগবানের উপলব্ধি আর একটু উজ্জ্বল হয়ে উঠছে মানুষের মনে, চিরকালের জন্য তিনি বাড়িয়ে দিয়ে গিয়েছেন আমাদের দিন-রাত্রির মূল্য। ধন্য আমরা যে এ হেন মহা-পুরুষের সমকালে জন্মগ্রহণ করেছি। তবু এক একবার মনে হয় মহাপুরুষের সমকালে জন্মগ্রহণ বোধ করি অবিমিশ্র সৌভাগ্য নয়। কোন এক দূর কালে, দূর দেশে ইতিহাসের কোন এক অনাগত দিগন্তে জন্ম-লাভ করলে তবেই হয়তো সম্যক অর্থোপলব্ধি ঘটতো রবীন্দ্রনাথের বিপুল ব্যক্তিত্বের ও বিপুল রবীন্দ্রসাহিত্যের।

রবীন্দ্র জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে অভিভাষণ[১]

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কেরল Fine Art, society-তে কিছু বলবার আহ্বান পেয়ে একসঙ্গে আনন্দিত ও বিস্মিত বোধ করলাম। আনন্দের কারণ সহজেই অনুমেয়। প্রিয়জনের বা প্রিয় বিষয়ের কথনে সকলেই আনন্দ অনুভব ক'রে থাকে; রবীন্দ্রনাথ একাধারে প্রিয়জন ও প্রিয়বিষয়; রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রসাহিত্য একাত্ম; আর কোন সাহিত্যিক ও তাঁর রচিত সাহিত্য এমন একাত্ম হয়ে উঠেছে কিনা সন্দেহ; রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিচিত্র ও বিপুল ব্যক্তিত্বকে নিঃশেষে তাঁর সাহিত্যের অধারে ঢেলে দিয়ে দু'য়ে একীভূত হ'য়ে দেখা দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ শব্দটি উচ্চারণ করবামাত্র, কিংবা তাঁর চিত্র দেখবা মাত্র একসঙ্গে আমাদের মনে সাহিত্যে ও সাহিত্যিকে জড়িত একটি বিরাট ব্যক্তিত্বের স্মৃতি জেগে ওঠে। এহেন ব্যক্তি ও বিষয় আমাদের অস্তিত্বের অঙ্গীভূত হ'য়ে গিয়েছে তার সম্বন্ধে কিছু বলবার চেষ্টাতে যে আনন্দ অনুভূত হবে তা নিশ্চয় আপনারা বুঝতে পারছেন। এই তো হল আনন্দের কারণ, এখন বিস্ময়ের কারণ কি? শিক্ষিত বাঙালী সমাজের মধ্যে আমার কিছু পরিচয় থাকলেও এখানে আমি সম্পূর্ণ অপরিচিত, এমন অবস্থায় আপনাদের আহ্বান গিয়ে যখন পৌঁছলো তখন বিস্মিত না হয়ে পারি নি। হয় তো কোন বন্ধুর মুখে আমার নাম আপনারা শুনে থাকবেন, হয়তো তিনি বলে থাকবেন যে এ বিষয়ে বলবার কিছু যোগ্যতা আমার আছে, তিনি যে বন্ধুত্বের কাজ করেছেন তা মনে হয় না, আপনারা আর বেশি বিচার না ক'রে আমাকে আমন্ত্রণ করেছেন। আপনারা যদি অবিবেচনার কাজ ক'রে থাকেন তবে সে দায়িত্ব আপনাদেরই বহন করতে হবে।

প্রথম বিস্ময়ের বেগ কমতেই মনে হ'ল সত্যই এত বিস্ময়ের কিছু আছে কি? ব্যক্তিগত যোগ্যতা যতই অল্প হোক রবীন্দ্র-সাহিত্যের

---

১ কেরল ফাইন আর্টস সোসাইটিতে পঠিত—এর্নাকুনাম

প্রতি প্রীতি ও আকর্ষণেই আপনাদের সঙ্গে আমার সত্যকার যোগ, আর সে যোগসূত্র দুই পক্ষের অগোচরে ভিতরে ভিতরে যুক্ত হ'য়ে আছে, সূতোয় একটুখানি টান দিতেই দীর্ঘপথ অতিক্রম ক'রে আমাকে এখানে চলে আসতে হয়েছে। কাজেই প্রথমে যা বিস্ময়কর মনে হ'য়েছিল পরে তাকেই অত্যন্ত স্বাভাবিক বলে বুঝতে পারলাম। বাস্তবিক সাহিত্যিকগণ মানুষে মানুষে মালা গেঁথে চলেছেন, সে গাঁথুনি ভাষার ভেদ ধর্মের ভেদ দেশের ভেদ কিছুই মানে না। রবীন্দ্রনাথ তথা ভারতের সমস্ত শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক এই খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত বৃহৎ দেশকে এক করবার মহান দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। "দূরকে করিল নিকট বন্ধু, পরকে করিল ভাই।" কবির এ উক্তি কতদূর সত্য দেখুন, ব্যক্তিগত কোন যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও আপনাদের সম্পূর্ণ অপরিচিত হওয়া সত্ত্বেও আজ সাহিত্যের সূতোর টানে আপনাদের কত কাছে এসে পড়েছি।

প্রথমে অনুভূত আনন্দ ও বিস্ময়ের ব্যাখ্যা যখন পেলাম, তখন অন্য দুটি প্রশ্নের সম্মুখীন হলাম, কিংবা নিজেই দুটি প্রশ্ন করলাম নিজেকে। আপনারা কেন সাগ্রহে শ্রদ্ধার সঙ্গে রবীন্দ্র জন্মোৎসবের অনুষ্ঠান করছেন, আর এই উপলক্ষ্যে আপনাদের কাছে আমি কী বলবো? প্রশ্ন দুটির উত্তর চিন্তা করতে গিয়ে দেখলাম যে ওর উত্তরের মধ্যেই আমার জানবার, অভিভাষণ বীজাকারে নিহিত।

বাঙালী সমাজ যখন রবীন্দ্র জন্মোৎসব পালন করে তখন তার অর্থ বুঝতে কষ্ট হয় না। রবীন্দ্র-সাহিত্য, বিশেষভাবে তাঁর কবিতা ও গান আজ বাঙালীর নিত্যকার অন্ন জলে পরিণত। নিতান্ত শৈশবে, অনেক সময়ে অক্ষর পরিচয়ের আগে মায়ের মুখ থেকে শুনে রবীন্দ্রনাথের ছড়া আবৃত্তি করে যে শিশুর জন্মযাত্রা শুরু, তার জীবনের পর্বে পর্বে চিন্তার ও আবেগের ভোজ্য জুগিয়ে চলে রবীন্দ্রনাথের রচনা ও গান, আর হয় তো তার জীবনাবসানের শেষ নিঃশ্বাস পড়ে তাঁর সম্মুখে শান্তি পারাবার গানটি স্মরণ করে।

বিদ্যালয়ের নিম্নতম শ্রেণী থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ ধাপ অবধি বাঙালীর নিত্যকার সঙ্গী রবীন্দ্রনাথ, তার চিন্তায়, চেষ্টায় মননে ধ্যানে ও ভাবাবেগের ক্ষেত্রে। বাংলাদেশের সমস্ত সভা ও উৎসবে রবীন্দ্রনাথ গান, নাটক ও নৃত্য জুগিয়ে থাকেন, একই সঙ্গে তিনি চিন্তারাজ ও উৎসবরাজ। রবীন্দ্রনাথের জন্ম বৈশাখ মাসে, সমস্ত বৈশাখ মাস বাংলাদেশে ও বাঙালীসমাজে রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসবের সমারোহ চলে। বস্তুতঃ বছরের তিনশ পয়ষট্টি দিনই বাঙালী স্মরণ করে থাকে রবীন্দ্রনাথকে, তাঁকে স্মরণ না ক'রে জীবনের পথ চলা বাঙালীর পক্ষে আজ অসম্ভব। কাজেই বাঙালীর পক্ষে রবীন্দ্র জন্মোৎসব পালন একপ্রকার পিতৃঋণ ও ঋষিঋণ শোধ। ওর অর্থ সহজেই অনুমেয়। কিন্তু আপনাদের পক্ষে তো এ সব যুক্তি খাটবে না। রবীন্দ্রনাথ যে ভাষায় লিখেছেন সে ভাষা আপনাদের নয়। কেরলে বাংলা ভাষার সমাদর আজ শুনতে পাই, তৎসত্ত্বেও বাংলা ভাষায় রবীন্দ্র-সাহিত্য পড়বার সুযোগ আপনাদের ক'জনের হয়েছে ? ভারতীয় সংস্কৃতির এক কাঠামোর মধ্যে আমাদের সকলের অবস্থিতি সত্ত্বেও আপনাদের সংস্কৃতির সঙ্গে বাঙালীর সংস্কৃতির কিছু প্রভেদ আছে। উত্তর ভারতের সংস্কৃতির আবহাওয়া অনেকটা এক রকম, দক্ষিণ ভারতে তার প্রকৃতি অনেকটা ভিন্ন। তবে এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলবার লোভ সংবরণ করতে পারছি না, কেরলের সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা প্রকৃতির সঙ্গে বাংলাদেশের মিল আছে এবং নিশ্চয়ই এখানকার প্রকৃতি বাংলাদেশের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে রবীন্দ্রনাথকে আনন্দদান করতো। ব্যাস বাল্মীকি কালিদাস ভবভূতি প্রভৃতি সংস্কৃত ভাষায় লিখেছেন যে ভাষা ভারতের সার্বভৌম সম্পত্তি, দেশের সর্বত্র তাঁদের সমাদরের অর্থ সহজবোধ্য। কিন্তু যে কবি ভারতের এক প্রান্তীয় ভাষায় রচনা করেছেন, নিজ প্রদেশের বাইরে যে ভাষা বহু ব্যাপ্ত নয়, দেশের এই দক্ষিণতম প্রদেশে তাঁর সমাদরের কারণ তত সহজবোধ্য নয়। অবশ্য রবীন্দ্র-

সাহিত্যের সঙ্গে আপনাদের সকলেরই কিছু না কিছু পরিচয় আছে তবে তা অনুবাদের সাহায্যে। রবীন্দ্র-সাহিত্যের কতটুকু অংশ অনূদিত হয়েছে? অনুবাদের মূলের গুণ কতটুকু রক্ষিত হয়েছে? অনুবাদক যতই গুণী হোন এ সত্য প্রায় সর্বজন স্বীকৃত যে লিরিক কবিতার ভাষান্তর সম্ভব নয়, আর রবীন্দ্র প্রতিভার পরাকাষ্ঠা লিরিক কবিতায়। কাজেই ধরে নেওয়া যেতে পারে যে বাংলা ভাষার বাইরে রবীন্দ্র প্রতিভার শ্রেষ্ঠ অংশের পরিচয় অত্যন্ত সীমিত। তবে এ উৎসবের অর্থ কি? তবে কি এটা ফ্যাশান মাত্র? তা যদি হতো তবে আপনারা পূর্বপরিচয়হীন ব্যক্তির বদলে ফ্যাশানেব্‌ল কোন বক্তাকে আহ্বান করতেন। অনেক স্থানে, বাংলাদেশেরও অনেক স্থানে রবীন্দ্রজন্মোৎসব পালন একটা রীতি রক্ষা বা ফ্যাশান হয়ে দাঁড়িয়েছে বলেই কথাটা বল্‌লাম, বলা বাহুল্য আপনাদের সম্বন্ধে এর প্রযোজ্যতা আদৌ নেই। তবে আজকার উৎসবের অর্থ কি? কি এর তাৎপর্য? কারণ ছাড়া যখন কার্য হয় না সেই কারণটা কি? এ প্রশ্নের উত্তর যথাস্থানে দিতে চেষ্টা করবো, তার আগে আমার দ্বিতীয় প্রশ্নটির বিষয়ে আলোচনা করতে চাই। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কী বলবো আপনাদের কাছে।

বাঙালী সমাজে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কিছু বলা কঠিন নয়, সেখানে বক্তা ও শ্রোতা জ্ঞানের সমতলে বিরাজমান। তাছাড়া যেখানে এমন সব বিষয়ের উত্থাপন করা চলে যা নিতান্তই তৎস্থানিক ও তৎকালিক, বাঙালী শ্রোতার যে বিষয়ে কৌতূহল থাকলেও অন্য ভাষীর ও অন্যরাজ্যবাসীর তাতে আগ্রহ হওয়ার সম্ভাবনা নেই। আবার এমন সব বিষয় আছে ভাষার কাঠামোর সঙ্গে যার যোগ অচ্ছেদ্য হওয়ায় অনুবাদের অসাধ্য—সে সব বিষয় বাঙালী শ্রোতার পক্ষে অনায়াস হলেও অন্য ভাষী শ্রোতার পাতে তা দেওয়া চলবে না। তবে কি বলবার মতো কিছু নাই? অবশ্যই আছে। রবীন্দ্রনাথ যদি সাধারণ মাপের একজন লেখক হ'তেন তবে হয়তো তাঁর

রচনাকে বাদ দিয়ে বলবার কিছু থাকতো না। লোকোত্তর (great) প্রতিভার একটি লক্ষণ এই যে তার অর্থগত মূল্যকে ছাড়িয়ে যায় তার তত্ত্বগত মূল্য ; গোলাপ ফুল সুন্দর তবে ফুলটিকে যে দেখতে পেলো না, সুগন্ধ থেকে সে বঞ্চিত হয় না ; গ্যেটের ফাউস্ট কাব্য মূল ভাষায় পড়বার সৌভাগ্য যার হয় না, অনুবাদে, এমনকি অমন অনুবাদ স্বাদ পেতে তার বাধা হয় না, আবার বই না পড়ে মুখে মুখেও মূল কাব্যের দীপ্তির একটা আভাস পেতে পারে শ্রোতাতে। লিরিক কবিতা সম্বন্ধে এ নীতি চলবে না, কারণ তাতে অর্থগত ও তত্ত্বগত রূপ (spint and substance) অভিন্ন। লিরিক কবিতায় রবীন্দ্রনাথ প্রতিভার চরম হলেও তিনি তো কেবল লিরিক কবি নন। কবিতায় গানে, নাটকে, উপন্যাস, ছোটগল্প, সাহিত্য, রাজনীতি, সমাজ শিক্ষা ধর্ম প্রভৃতি বিষয়ক প্রবন্ধে, নূতন নূতন আঙ্গিকের নাটক ও নৃত্য পরিকল্পনায় জ্যোতির্ময় কলাপ বিস্তার করেছে তাঁর প্রতিভা। আর সেই জ্যোতির্ময় কলাপের দিব্যবিভা ভারতীয় চিত্তাকাশে অভিনব রামধনুর মতো বিকশিত হ'য়ে সকলকে সচেতন ক'রে দিয়েছে, বলেছে এ ভাস্বরতা কোন তৎস্থানিক বা তৎকালিক নয়—একটা সর্বভারতীয় তাৎপর্য আছে এর মধ্যে। সেই প্রভা কেরল থেকেও আপনারা দেখতে পেয়েছেন, অন্য ভাষার মাধ্যমেও দেখতে পেয়েছেন। স্থান ও কালের সীমা অতিক্রম ক'রে, ভাষার বন্ধন অতিক্রম ক'রে সার্বভৌম যদি কিছু থাকে রবীন্দ্রসাহিত্যের অন্তর্লোকে তবে তাই আজ বাচ্য এখানে। আর সেই কথা শুনবার আগ্রহেই দূর দূরান্ত থেকে পূর্ব পরিচয়হীন এক বক্তাকে আমন্ত্রণ ক'রে এনেছেন। এখানে এসে আমার প্রথম ও দ্বিতীয় প্রশ্নের জিজ্ঞাসা মিলিত হ'য়ে একটি অভিন্ন উত্তররূপে দেখা দিল।

জ্ঞানের দিক থেকে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আমার কিছু বলবার অধিকার আছে কি না জানি না, তবে আর এক দিক থেকে কিছু অধিকার আছে বলে মনে করি। সৌভাগ্যক্রমে দীর্ঘকাল তাঁকে

নিতান্ত কাছে থেকে দেখবার সুযোগ পেয়েছি। সত্য কথা বলতে কি রবীন্দ্রসাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় হওয়ার আগেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটেছিল। এরকম লোকের সংখ্যা ক্রমেই বিরল হয়ে আসছে, আর কুড়ি-পঁচিশ বছর পরে এ রকম লোক আর জীবিত থাকবে না। সে দিক থেকে বিচার করলে আমার কথার হয়তো কিছু মূল্য আছে। আমার বয়স যখন নয় বছরের বেশি নয় সেই সময়ে আমি আদিকালের শান্তিনিকেতনে ছাত্ররূপে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছিলাম, তখন বাংলাদেশের বাইরে তিনি সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিলেন। তারপরে একটানা সতেরো বছরকাল প্রথমে ছাত্ররূপে, পরে শিক্ষকরূপে শান্তিনিকেতনে বাস করেছি। বয়স কিছু বাড়বার সঙ্গে কবির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হ'য়ে তাঁর স্নেহ লাভ করেছি। এ বিষয়ে আমার কোন বিশেষ দাবী ছিল না, বস্তুতঃ তৎকালীন শান্তিনিকেতনের সমস্ত ছাত্রই তাঁর স্নেহের পাত্র ছিল, আমিও সেইরকম একজন।

রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা ও গুরু ছিলেন, সকলেই তাঁকে গুরুদেব বলতো, বল্‌লে কম বলা হয়, তিনি আশ্রমের সব ছিলেন, বালকদের খেলার সঙ্গী ও শিক্ষক, অধ্যাপকদের পরামর্শদাতা ও বন্ধু সমস্ত। দীর্ঘকাল তাঁকে এই প্রতিষ্ঠানের সমস্ত খরচ বহন করতে হয়েছে নিজের আয় থেকে। এই আশ্রম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ও কারণ নিজেই তিনি অনেকবার বিবৃত করেছেন। নিজের বাল্যকালে বিদ্যালয় জীবনের যে নীরস ও কঠোর অভিজ্ঞতা তাঁর হয়েছিল সেই অবাঞ্ছিত পরিবেশ থেকে দেশের বালকদের মুক্তিদানের উদ্দেশ্যে এই আশ্রমের প্রতিষ্ঠা। পারিবারিক জীবন ও বিদ্যালয়ের পরিবেশের মধ্যে তখন কোন যোগ ছিল না বরঞ্চ বিরোধ ছিল বল্‌লে অন্যায় হয় না। শান্তিনিকেতন আশ্রম তার প্রতিকারের চেষ্টা—এটি একটি বৃহৎ পরিবার ছিল, রবীন্দ্রনাথ সেই পরিবারের কর্তা, গুরু ও বন্ধু। আরও একটু বয়স বাড়লে তাঁর কাছে পড়বার সুযোগ পেয়েছি, অনেক সময়ে উৎসাহ লাভ করেছি, কখনো কখনো

মৃদু তিরস্কারও যে লাভ করি নি তা-ও নয়। স্বভাবতই বুঝতে পারছেন যে এইভাবে রবীন্দ্র ব্যক্তিত্বে অভিষিক্ত হ'য়ে তারপরে রবীন্দ্রসাহিত্যে প্রবেশ লাভ করেছি। এবং দেখেছি যে একটি অন্তর্-অঙ্গ, একটি বহিরঙ্গ, একটি আর একটির প্রতিফলন, দু'য়ে কোন বিরোধ নেই।

সাধারণতঃ বলা হয়ে থাকে অতি পরিচয়ের ফলে অবজ্ঞার সৃষ্টি হয়ে থাকে। ঘনিষ্ঠতায় কুয়াশা সৃষ্টি ক'রে পরস্পরকে আচ্ছন্ন ক'রে দিয়ে থাকে। এ কথা সত্য কি না জানি না, তবে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আদৌ সত্য নয় বলে বুঝেছি, বোধ করি কোন লোকোত্তর পুরুষ সম্বন্ধেই সত্য নয়। সাধারণ লোক সম্বন্ধে এই উক্তি যদি সত্য হয় তবে তার কারণ বুঝতে হবে যে কিছুকাল দেখলেই তাদের সঙ্কীর্ণ ব্যক্তিত্বের রস ফুরিয়ে গিয়ে পুরাতনের পুনরাবৃত্তি ঘটতে থাকে আর তার ফলে একপ্রকার বিতৃষ্ণার সৃষ্টি করে। কিন্তু যাঁদের ব্যক্তিত্ব অপরিমেয় পরিচয়ের ঘনিষ্ঠতায় তা নিঃশেষ হয় না, নিত্য নূতন চমকে মানুষকে মুগ্ধ করতে থাকে, বরঞ্চ বলা উচিত যে দীর্ঘকালের পরিচয় ছাড়া তাঁদের ব্যক্তিত্বের মহিমা বুঝতে পারা যায় না। শান্তিনিকেতনে বাসের ফলে প্রথমে বুঝতে পেরেছিলাম যে তিনি লোকোত্তর (great) পুরুষ, তারপরে বুঝেছিলাম যে তিনি লোকোত্তর কবি। লোকোত্তর ব্যক্তি না হয়েও লোকোত্তর সাহিত্যিক হওয়া সম্ভব, এমন সাহিত্যিকের সংখ্যাই বেশি। কিন্তু কখনো কখনো দেশের সৌভাগ্যের ফলে এমন এক একজন লোকোত্তর পুরুষ জন্মগ্রহণ করেন যিনি লোকোত্তর সাহিত্যিকও বটেন। তাঁর মধ্যে সমগ্র দেশ ও জাতি নিজের ভাষা খুঁজে পায়। রবীন্দ্রনাথ এইরকম একজন ব্যক্তি, যিনি নিজের কালকে, দেশকে ও জাতিকে ভাষা দান করেছেন। সেদিক থেকে বিচার করলে বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করা সত্ত্বেও, বাংলাভাষায় লেখা সত্ত্বেও তিনি সমগ্র ভারতের কবি, যেমন বাংলাদেশের তেমনি কেরলের।

যে সময়ে রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেছিলেন তা এই ভাবের অনুকূল ছিল। তখন দেশের মধ্যে একটা ভাবের হাওয়া বইতে শুরু করেছিল যা ভারতব্যাপী ও ভারতমুখী। এ বিষয়ে বাংলাদেশের হয়ে কোন বিশেষ গৌরবের দাবী আমি করছি না, তবে যেহেতু বাংলাদেশের ইতিহাসটা আমার কাছে অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট সেইজন্য বাংলাদেশের সামাজিক ইতিহাসকে সম্মুখে রেখে বিষয়টা বোঝাবার চেষ্টা করবো। মনে রাখা আবশ্যক যে বাংলাদেশে ইংরাজি শিক্ষার প্রচলন দেশের অন্যান্য অংশের আগে হয়েছিল, তার সুফল ও কুফল অদ্যাপি বাংলাদেশ ভোগ করছে। সুফলের মধ্যে প্রধান—সমস্ত দেশকে একটি অখণ্ড দৃষ্টিতে দেখবার এবং একটি অখণ্ড ভাবের মধ্যে অনুভব করবার ক্ষমতা লাভ করেছিল বাঙালী মনীষীগণ। এই দৃষ্টি ও ভাবকে বলা যেতে পারে ভারতোপলব্ধি (Realisation of India) অন্যান্য অনেক বিষয়ের মতো এ বিষয়েও রাজা রামমোহন রায় পুরোধা।

ইংরেজি শিক্ষায় যখন আমাদের মনের মধ্যে নূতন দিগন্ত প্রসারিত হচ্ছিল, দেশাত্মবোধকে যখন ধীরে ধীরে নূতন একটি জীবনবোধ বলে আ॰॰॰ বুঝতে পারছিলাম সেই সময়ে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসন সমগ্র দেশকে একটি প্রশাসনিক বন্ধনের মধ্যে টেনে আনছিল। একদি॰ক ইংরাজি ভাষার প্রসার, অন্যদিকে ডকের ব্যবস্থা, দেশব্যাপী পথঘাট তৈরি, টেলিগ্রাফ ও রেল লাইন দেশের ঐক্যকে একটি বাস্তব ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত করছিল। এই দুটি বিষয়, ইংরেজি ভাষার প্রসার এবং সার্বভৌম শাসনব্যবস্থা ভারতীয় মনীষীগণের মনে ভ॰রতবোধ জাগ্রত করছিল। এক ভাষা ও এক শাসনব্যবস্থার সমান্তরালে জাগছিল একটি ঐক্যের অনুভূতি। একটি আর একটির বিকাশে সাহায্য করছিল, যদিচ একটি নিতান্ত আধিভৌতিক (Material) এবং অন্যটি আধ্যাত্মিক (Spiritual)। এইভাবে সত্য হয়ে উঠতে লাগল যাকে আমরা ভারতবোধ বলতে পারি। তখন মনীষী ও কবিগণ ভারতকে এক অখণ্ড সত্তারূপে

অনুভব করতে শুরু করেছেন। ইণ্ডিয়া ন্যাশনাল কংগ্রেস্ স্থাপিত হওয়ার আগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন, তারও আগে প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছিল জাতীয় মেলা, যার মূলে নব জাগ্রত ভারত-বোধের অনুভূতি। প্রদেশবোধ তখন ছিল না। প্রদেশবোধকে জোড়া দিয়ে আমরা ভারতবোধে পৌঁছাই নি। ভারতবোধকে ভেঙেই আমরা প্রদেশবোধের সৃষ্টি করেছি। এই সময়ে বাঙালী কবিগণ ভারতকে সম্বোধন ক'রেই কবিতা ও গান রচনা করেছেন, মা বলতে তাঁরা ভারতকে বুঝেছেন, ভারত বলতে বুঝেছেন মা-কে। রবীন্দ্রনাথ তখন বালক। সেই বয়সে কল্কাতায় জাতীয় মেলার একাধিক অধিবেশনে যে-সব কবিতা পাঠ করেছেন, তা এখনো দেখতে পাওয়া যাবে তাঁর রচনাবলীর মধ্যে, সমস্তই ভারতকে সম্বোধন ক'রে। এই সময়ে, ১৮৮২ সালে রচিত হয়েছিল বঙ্কিমচন্দ্রের বিখ্যাত উপন্যাস আনন্দমঠ ও বন্দেমাতরম সঙ্গীত। এই মহাগ্রন্থ ও সঙ্গীত একাধারে যুগস্রষ্টা ও যুগপ্রেরণা জাত। বাংলাদেশে আমাদের ধারণা, খুব সম্ভব বাংলাদেশের বাইরেও এ ধারণা প্রচলিত আছে যে আনন্দমঠ ও বন্দেমাতরম সঙ্গীত বাংলাদেশের ব্যাপার, মাতরম্ বলতে এখানে বাংলাদেশকেই বুঝিয়েছে। কিন্তু ঐ গ্রন্থে বা সঙ্গীতে এমন একটি অক্ষরও নেই যা এই ধারণার সমর্থক। লেখক বাঙালী ছিলেন তাই ভারতই ঘটনা সংস্থান ও অধিকাংশ পাত্র-পাত্রী বাঙালী। লেখক যদি কেরলের অধিবাসী হতেন বা গুজরাটের অধিবাসী হতেন তবে ঘটনা সংস্থান নিশ্চয় কেরল বা গুজরাট হতো, পাত্রপাত্রীর অধিকাংশও কেরলের বা গুজরাটের হতো কিন্তু তাতেই কি প্রমাণ হতো যে গ্রন্থোক্ত ব্যাপার প্রাদেশিক। আনন্দমঠের যিনি পরিচালক তিনি বাঙালী নন, হিমালয়বাসী কোন মহাপুরুষ। হিমালয় সর্ব-ভারতীয়, কোন প্রদেশ বিশেষের নয়। আনন্দমঠ ভারতব্যাপী মহাজাগরণের প্রভাতিক কাব্য, বন্দেমাতরম্ সেই আনন্দময় প্রভাতের, কাকলিধ্বনি যখন "to be young was very haven"।

আনন্দমঠ প্রকাশের আটাশ বছর পরে প্রকাশিত হ'ল রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত উপন্যাস গোরা। এই উপন্যাসের নায়ক গৌরমোহন বা গোরা জন্মসূত্রে ভারতীয় নয়, মিউটিনি আমলের পরিত্যক্ত আইরিশম্যানের সন্তান, পালিত হয়েছিল ব্রাহ্মণ পরিবারে, স্বভাবতই তার ধারণা হয়েছিল সে ব্রাহ্মণ। ঘটনাচক্রে শেষ মুহূর্তে জানতে পারলো যে সে ব্রাহ্মণ দূরে থাকুক আদৌ ভারতবর্ষীয় নয়।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর নায়ককে পরিকল্পনা করেছেন প্রাদেশিকতার বাইরে, রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পনা আর' একধাপ অগ্রসর হয়ে গিয়েছে, তাঁর নায়ক অভারতীয়। বঙ্কিমচন্দ্র বলতে চেয়েছেন যে প্রাদেশিকতা থেকে মুক্তি না পেলে ভারতোপলব্ধি সম্ভব নয়, রবীন্দ্রনাথ বলতে চেয়েছেন ভারতোপলব্ধির জন্য ভারতবর্ষীয় রক্তের সব সময় প্রয়োজন হয় না। খুব সম্ভব ভগিনী নিবেদিতা, যিনি গোরার মতোই আইরিশ সন্তান ছিলেন, আর ভারতীয় না হওয়া সত্ত্বেও আমাদের অনেকের চেয়ে বেশি ভারতীয় ছিলেন, খুব সম্ভব নিবেদিতার জীবনের দৃষ্টান্ত প্রেরণা যুগিয়েছে গোরা চরিত্র পরিকল্পনায়।

গোরা নিজের জন্ম পরিচয় জানবার পরে প্রকাণ্ড একটা মুক্তির স্বাদ লাভ ক'রে বলে উঠেছে—"আমি আজ ভারতবর্ষীয়। আমার মধ্যে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান কোন সমাজের কোন বিরোধ নেই। আজ এই ভারতবর্ষের সকলের জাতই আমার জাত, সকলের অন্নই আমার অন্ন।" তারপরে পরেশবাবুকে. (ব্রাহ্ম সমাজভুক্ত একজন সাধু পুরুষ ব্যক্তি) বলেছে—"আপনি আমাকে আজ সেই দেবতারই মন্ত্র দিন, যিনি হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান ব্রাহ্ম সকলেরই, যার মন্দিরের দ্বার কোন জাতির কাছে, কোন ব্যক্তির কাছে, কোন দিন অবরুদ্ধ হয় না, যিনি কেবলই হিন্দুর দেবতা নন, যিনি ভারতবর্ষের দেবতা।" রবীন্দ্রনাথের ভারতবর্ষের পরিকল্পনাকে রাজনৈতিক পরিভাষায় সেকুলার ডেমোক্রেসি বলতে বোধ করি আপত্তি নেই।

ইতিমধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ দেশের চিত্তকে ভারতবোধের দিকে

আহ্বান করেছেন, শুনিয়েছেন—"হে বীর, সাহস অবলম্বন করো, সদর্পে বলো, আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই, বলো, মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী, আমার ভাই, তুমিও কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া, সদর্পে ডাকিয়া বলো, ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্দ্ধক্যের বারাণসী, বলো ভাই, ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ।"—

বলা বাহুল্য ভারতবোধের প্রতি এই আহ্বান তখন আর শুধু বাংলাদেশের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না, দেশের অন্যান্য অঞ্চল থেকেও মনীষীদের কণ্ঠে এই আহ্বান ধ্বনিত হতে শুরু করেছে।

ঊনবিংশ শতকের মনীষী ও মহাপুরুষগণ নূতন ক'রে ভারতোপলব্ধি করলেন, দেশকে সচেতন ক'রে তুললেন ভারতীয় ঐক্যের প্রতি। ইহাই যথার্থ ভারত আবিষ্কার।

প্রাচীনকালে এই বোধ ও ঐক্যের প্রধান সহায় ছিল হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃত ভাষা। তখন দেশের সামাজিক উপাদানে জটিলতা না থাকায় কাজ সহজ ছিল, ভারত বোধ ও ভারতীয় ঐক্য সম্বন্ধে বিতর্ক জাগে নি। দেশের এক প্রান্তের তীর্থ দর্শনের আশায় লোক অন্য প্রান্তে যেত, ভাষার অসুবিধা অনুভব করতো না তারা। রাষ্ট্রবোধ মনে সজাগ থাকলে রাষ্ট্রভাষার অভাব অনুভূত হয় না। আজ খুব সম্ভব এই বোধ আমাদের মনে ক্ষীণ হয়ে আসাতেই তার অভাব পূরণ ক'রে নিতে চেষ্টা করছি রাষ্ট্রভাষা দিয়ে। তারপরে ভারতীয় সমাজে নূতন নূতন উপাদান এসে পড়েছে, এসেছে ইসলাম, এসেছে খ্রীষ্টান, তাই এই বোধ ও ঐক্যকে প্রশস্ততর ও দৃঢ়তর ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত করবার প্রয়োজন হয়েছে, কাজ আর আগেকার মতো সহজসাধ্য নয়, তবু এই আদর্শ ছাড়া অন্য আদর্শের মধ্যে আমাদের চরিতার্থতার পথ নেই। এই ভারতবোধ ও ভারতীয়

ঐক্য বলতে কি বোঝায় রবীন্দ্রনাথ তা অমর ভাষায় প্রকাশ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের মতে পরকে আপন্ করবার প্রতিভা ভারতবর্ষের। তার সুদীর্ঘ কালের ইতিহাস স্খলন পতনের মধ্যে দিয়ে এই অভি-প্রায়কে অনুসরণ ক'রে এসেছে। কালে কালে নানা রক্তের ধারা বহন ক'রে নানাজাতি এদেশে এসেছে, কালক্রমে তারা মৌলিক চিহ্ন পরিত্যাগ ক'রে ভারতীয়তার মধ্যে আত্ম নিমজ্জন ক'রে এক হয়ে গিয়েছে। "তপস্যা বলে একের অনলে বহুরে আহুতি দিয়া, বিভেদ ভুলিল জাগায়ে তুলিল একটি বিরাট হিয়া।" ঐতিহাসিক হয়তো বলবেন এ বাস্তব সত্য নয়, কেজো লোকেরা হয়তো বলবেন এ কোন কালে সম্ভব হবে না। কবি বলবেন, বলেছেন, এ হয়তো এখনো সিদ্ধিলাভ করেনি সত্য, তবু ভুল ভ্রান্তি ও পতন অভ্যুদয়ের মধ্যে দিয়ে আপনার অগোচরে এই সত্যের দিকেই অগ্রসর হচ্ছে ভারতের ইতিহাস। রবীন্দ্রনাথ বারংবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে ভারতের তুলনায় পাশ্চাত্যের আদর্শ অনেক সহজসাধ্য, তাদের লক্ষ্য রাজ-নৈতিক ঐক্য, ত'ার ভারতের লক্ষ্য সামাজিক সঙ্গতি সাধন, পাশ্চাত্য যেখানে চায় ঐক্য বা unity, ভারতের সেখানে কাম্য সঙ্গতি বা Harmony। বহু বাদ্যযন্ত্রের সুর সমন্বয়ে একটি মহান সঙ্গীত ধ্বনিত ক'রে তুলতে চেষ্টা করেছে ভারতবর্ষ। "শক হুণ দল পাঠান মোগল একদেহে হল লীন।" না, এই মহৎ সিদ্ধি এখনো করায়ত্ত নয় সত্য। তবে এ-ও সত্য মানুষের ইতিহাসে সিদ্ধিটাই চরম নয়, চরম হচ্ছে গিয়ে সাধনা। রবীন্দ্রনাথের মতে এই সামাজিক সঙ্গতি সাধনের আদর্শই ভারতের আদর্শ, সহজ সিদ্ধির সুলভ সমাধান তার সম্মুখে স্থাপন ক'রে তাকে অবহেলা করেন নি ভারতভাগ্য বিধাতা। রবীন্দ্রনাথের মতে ভারতের সামাজিক পদ্ধতি (Harmony) সাধনের আদর্শ পাশ্চাত্যের সম্মুখে একাধারে একটা আহ্বান (challenge) ও বিকল্প পন্থা। পৃথিবীময় আজ যে জটিল অবস্থা ও জটিলতর

উপাদানের সমাবেশ দেখা দিয়েছে রাজনৈতিক ঐক্য তার সমাধানে অসমর্থ। সামাজিক সঙ্গতি সাধনের চেষ্টার মধ্যেই তার সমাধান ও শান্তি। কবির এই আশা যদি সত্য হয় তবে ভারত পৃথিবীর পথ-প্রদর্শক হয়ে সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন হবে। আমি এ দাবি করছি না যে এই ভারতবোধের দাবি রবীন্দ্রনাথের উদ্ভাবিত। এ কারো উদ্ভাবিত নয়, ভারতের সুদীর্ঘ কালের ইতিহাসের মধ্যে আকাজ্ক্ষা আকারে বীজাকারে এই বোধের ভাবটি নিহিত ছিল। আদি কবি বাল্মীকির সময় থেকে যুগে যুগে মনীষী মহাকবি ও ধর্মগুরুগণ এই বোধকে বাণী দিতে চেষ্টা করেছেন। এ যুগে এই বাণীটি রবীন্দ্রনাথের হাতে অমর ভাষাময়ী মুক্তিলাভ করেছে। কাব্যে সঙ্গীতে উপন্যাসে প্রবন্ধে ভারতোপলব্ধির ভাবটিকে তিনি পূর্ণাঙ্গরূপে প্রকাশ ক'রে একটি যুগের সাধনাকে মূর্তিদান করতে চেষ্টা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে তাঁর ব্যক্তিত্বে ও তাঁর সাহিত্যে একটি যুগ সিদ্ধির মূর্তি দেখতে পেয়েছে, একাধারে তিনি এই যুগের মূর্তি ও মুখপাত্র। কায়েন মনসা বাচা। তিনি এই ভাবটিকে মন দিয়ে উপলব্ধি করেছেন, বাক্যে প্রকাশ করেছেন এবং দেহ দিয়ে একে স্পর্শ করবার চেষ্টা করেছেন। এই শেষের কথাটি একটু বিস্তারিতভাবে বলা আবশ্যক।

আমাদের শাস্ত্রের বিধান এই যে দেবতার পূজা সাঙ্গ ক'রে দেবমন্দিরকে প্রদক্ষিণ করলে তবে পূজার পূর্ণ ফল হয়। ভাব-মন্দিরের অভ্যন্তরে যে ভারত ভাগ্য-বিধাতার আসন তাঁর পূজা হ'ল মন দিয়ে এবং বাক্য দিয়ে। এবার দেহ দিয়ে সেই ভারত-মন্দির প্রদক্ষিণ। এই প্রদক্ষিণের রীতিটি প্রাচীনকাল থেকে এদেশে চলে আসছে। রামায়ণ ও মহাভারতে দেখতে পাই যে রাজারা অশ্বমেধ ও রাজসূয় যজ্ঞ উপলক্ষ্যে ভারত প্রদক্ষিণ করছেন, উত্তর পশ্চিম পূর্ব দক্ষিণ হয়ে দেশকে বেষ্টন ক'রে এলেন তাঁরা। ঐতিহাসিক কালেও এই ধারাটি অক্ষুণ্ণ ছিল। আচার্য শঙ্কর এই ভাবেই উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশের চার প্রান্তে মঠ স্থাপন ক'রে রূপ দিয়েছেন

এই ভাবটিকে। মহাপ্রভু চৈতন্যদেব ধর্মপ্রচার উপলক্ষ্যে ভারত-ভ্রমণ এই ভাবেরই প্রেরণায়। আধুনিককালে স্বামী বিবেকানন্দ ও মহাত্মা গান্ধীর ভারত পর্যটন মন্দির প্রদক্ষিণ ছাড়া আর কিছু নয়। সর্বশেষে রবীন্দ্রনাথের কথা। তিনি কাশ্মীর থেকে কুমারিকা, প্রাগজ্যোতিষ থেকে দ্বারকা সর্বত্র ভ্রমণ করেছেন, ভারতের সমস্ত রাজ্য, সমস্ত প্রধান নগর দর্শন করেছেন, প্রায় সব স্থানে বসে কিছু না কিছু লিখেছেন সে-সব আর কিছুই নয়. ঐ মন্দির প্রদক্ষিণ। ঐ ভারত বোধের ভারতটিকে কায়া দ্বারা স্পর্শ ক'রে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ক'রে তুলবার চেষ্টা। এই কেরল রাজ্যেও তিনি এসেছেন, সে কথায় আপনাদের আগ্রহ হ'তে পারে বলে কিছু বিস্তারিতভাবে বিবৃত করছি। তাঁর জীবনীকার বলছেন যে সিংহল থেকে ফিরবার পথে ১৯২২ সালের ৯ই নভেম্বর তিনি ত্রিবাঙ্কুরে এসে পৌঁছলেন, সেখানে তাকে সংবর্ধিত করা হ'ল। তারপরে কুইলন যাওয়ার পথে বরকানে নামক স্থানে থিয়া জাতির গুরু শ্রীনারায়ণ গুরুর সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎ করেন। এর্ণাকুলাম যাওয়ার সময়ে তিনি আলেপ্পিতে অবস্থান করেন। "কোচিনের নিকটবর্তী হইলে কবি দেখিলেন যে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য কোচিনের কতকগুলি Snaize boat আসিয়াছে তাহার উপর মধুর সঙ্গীত চলিতেছে, তাঁহাদের মোটর বোটের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা এর্ণাকুলাম বন্দরে প্রবেশ করিল (১৭ই নভেম্বর)। এখানে কবি কলেজে বক্তৃতা করেন। সেই দিনই তাঁহারা Alwaye যাত্রা করেন। সেখানে প্রত্যুষে স্বামী নারায়ণ গুরুর অদ্বৈতাশ্রম দেখিতে যান। তৎপরেই তাঁহাকে Union College-এর একটি হস্টেল উন্মোচনের উৎসবের জন্য যাত্রা কবিতে হয়। সেখানকার কর্তব্য সম্পন্ন করিয়া সেইরাত্রেই তাঁহারা Alwaye ত্যাগ করিয়া তাতাপুরম যাত্রা করেন।" এই পরিভ্রমণকে নিছক কৌতূহল বা Tourism বলে মনে করলে ছোট ক'রে দেখা হবে—এ একটি বৃহৎ ভাবের বহিঃপ্রকাশ যা

আন্তরিকতাকে ইন্দ্রিয়গত ক'রে তোলবার আকাঙ্ক্ষা—অর্থাৎ ভারত ভাগ্যবিধাতার মন্দির প্রদক্ষিণ। রবীন্দ্রনাথের কাছে আমাদের অনেক ঋণ, তথাপি এই ঋণটির উপরে জোর দিয়ে দেখাতে চাই, কেননা এর মধ্যে একটি অতি প্রাচীন ভাবের প্রকাশ যার এক প্রান্ত রামায়ণ মহাভারতের পৌরাণিক যুগে ; সেই ভাবের ধারাই কখনো ক্ষীণ কখনো প্রবল হয়ে অদ্যাপি বহমান। বর্তমান কালে তিনি এই প্রাচীন ভাবধারার ধারক বাহক ও দুষ্পাপ্য প্রতিনিধি।

রবীন্দ্রনাথের কাছে আমাদের ঋণের এখানেই শেষ নয়। তিনি পৃথিবীর সাহিত্য ও সংস্কৃতির মানচিত্রে ভারতকে স্থাপিত করেছেন। প্রথম যৌবনে একদিন তিনি লিখেছিলেন, "গান গেয়ে কবি জগতের মাঝে স্থান কিনে দাও তুমি।" তাঁর এই আকাঙ্ক্ষা তাঁর দ্বারাই তাঁরই জীবনকালে সুসম্পন্ন হয়েছে, রবীন্দ্রনাথ নামটি দিয়ে ভারত আজ চিহ্নিত। আর এর ফলে ভারতীয় সাহিত্যিকদের সাহস বেড়ে গিয়ে তারা আত্মসম্মানে উদ্বুদ্ধ হয়েছে। ভারত ও বৃহৎ জগৎকে ভাবগত বন্ধনে তিনি কাছাকাছি টেনে এনেছেন্। বহির্জগতে তিনি ভারতের দোভাষী। তাঁর সুকৃতিতে প্রমাণ হয়েছে যে দীর্ঘকালের পরাধীনতা সত্ত্বেও দেশের অন্তর্লোক চির নবীন আছে।

রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও সঙ্গীত প্রকৃতি ও মানুষকে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত করেছে ; মানুষ যে জড় জগতের অধিবাসী নয় দূরতম নক্ষত্র লোক হ'তে পৃথিবীর ধূলিকণা একটি ভাবরসে তরঙ্গিত এ বোধ তিনি আমাদের মনে সঞ্চারিত করেছেন। প্রকৃতির মাধ্যমে অনন্ত আনন্দ সৌন্দর্য ও তাৎপর্য আছে তা আমাদের কাছে সত্য ক'রে তুলে আমাদের জীবনের সীমানা বাড়িয়ে দিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ ভগবদ্‌সত্তাকে মানুষের নিত্যকর্মের মধ্যে স্থাপিত করেছেন। তাঁর ভগবান দূর লোকবাসী বা মানবনিরপেক্ষ নন। তিনি মানুষের কর্মের, খেলার ও ধ্যানের সঙ্গী। মানুষে ও প্রকৃতিতে স্বপ্রকাশিত হ'য়ে তাঁর ভগবান মানুষকে প্রকৃত পদবী দান করেছেন,

জড় জগতের মানুষ ভাগবত জগতের অধিবাসীতে পরিণত হয়ে মহত্তর সত্তায় দ্বিতীয় জন্মলাভ করেছে।

রবীন্দ্রনাথ দেশাত্মবোধ উদ্বুদ্ধ করতে চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তাঁর দেশ বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, এ দুয়ের মধ্যে বিরোধ নেই তাঁর কাছে ; তাঁর দেশে "বিশ্বময়ীর বিশ্বমায়ের-আঁচল পাতা।" তার দৃষ্টিতে স্বদেশ ও বিশ্ব, জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা পরস্পরের পরিপূরক পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী নয়।

উপরের উল্লিখিত প্রত্যেকটি বিষয় বিস্তারিত আলোচনার যোগ্য। কেবল মাত্র উল্লেখ ক'রে তাদের গুরুত্ব বোঝানো সম্ভব নয়। তাঁর কাছে আমাদের ঋণের ব্যাপকতা বোঝাবার উদ্দেশ্যে কেবল উল্লেখ-মাত্র করলাম। তবে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করতে চেষ্টা করেছি ভারতোপলব্ধি বিষয়টিকে। কেন করেছি সহজেই অনুমেয়।

আমরা সকলেই জানি যে আজ আমাদের দেশ একটা সঙ্কটের মুখে এসে পড়েছে, তুচ্ছ বা কল্পিত কারণে দেশের সংহতি নাশ ক'রে তাকে খণ্ড খণ্ড করবার কথা প্রদেশের মনে দেখা দিচ্ছে। ভাষা, স্বার্থ, ধর্ম প্রভৃতি বিষয় সংহতি নাশের কারণ হয়ে দেখা দিতে আরম্ভ করেছে—এই ভাবে যদি চলতে থাকে তবে অচিরকালের মধ্যে ভারতীয় ঐক্যবোধ নষ্ট হয়ে পুনরায় আমরা অষ্টাদশ শতকীয় অরাজকতার মধ্যে গিয়ে পৌছব আশঙ্কা হচ্ছে। শঙ্কিত রাজনীতিকগণ বারে বারে সংহতি সাধনের (Intergration) উপরে জোর দেওয়ার জন্যে সকলকে অনুরোধ করছেন, যদিচ তাঁদের অনেক নীতি ও কার্য এই সংহতি সাধনের প্রতিকূল। গত দেড়শ বছর ধরে রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি পূর্বাচার্যগণের সাধনা যে সংহতিবোধ আমাদের মনে সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল, তার প্রতি বিশ্বাস আজ শিথিল। ঘড়ির দোলক (pendulum) আজ বিপরীত কোটিতে আঘাত করতে উদ্যত। তাই আজ বিশেষভাবে স্মরণ করবার প্রয়োজন হয়েছে, পূর্বাচার্যগণের উপদেশকে ; সঙ্কল্প গ্রহণ করবার সময় এসেছে তাঁদের

চিহ্নিত পথকে অনুসরণ করবার। ভারতোপলব্ধিবোধ নষ্ট হয়ে আজ যদি ভারতীয় ঐক্য খণ্ডিত হয় তবে আমাদের রাষ্ট্রীয় সত্তা লোপ পেতে বাধ্য। কারণ ভারতীয় ঐক্যের মধ্যেই সমস্ত রূপের চরিতার্থতা, অন্যথায় সকলেরই বিনাশ। "যে এক তরণী লক্ষ লোকের নির্ভর খণ্ড খণ্ড করে তারে তরিবে সাগর।" কিন্তু দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করছি যে অনেকের মাথায় সেই সর্বনাশাবুদ্ধি চেপেছে। ভারতের ইতিহাসের যদি কোন শিক্ষা থাকে তবে তা এই যে ভারতোপলব্ধির মধ্যে দেশের মুক্তি ও সার্থকতা, ভারতোপলব্ধির বিনাশে বা শিথিলতায় তার সর্বনাশ। অন্ন বস্ত্রের অভাবে একটা দেশের রাষ্ট্রীয় সত্তা নষ্ট হয় না, বরঞ্চ দেখা যায় যে নূতন নূতন উদ্যমের স্ফুরণ ঘটে। কিন্তু সত্যকার বিঘ্ন দেখা দেয় তখনি যখন পূর্বাচার্যগণের উপদেশ বিস্মৃত হয় সকলে। আজ সেই রকম একটা সঙ্কট দেখা দেওয়ার উপক্রম হয়েছে বলেই বিশেষভাবে উল্লেখ করলাম রবীন্দ্রনাথের কাছে আমাদের এই ঋণটির। আজিকার এই উৎসব পূর্বাচার্যগণের উপদেশ স্মরণ করবার উপলক্ষ্য হয়ে উঠুক এই কামনা ক'রে আমার ভাষণ সমাপ্ত করলাম।

আপনাদের অনেক সময় নিয়েছি, আশঙ্কা করছি আপনাদের সহিষ্ণুতার উপরে পীড়ন করেছি, সে জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আপনাদের এই মনোরম রাজ্য দেখবার ও আপনাদের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার যে সুযোগ দিয়েছেন তার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন করছি।

বন্দেমাতরম্।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কিছুক্ষণ

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার পরিচয় সম্বন্ধে কিছু লিখতে সঙ্কোচ বোধ করি কিন্তু সেই রকম অনুরোধ এসেছে কথাসাহিত্য পত্রিকা থেকে। সঙ্কোচের অনেক কারণ। রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনে বিশেষ করে তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর সম্বন্ধে অনেক আজে-বাজে কথা লিখিত হয়েছে এবং সেগুলো প্রায় স্থায়ী নথিভুক্ত হয়েছে লেখকদের ব্যক্তিগত পরিচয়ের দাবিতে। কোন একটি গ্রন্থে দেখলাম রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী ও এণ্ডুজকে নিয়ে এমন সব মন্তব্য করা হয়েছে যা কারও গৌরববৃদ্ধিকর হয় নি। ওই কথা যখন লিখিত হয়েছে তার অনেক আগেই গতায়ু। কেন এ হেন মন্তব্য করা হলো, এক ঢিলে তিনটি পাখী মারবার আশায় কিনা জানি না, তবে ঢিল যখন যথাস্থানে গিয়ে পড়েছে তার অনেক আগেই পাখী তিনটি উড়ে চলে গিয়েছে। আবার এক শ্রেণীর লেখক আছেন যাঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য মনে হয় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা প্রচার করে বাজারের দরবৃদ্ধি। বিশ্রম্ভালাপের সময়ে রবীন্দ্রনাথ যে স্বরগ্রামে প্রশংসা বা নিন্দা করতেন সে সব নিতান্তই বিশ্রম্ভালাপ। ওসব কথা ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হবে সন্দেহ করলে (অবশ্যই সন্দেহ করা উচিত ছিল, এ দেশ কোন সুযোগ ছাড়বার পাত্র নয়) কখনও সেভাবে সে কথা তিনি বলতেন না। আবার অনেকে অধিকতর ঘনিষ্ঠতা প্রচারের আশায় কবি আমাকে হেন দিয়েছেন, তেন দিয়েছেন বলে বাজারে ঢাক পিটিয়ে থাকেন। রবীন্দ্রনাথকে যাঁরা ভাল করে জানেন তাঁদের সন্দেহ কিছুতেই যেতে চায় না দিয়েছেন না নিয়েছেন এ দুই কিনা। রবীন্দ্রনাথের টেবিলের উপর অনেকগুলি ফাউন্টেন পেনের মধ্যে একজন একটি ফাউন্টেন পেন তুলে নিলেন। রবীন্দ্রনাথ দেখলেন, বাধা দিতে পারলেন না, অজুহাত হিসেবে পরে বললেন, ভদ্রলোকের ছেলে নিল কি করে

নিষেধ করি। চক্ষুলজ্জা যেখানে চুরিতে বাধা দিতে অসমর্থ, আপনার *অমুক জিনিসটা নিলাম শুনলে তো মনে করবেন লোকটি মহাশয়।* রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনে নিন্দুকের সংখ্যা অল্প ছিল না, শেষ জীবনে জুটেছিল স্তাবকের দল। এই শেষোক্তদের মধ্যে অনেকে কাণ্ডজ্ঞানহীন মূর্খ, অনেকে ঘোরতর মতলববাজ। এদের অত্যুক্তির ফলে রবীন্দ্রনাথের Image কখনো কখনো ম্লান হয়ে এসেছে। আর একথা অবশ্যই সত্য যে নিন্দার চেয়ে স্তবে ক্ষতি হয়েছে বেশী। এখন রবীন্দ্র-আলোচনার কয়েকটি প্রচলিত ধারা উল্লেখ করলাম এই জন্যে যে আজ যা লিখতে যাচ্ছি এই সব ভুল-ভ্রান্তিকে এড়িয়ে যাবার আশায়। তবে সে যে একেবারে সম্ভব নয় হাতে হাতেই প্রমাণ পাওয়া যাবে।

গোড়াতেই বলে রাখি রবীন্দ্রনাথের বিশেষ স্নেহের দাবি আমি করি না। সেকালের শান্তিনিকেতন-এ অর্থাৎ ১৯০১ সাল থেকে ১৯২২-২৪ পর্যন্ত সময়ের সমস্ত ছাত্র সাধারণভাবে যে স্নেহ তাঁর কাছ থেকে পেয়েছে আমি ততটুকুই পেয়েছি বললে বোধ করি অহমিকা প্রকাশ হয় না। তবে ব্যাপার এই যে কোন একজন ছাত্র একাদিক্রমে সুদীর্ঘকাল সেখানে বাস করলে কবির কাছে তার আনাগোনা কিছু অধিক হবেই। বছরে বছরে নূতন ছাত্র আসছে, অল্পবিস্তর কয়েক বছর পরে তারা পাঠ শেষ করে চলে যাচ্ছে, তার মধ্যে যদি একজন স্থায়ী চিহ্নের মতো ঠেকে যায় সকলেরই চোখ তার উপরে পড়বে স্বাভাবিক। সেই স্বভাবের নিয়মে হয়তো রবীন্দ্রনাথের চোখ আমার মত স্থায়ীদের উপর পড়েছিল। তার উপরে আবার যখন ওখান থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাস করে কলেজে পড়তে না গিয়ে থেকে গেলাম তখন তাঁর দায়িত্ববোধ কিছু বাড়লো। সেই দায়িত্ববোধের প্রেরণাতেই আমাকে ও আমার মত আর একটি ছাত্রকে নানা বিষয়ে পারদর্শী করে তুলবার আশায় সদলবলে প্রবৃত্ত হলেন। জীবনস্মৃতি গ্রন্থে পাঠকগণ নানা বিদ্যার চর্চার যে বিবরণ পড়েছেন এ প্রচেষ্টা তা

থেকে বিশেষ ভিন্ন নয়। সেই ইংরাজী, বাংলা, সংস্কৃত বিভিন্ন শাখার বিজ্ঞান সমস্তই ছিল অতিরিক্তের মধ্যে এক্ষেত্রে পালী, প্রাকৃত অমরকোষ ও লঘুসিদ্ধান্তকৌমুদী। বিদেশী ভাষারও অভাব ছিল না। ফরাসী ও ইটালীয়ান ভাষা সঙ্গে এসে প্রমাণ করল যে সেক্সপীয়ারের বহুদর্শিকা মিথ্যা নয়, **misfortune never comes alone.** কিন্তু হায় জীবনস্মৃতির বিদ্যাচর্চার ফলে একজন হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আর একজন হলো প্রথমনাথ বিশী। এখানেও বহুদর্শিকার যুক্তি অকাট্য। এক নিয়ম সর্বত্র সমান ফল প্রসব করে না।

॥ ২ ॥

আমার উপরে ফরমাশ হয়েছে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কিছুক্ষণ নামে একটি নিবন্ধ লিখতে হবে। যে ব্যক্তি একটানা তাঁর কাছে ১৬।১৭ বছর ছিল, তার পরেও যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ রেখেছিল তার পক্ষে "কিছুক্ষণ" লেখা সহজ নয়। যত সতর্ক ভাবেই কলম সে চালাক না কেন সে "কিছুক্ষণ" বহুক্ষণের নির্যাস হতে বাধ্য। যাই হোক এমনি একটি কিছুক্ষণের বিবরণ দি্তে চেষ্টা করবো তবে তার মধ্যে যদি বহুক্ষণের নির্যাস থেকে যায় সে দোষ বস্তুর প্রকৃতিগত। মহৎ ব্যক্তিদের ব্যক্তিত্বের প্রকৃষ্টতম প্রকাশ বোধ করি তাঁদের চোখের দৃষ্টিতে। চোখের দৃষ্টি সব সময় যে এক রকম থাকে না তবু তার একটি নিজস্ব প্রকৃতি আছে যাকে স্থায়ী বলে ধরা উচিত। শারদ রাতে চন্দ্রালোক যেমন দেহমনকে স্নিগ্ধ ক'রে তোলে সেইরকম স্নিগ্ধতার প্রকাশ ছিল রবীন্দ্রনাথের চোখের দৃষ্টিতে। কাছে গিয়ে বসলে কিছুক্ষণের মধ্যেই মনটি শান্ত, সংহত ও সুস্নিগ্ধ হয়ে উঠতো। বোধ করি তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি যে কাব্য ও গান তাদেরও ঐ লক্ষণ। শরৎকালের চন্দ্রালোক বলবার বিশেষ তাৎপর্য আছে মনে করি। বসন্তের চাঁদের আলো উন্মাদনাকর, গ্রীষ্ম ও বর্ষার চন্দ্রালোক অনাবিল নয়। এদের তুলনায় আশ্বিনের নির্মল আকাশে চাঁদের আলো বিশুদ্ধতম

প্রকাশ। রবীন্দ্রনাথের চোখের দৃষ্টিতেও ব্যক্তিত্ব সেইভাবেই প্রকাশিত হয়েছে।

ব্যক্তিত্বের প্রকাশে চোখের দৃষ্টির পরেই বোধ করি কণ্ঠস্বরের স্থান। তিনি সুগায়ক ছিলেন সে গীতিস্বরের কথা এখানে বলছি না, তাঁর কাব্য আবৃত্তিতে মাধুর্য ছিল সে কবিকণ্ঠের কথাও নয়। নিত্যনিয়ত ব্যবহৃত স্বাভাবিক কণ্ঠস্বরের কথা বলছি। গ্রামোফোনের রেকর্ডে কিংবা বেতারের ফিতাতে তাঁর যে কণ্ঠস্বর ধরে রাখা হয়েছে তা থেকে মূলের প্রকৃতি বুঝতে পারা সম্ভব নয়। অথচ কি ক'রে যে বোঝাব তারও কোন উপায় দেখি না। ইংরেজীতে কণ্ঠস্বরের মাধুর্য বর্ণনা করতে গিয়ে অনেক সময় Silver বা Silvery শব্দ ব্যবহৃত হয়, সেটা ঠিক কিরকম জানা নেই। তবে যদি রুপোর তারে আঘাত লাগলে যে শব্দ ওঠে তাই মনে করা হয়ে থাকে তবে বলবো ঠিক নয়। রুপোর তারের ঝঙ্কার যতই মধুর হয় তার মূল ধাতব প্রকৃতি একেবারে লোপ পায় না। বরঞ্চ অনেকক্ষণ বৃষ্টি হয়ে থেমে গেলে গাছের পল্লবে সঞ্চিত জল যখন নিচের পাতাগুলির উপরে ঝরে পড়তে থাকে তখন যে একটি কোমল, তরল মসৃণ শব্দ উত্থিত হয় অনেকটা যেন তারই সঙ্গে তুলনা চলে রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বরের। এ-ও ঠিক হলো না জানি কারণ রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বর যতই মৃদু হোক তাতে ভাবের উত্থান-পতন থাকতো। কাজেই বলা উচিত সেই পল্লবসমূহ বায়ুবেগে সঞ্চালিত হলে পতনোন্মুখ বারিবিন্দুতে যে বিচিত্র ছন্দের সৃষ্টি করে তাকেও এই সঙ্গে ধরতে হবে। তাঁর চোখের দৃষ্টিতে শরৎ কণ্ঠস্বরের বর্ষণ।

॥ ৩ ॥

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শেষবার সাক্ষাৎ করতে যাই যখন তিনি বরাহনগরে থাকতেন। অবশ্য তখন জানতাম না যে সেই সাক্ষাৎ শেষ সাক্ষাৎ হবে। বিকেলের দিকে দোতলায় উঠে দেখি দক্ষিণ-পূর্ব কোণার

একটি ঘরে বসে তিনি লিখছেন। দোতলায় আর কাউকে দেখেছিলেম বলে মনে পড়ছে না। আমি ঘরে ঢুকে প্রণাম করলাম, তিনি অভ্যাসবশে বললেন, বোস্, বলে একটা মোড়া দেখিয়ে দিলেন। এই অভ্যাসের কখনো ব্যতিক্রম দেখি নি। এ অভ্যাস তাঁর অগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথেরও ছিল, এমন ভোলা মানুষ অথচ এ বিষয়ে কখনও ভুল হতো না। প্রকৃত আভিজাত্য মজ্জাগত। আমাকে বসতে বলে আবার কিছুক্ষণ লিখলেন। তারপরে মাথা তুলে আমার দিকে মনোযোগ দিয়ে শুধোলেন, "বিশেষ কোন কথা আছে?"

আমি বললাম, না।

তার মানে নির্বিশেষ। অতএব কিছুক্ষণ চুপ ক'রে বসে থাক্ লেখাটা সেরে নিই।

এই বলে তিনি আবার ঘাড় নীচু ক'রে লিখতে শুরু করলেন। আমি ঘরের জানলা দিয়ে বাইরের যে দৃশ্য দেখা যাচ্ছিল, দেখছিলাম। একটা দীঘি তার চারপাশে কিছু গাছপালা। বোধ করি এই দীঘিটার একটা বর্ণনা তাঁর কোন গদ্য-কাব্যে রয়ে গিয়েছে। শান্তিনিকেতনে এমন অনেক দিন হয়েছে যে দুপুরবেলা স্নান ও আহারান্তে যখন তিনি লিখছেন 'বোস্' শব্দে আপ্যায়িত হয়ে নীরবে তাঁর ঘরে বসে থেকেছি। আগেই বলেছি শান্তিনিকেতনের ছাত্রদের কাছে তাঁর দ্বার অবারিত ছিল, আবার ছাত্রদের দ্বারও তাঁর কাছে অবারিত ছিল। অশক্ত হয়ে পড়বার আগে পর্যন্ত যখন তখন তিনি ছাত্রদের ঘরে এসে দেখা দিতেন, বসে গল্পগুজব করতেন। শক্তি যখন তাঁর আরও বেশি ছিল শান্তিনিকেতনের সেই প্রথম আমলে অনেক সময় তিনি ছাত্রদের ঘরে বসে লেখাপড়া করতেন। আমার নিজের চোখে দেখা এমন একটি বিবরণ বলতে পারি। স্কুলে বেশি বয়সের ছেলেরা থাকত বীথিকা নামে একটি ঘরে। সেই ঘরের একটা অংশ কেরোসিন কাঠের ফ্রেমে চটের পর্দা খাটিয়ে কিছুদিন সেখানে লিখবার নীড় সৃষ্টি ক'রে নিয়েছিলেন। ঘরের কোণে

একজন নীরব হয়ে বসে থাকলে তাঁর রচনার তন্ময়তা নষ্ট হতো বলে মনে হতো না। যখনই এভাবে তাঁর কাছে একাকী 'নীরবে বসে থেকেছি কখন নিজের অগোচরে ধীরে ধীরে মনের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম সুকুমার প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। অনেক দূরের বাগান থেকে ফুলের গন্ধ যেমন তরল ও হাল্‌কা হয়ে ভেসে এসে বাতাসে একটি মোহমণ্ডল তৈরী ক'রে তোলে, এও অনেকটা সেই রকম। অন্য কোন পরিচয়ের বদলে বলা যেতে পারে ব্যক্তিত্বের নীরব জাদু। বরাহনগরের সেই ঘরে দুটি লোক নীরব, যা কিছু মুখরতা দেওয়ালের ঘড়িটাতে। এমন কতক্ষণ কেটেছিল মনে নেই, শেষে যখন তিনি লেখা সাঙ্গ ক'রে ঘুরে বসলেন ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে বললেন, চল্‌ চায়ের টেবিলে।

সেখানে গিয়ে দেখি তাঁর জন্যে অদ্ভুত এক খাদ্য প্রস্তুত হয়েছে, একটা কাঁচের গ্লাসে টমেটোর রস, পাশে খানকতক কড়া টোস্ট পাঁউরুটি। সেই টোস্টগুলো টুকরো টুকরো ক'রে ভেঙে টমেটোর রসের মধ্যে দিয়ে চামচ দিয়ে তুলে পরমানন্দে তিনি খেতে লাগলেন। অতিথির জন্য অবশ্য অন্য ব্যবস্থা ছিল, বিশেষ ক'রে যখন জানতেন সে অতিথি ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ ভোজন যে গৃহীর অবশ্য কর্তব্য কে না জানে। তারপরে চা পান করলেন। কিছুকাল আগে কাগজে একটা আলোচনা দেখেছিলাম যে রবীন্দ্রনাথ চা পান করেন না। এ কথা নাকি তিনি নিজে প্রকাশ করেছেন। কথাটা সাময়িকভাবে সত্য বলে ধরে নিতে হবে। মাঝে মাঝে কখনো চা পান বন্ধ করতেন, যেমন বন্ধ করতেন আমিষ আহার। সাময়িক সত্যকে নিত্য সত্য বলে প্রচার করে সংবাদদাতা ভ্রান্তির সৃষ্টি করেছেন বলে মনে হয়। চায়ের টেবিল থেকে উঠে তিনি পূব দিকের গাড়িবারান্দায় গিয়ে বসলেন। তখন শরৎকালের অপরাহ্ণ গড়িয়ে সন্ধ্যার সীমার মধ্যে এসে গড়িয়ে পড়েছে, আকাশে যেমন একটি দুটি ক'রে তারা দেখা দিতে লাগল তেমনি একটি দুটি ক'রে অভ্যাগত এসে চেয়ারগুলি ভরে তুলতে

লাগলেন। সকল অভ্যাগতের নাম মনে সেই। তবে তাঁদের মধ্যে বিধুশেখর শাস্ত্রী ছিলেন বেশ মনে পড়ছে। এবারে অভ্যাগতদের সঙ্গে তিনি নানা বিষয়ে আলাপ করতে শুরু করলেন। তার মধ্যে ঘরের কথা, দেশের কথা, পৃথিবীর কথা সমস্ত রকম প্রসঙ্গ ছিল। রাত্রি যখন প্রথম প্রথম অতীত প্রায়, তখন আর সকলের সঙ্গে তাঁকে প্রণাম ক'রে আমিও উঠে পড়লাম। শারদ রাত্রি নির্মল আকাশ তারায় তারায় আচ্ছন্ন, মনে হয় আর একটি অতিরিক্ত তারার স্থানও নেই, সমস্ত আকাশখানি যেন ফলের ভারে পূর্ণ দ্রাক্ষাবিতানের মত যেন নত হয়ে পড়ছে। সিঁড়ির কাছে এসে একবার চকিতে তাকিয়ে দেখলাম আকাশে অসংখ্য তারা আর ছাদের উপরে একজন মহাকবি। এ দৃশ্যের যথাযথ বর্ণনা করতে গেলে যে কলমের দরকার হয় বর্তমান লেখকের তা অনায়ত্ত। কাজেই সেই চকিত দৃষ্টিতে শেষ দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে বিদায় নিয়ে এলাম। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এই আমার শেষ "কিছুক্ষণ।" তারপরে তাঁকে আর মর্ত্যকায়ায় দেখবার সৌভাগ্য আমার ঘটে নি।

রবীন্দ্র সদুক্তি কর্ণামৃত

এখানে প্রাসঙ্গিক না হলেও কতকগুলি রবীন্দ্র সদুক্তি বা সুভাষিত উদ্ধার ক'রে দেবার লোভ সংবরণ করতে পারছি না। সকলেই অবগত আছেন যে কেবল রচনায় নয় বাচনেও অর্থঘন সরস উক্তি ছড়িয়ে দেওয়া তাঁর পক্ষে অত্যন্ত সহজ ছিল, এমন যে কত সদুক্তি শ্রোতাদের কানের ভিতর দিয়ে চিরবিস্মৃতিতে তলিয়ে গিয়েছে তার সীমাসংখ্যা নেই। আমিও অনেক শুনেছি, এখন দুঃখ হচ্ছে যে সব সংগ্রহ ক'রে রাখি নি। এখানে কয়েকটি সদুক্তি এখন মনে পড়ছে বলে লিপিবদ্ধ করলাম।' যাঁদের এখনও এরকম সদুক্তি মনে আছে তাঁরা সেগুলি যথাযথ প্রকাশ করলে ছোট একটি পুস্তিকা ভরে

উঠবে সন্দেহ নেই। উক্তিগুলির ক্রিয়াপদে সামান্য পরিবর্তন ছাড়া অন্য অংশ প্রায় যথাযথ রক্ষা করতে চেষ্টা করেছি।

(১) পণ্ডিত হবে না, বিদ্বান হবে।

(২) লেখক সম্বন্ধে অপরে কি লিখবে তা দিয়ে তার বিচার হবে না, চূড়ান্ত বিচার হবে সে নিজে কি লিখেছে।

(৩) যথার্থ লেখকের একগুঁয়ে স্বভাব, সকলের পরামর্শ সে শুনবে তবে চলবে নিজের সাহিত্যবুদ্ধির ইঙ্গিতে।

(৪) সাহিত্যিকের মনটা খুঁতখুঁতে হওয়া আবশ্যক। কোন কিছু লিখেই সন্তুষ্ট হবে না, কেবলি অদল বদল করতে চাইবে।

(৫) আর সমস্ত অপবাদের প্রতিবাদ করবে কেবল ধনাপবাদের নয়।

(৬) যার এক পয়সা সঙ্গতি তার দান খুলতে যাওয়া উচিত নয়।

(৭) যে ব্যক্তি কবিতা লিখতে পারে তার পক্ষে গদ্য লেখার চেয়ে পদ্য লেখা অনেক সহজ।

(৮) সাহিত্যের ধ্রুবপদ অংশ (classics) সাহিত্যবিচারের কষ্টিপাথর।

(৯) মানুষ কী চেয়েছিল থেকে বুঝতে পারা যায় সে কী চায়।

(১০) বাংলাদেশ একটি বিরাট চণ্ডীমণ্ডপ, দলাদলিতে সর্বদা মুখর।

(১১) এক পরিবারে একাধিক লেখক থাকলে সব সময়ে সুখের হয় না।

(১২) সাহিত্য বিষয়ে আজকের প্রশংসা আগামী কালের আদালতে উল্টে যাওয়া অসম্ভব নয়।

রবীন্দ্রনাথকে যেমন দেখেছি

রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে কিছু লিখতে সঙ্কোচবোধ করি। তাঁর জীবনকালে দীর্ঘকাল শান্তিনিকেতনে থাকবার সুযোগ হয়েছিল। সে পরিচয়ের সুত্রে কিছু লিখতে গেলে সহজেই নিজের কথা এসে পড়ে। এখানে আশঙ্কা, নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও অহংটা প্রবল হয়ে উঠে এমন অবস্থার সৃষ্টি করতে পারে যাতে মনে হতে পারে নিজের বিজ্ঞাপন হিসাবে রবীন্দ্রনাথকে ব্যবহার করছি। এ আশঙ্কার দৃষ্টান্ত বাংলা সাহিত্যে একেবারে বিরল নয়। কিন্তু এরকম ভয়ের কারণ থাকা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে লেখবার চেষ্টা হওয়া উচিত। কারণ মানুষ রবীন্দ্রনাথকে আমরা কিছুই জানিনে। পঞ্চাশ বছর তাঁর সঙ্গে ছিল এমন লোকের জ্ঞানও পঞ্চাশটি বাক্যের পরিমাণ নয়। কিন্তু এ ক্রটি কেবল জ্ঞাতা ব্যক্তিটির নয় জ্ঞেয় ব্যক্তিটিরও। তিনি বহু লক্ষ শব্দ লিখে গিয়েছেন তবু নিজেকে কখনো পরিপূর্ণভাবে ব্যক্ত করেন নি। করেন নি কি পারেন নি সে বিষয়ে দ্বিমত হতে পারে, কিন্তু ব্যক্ত যে হন নি সে বিষয়ে আমি ক্রমে নিঃসন্দেহ হচ্ছি। বাঙালী শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র ছাড়া এত কম আমরা কাউকে জানিনে। তিনি গানে কবিতায় যা প্রকাশ করেছেন সে-সব তাঁর Poetic personality-র কথা। Poetic personality কবির শ্রেষ্ঠ অংশ হতে পারে, কিন্তু সবটা নয়।

সেই অংশটা আমরা জানতে চাই। রবীন্দ্রনাথ বলবেন প্রয়োজন কি? বলবেন 'কবিরে খুঁজোনা কবির জীবন চরিতে।' তিনি বলবেন লৌকিক জীবনের খোঁজে কি কাজ? ফুলটাই কি যথেষ্ট নয়। আমরা বলবো ফুলটা ভালো লেগেছে বলেই মাটির খবর নিতে চাই। তিনি বলবেন বেশ তো দেশের মাটির খবর নাও। দেশের মাটি তো আছেই, বাগানের মাটির খবর আবশ্যক আমাদের। এ তর্কের শেষ হবে না।

'আমার জীবন' গ্রন্থের বিখ্যাত রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ অংশে নবীন সেনের একটি মন্তব্য বিশেষ তাৎপর্যময়। নবীন সেন বলেছেন যে, রবিবাবু সারাদিন আপনার সঙ্গে ওজন ক'রে কথা বলে বলে হাঁফিয়ে উঠেছি, আপনি একবার আমাদের মতো প্রাণ খুলে হাস্থন। ঠিক এই শব্দ-গুলো তিনি ব্যবহার করেন নি, তবে অর্থ এই বটে। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত একখানি পত্রে ভাষান্তরে এই ত্রুটি স্বীকার করেছেন রবীন্দ্রনাথ। বলেছেন যে তাঁর সৌহার্দ্যের মধ্যে প্রকাশের অভাব আছে। আন্তরিকতা অন্তরে থাকে, মানুষ তার পরিচয় পায় প্রকাশে। যেখানে প্রকাশের অভাব সেখানে আন্তরিকতার অভাব ধরে নিলে স্থূলদৃষ্টি ব্যক্তিকে দোষী করা চলে না। এই প্রকাশের অভাবের ফলেই তাঁর লৌকিক জীবন সম্বন্ধে এত অল্প জানি। লৌকিক জীবনে প্রকাশের অভাবের নানা কারণ থাকতে পারে। একটি প্রধান কারণ রবীন্দ্রনাথের লৌকিক জীবন ও কবি-জীবন এমন ঘন সন্নিবিষ্ট, এমনভাবে একটি আর একটির প্রতীক ও প্রতিনিধি যে কবিজীবনের প্রকাশকেই তিনি যথেষ্ট মনে করেছেন, অপরটিকে প্রকাশের অভাব বা আবশ্যক বোধ করেন নি। জীবনের রস নিঃশেষে শুষে নিয়ে শিল্পবস্তুতে পরিণত করলে জীবনটা শূন্য থাকতে বাধ্য। অগস্ত্য মুনি যখন গণ্ডুষে সমুদ্র পান করেছিল তখন সমুদ্রের খাতটা কি বৃহৎ শূন্যতারূপে দেখা দেয় নি ? তার উপরে আছে আভিজাত্য, নিঃসঙ্গ বাল্যকাল ও মহর্ষি ভবনের Inhivition আরও একটা কারণ থাকা সম্ভব। ঠাকুরবংশ পীরালি, মহর্ষির সন্তানগণ ব্রাহ্ম ; এই দুই কারণে মিলে বৃহৎ হিন্দুসমাজ থেকে তাঁদের একটু আলাদা ক'রে রেখেছিল। আত্মীয়স্বজন ও কুটুম্ব সমস্ত মিলে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জগৎ। কিন্তু ওরই মধ্যে যেখানে একটু স্বাধীনতা বেশি সেখানে লৌকিক জীবনের প্রকাশ স্বচ্ছন্দ। অবনীন্দ্রনাথের (তিনি মহর্ষির সন্তান নন এবং ব্রাহ্ম নন) ঘরোয়া জোড়াসাঁকোর ধারে ও পথে বিপথের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতির

তুলনা করলে প্রভেদটা বুঝতে পারা যাবে। অবশ্য ছেলেবেলার কিছু লৌকিক জীবনের প্রকাশ ঘটেছে। ঐ বইখানায় যখন পড়ি যে রবীন্দ্রনাথ বাল্যকালে একদিন ইস্কুলের পণ্ডিতমশায়ের জন্যে নিজেদের বাড়ি থেকে কেয়া খয়ের "অপহরণ" করেছিলেন আর কখনো কখনো ইস্কুল থেকে ফিরে এসে লঙ্কা দিয়ে মাখা পান্তা ভাত খেতেন, মনটা খুশি হয়ে ওঠে, বলে ওঠে এতক্ষণে আমাদের ঘরের একটি ছেলেকে পাওয়া গেল। এই প্রসঙ্গে একখানা ফটোগ্রাফ ছবির কথা মনে পড়ছে। রবীন্দ্রনাথ এবং আর দুইজন ভদ্রলোক (চিনি না) মাটিতে আসন পেতে বসে ভাত খাচ্ছেন, পাশে বালিকা ইন্দিরা দেবী পাখা হাতে উপবিষ্ট, একদিকে গাড়ুভরা জল। এটা বোধ হয় কোন কারণে একটা command performance, তৎসত্ত্বেও মনটা খুশি হয়। আমাদের ঘরের মতোই বটে। রবীন্দ্রনাথ বাঙালীর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ আত্মীয় এমনটি আর হবে না। কিন্তু বড় ধনী বড় মানী, কাছে যেতে নিজের কাছে নিজের সঙ্কোচের অন্ত থাকে না। কিন্তু পূর্বোক্ত ঘটনায় ও ছবিতে তিনি হঠাৎ "সিংহাসনের আসন থেকে" নেমে কাছে চলে এসেছেন। কিন্তু এ তাঁর স্বভাব নয় Tour-de-force একমাত্র দৌহিত্রের অকালমৃত্যু সংবাদ এসে পৌঁছলে তিনি বর্ষামঙ্গল উৎসব বন্ধ রাখতে চান না, বলেন, শোকটা আমার, উৎসবটা সকলের। এখানেই ভুল। শোকটাও সকলের (শান্তিনিকেতনের)। সকলে তাকে কবির সঙ্গে ভাগ ক'রে নিয়ে আত্মীয়তা অনুভব করতে চায়। কিন্তু না, দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছে, কবির লৌকিক জীবনে প্রবেশের দরজা। না বেরিয়ে আসবেন তিনি না দেবেন কাউকে ঢুকতে, আপন নিঃসঙ্গ মহিমায় একাকী হয়ে বিরাজ করবেন। নিজেকে সরিয়ে নিতে নিতে শেষ কুড়ি বছর বাঙালীর চোখে তিনি একটা Idea of Symbol-এ পরিণত হয়েছিলেন, তিনি আর ব্যক্তি বিশেষ ছিলেন না।

রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠতম বন্ধু কে? লোকেন পালিত, শ্রীশ মজুমদার

জগদীশচন্দ্র বসু, প্রিয়নাথ সেন, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, সি এফ এণ্ড্রুজ প্রভৃতি সকলেই ঘনিষ্ঠ, কিন্তু ঘনিষ্ঠতম কে? এঁদের মধ্যে লোকেন পালিতের সঙ্গে পরিচয় সব আগে, এণ্ড্রুজের সঙ্গে সব পরে, অন্য সকলে প্রথম যৌবনের বন্ধু, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে বোধ করি পরিচয় চল্লিশের কাছে। লোকেন পালিত, শ্রীশ মজুমদার, জগদীশচন্দ্র বসু ও প্রিয়নাথ সেনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা কিছু বেশি হয়েছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে টান ছিল না। এক একজন রবীন্দ্রনাথের জীবনে এসেছেন, কিছুকাল বন্ধুভাবে বিরাজ করেছেন, হয়তো ঘনিষ্ঠ বন্ধুভাবেই বিরাজ করেছেন, তার পরে ধীরে ধীরে মিলিয়ে গিয়েছেন। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, সতীশচন্দ্র রায়, চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, অজিত চক্রবর্তী প্রভৃতির সঙ্গে তাঁর বয়সের এত তফাত যে তাঁদের বন্ধু না বলে ভক্ত বলা উচিত। পঞ্চাশের পরে তাঁর আর বন্ধু জোটে নি জুটেছে ভক্ত গুণগ্রাহী। এণ্ড্রুজের কথা মনে আছে, রবীন্দ্রনাথ বলেছেন এমন বন্ধু তিনি আর পান নি, তবু তাঁকে বন্ধু না বলে ভক্ত বলতে ইচ্ছা করে। বন্ধুত্ব সমানে সমানে, এণ্ড্রুজ কখনো নিজেকে রবীন্দ্রনাথের সমান কল্পনা করেন নি। গান্ধী গুণগ্রাহী, কোন অর্থেই বন্ধু নন। এত কথা বলবার তাৎপর্য এই যে কবির মনের মধ্যে কেউ প্রবেশাধিকার পান নি, কোন কোন সৌভাগ্যবান দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ভিতরে উঁকি মারবার সুযোগ পেয়েছেন, কিন্তু ভিতরে প্রবেশাধিকার? না। পঞ্চাশের পরে ঐ সামান্য অধিকার থেকেও তিনি বন্ধুদের বঞ্চিত করেছেন; লৌকিক জীবনের চারদিকে একটি দুর্ভেদ্য প্রাচীর তুলে সযত্নে আত্মরক্ষা করেছেন। এ বিষয়ে বৃদ্ধ গ্যেটের আচরণের সঙ্গে বৃদ্ধ রবীন্দ্রনাথের তুলনা চলে। রবীন্দ্রনাথের তিনজন সেবককে দেখেছি, প্রথম দিকে উমাচরণ, তারপরে সাধুচরণ, সব শেষে বনমালী। এরা যদি শিক্ষিত ও চক্ষুষ্মান হতো মানুষ রবীন্দ্রনাথের এমন পরিচয় জানাতে পারতো যা আর কারো পক্ষে সম্ভব হ'ত না। ইংরাজিতে বলে No one is a hero to his valet, ওর পরিপূরকভাবে বলা

যেতে পারে যে, Every hero is a human being to his valet, আমাদের জাতি চরিত্রের মস্ত ত্রুটি এই যে মানুষকে আমরা হয় দেবতা বানাই নয় দানব, মানুষকে মানুষরূপে দেখে সন্তোষ হয় না আমাদের। রবীন্দ্রনাথকে মানুষরূপে জানবার চেষ্টা আমরা ক।র নি। এই গেল জাতি চরিত্র। সঙ্গে আছে রবীন্দ্রনাথের চরিত্র। তার উপরে Inhibition আভিজাত্য, বৃহৎ বাঙালী সমাজ থেকে বংশগত দূরত্ব, সবশুদ্ধ মিলে তাঁর সামাজিক আচরণে প্রকাশ কুণ্ঠতা সৃষ্টি করেছে। বাল্যকালের সেই শ্যামের গণ্ডী মোছে নি বরঞ্চ কাল-ক্রমে দুর্লঙ্ঘ্য হয়ে উঠেছে।

অনেকে রবীন্দ্রনাথকে জীবনশিল্পী আখ্যা দিয়েছেন। কথাটা বুঝবার চেষ্টা করা যাক। প্রত্যেক যথার্থ শিল্পীই জীবনশিল্পী কেননা জীবনের উপাদানকে তাঁরা শিল্পে পরিণত করেন। কাজেই বিশেষ-ভাবে কোন শিল্পীকে জীবনশিল্পী বলা নিরর্থক। মনুষ্য জীবন ছাড়া আর কোথায় পাওয়া যাবে শিল্পের উপাদান? ম্যথু আর্নল্ড শেলীর বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছিলেন যে, শিল্পের যথার্থ উপাদান মানবজীবন থেকে সংগ্রহ করতে হয়, শেলী অনেক সময়েহ তা করেন নি বা পারেন নি; তাঁর মতে "Ineffectual angel beating in vain his luminous wings ın the void"! এ অভিযোগ সত্য কি মিথ্যা সে তর্ক এখানে প্রাসঙ্গিক নয়। শিল্পীরা ক্ষমতা অনুসারে জীবন থেকে উপাদান সংগ্রহ করে; কেউ কম কেউ বেশী; কারো সংগৃহীত উপাদান উচ্চ পর্যায়ের শিল্পে পরিণত হয, যেমন মধুসূদনের হাতে মেঘনাদ বধ কাব্যে হয়েছে; কারো হাতে তেমন হয় না যেমন হেমচন্দ্রের বৃত্র সংহারে বা নবীন সেনের কুরুক্ষেত্রাদি কাব্যত্রয়ে; যেমনি হোক এ ছাড়া সংগ্রহ ক্ষেত্র আর নাই। কারো হাতে জীবন অনেক উপাদান জুগিয়ে দেয় কারো হাতে দেয় না, কেউ সেই উপাদানের সম্যক সদ্ব্যবহার করেন, কেউ করতে অক্ষম হন। রবীন্দ্রনাথের হাতে জীবন পর্যাপ্ত উপাদান জুগিয়ে দিয়েছে এ বলা যথেষ্ট

নয়, তিনি তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের সমস্তটাকে শিল্পে পরিণত করতে সমর্থ হয়েছেন, কিছু আর কাঁচা মাল হিসাবে উদ্বৃত্ত থাকে নি। জীবনের এমন সামগ্রিক **Sublimation** সাহিত্যের ইতিহাসে বিরল। তার ফল হয়েছে এই যে, অভিনব বৈচিত্র্যে ও প্রাচুর্যে পূর্ণ রবীন্দ্র-সাহিত্য আমরা পেয়েছি ; তার আর একটি ফল হয়েছে রবীন্দ্রনাথের জীবনটাকে আমরা পাই নি, যাঁর সম্যক জীবন শিল্পে রূপান্তরিত, শিল্পের বাইরে তাঁকে আর কিভাবে পাওয়া সম্ভব ! বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধেও এই একই নীতি প্রযোজ্য। রচনার বাইরে বঙ্কিমচন্দ্র নাই, রচনার বাইরে রবীন্দ্রনাথ নাই। এ বিষয়ে তাঁরা সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন বলেই বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর জীবনী লিখতে নিষেধ করে গিয়েছেন, আর রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে তাঁর জীবনী কখনো লিখিত হবে না। এমন অবস্থায় মানুষ রবীন্দ্রনাথকে কি ক'রে জানা সম্ভব ? এ গেল তাঁর শিল্পীচরিত্রের বিবরণ। এর পরে আছে ব্যক্তি চরিত্র।

রবীন্দ্রনাথের মতো এমন নিঃসঙ্গ, নির্বান্ধব লোক সংসারে বিরল। বাল্যে, যৌবনে, প্রৌঢ় বয়সে কখনো এমন বন্ধু তিনি পান নি, যাঁকে মনের কথা বলতে পারেন। এ তাঁর দুর্ভাগ্য। আমাদের সৌভাগ্য, কেননা অকথিত সব কথা গানে পরিণত হয়ে গিয়েছে।

“আমার একটি কথা বাঁশি জানে,
বাঁশিই জানে
ভ'রে রইলো বুকের তলা
কারো কাছে হয়নি বলা
কেবল বলে গেলেন বাঁশির
কানে কানে॥”

মনের কথা বলবার লোক ছিল না বলেই সমস্ত অনুভূতি, উপলব্ধি গানের ডালিতে সাজিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছেন। মনের কথা বলবার লোক থাকলে রবীন্দ্র-সাহিত্যের পরিমাণ হয়তো কিঞ্চিৎ কম হ'তো, কিন্তু পূর্ণতর, স্বচ্ছন্দতর হ'তো তাঁর ব্যক্তি জীবন। মানুষ কেবল

বাণীতে সন্তুষ্ট নয় স্পর্শেরও আবশ্যক তার। গ্যেটের সঙ্গে তাঁর জীবনের ও কীর্তির নানা দিক দিয়ে মিল, অমিল হচ্ছে, গ্যেটের শিলার ছিল, রবীন্দ্রনাথের তেমন কেউ ছিল না।

রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্রের সংখ্যা অনেক গ্রন্থাকারে প্রকাশিত যা হয়েছে তার বাইরে আরও অনেক আছে। বলাবাহুল্য এসব চিঠি-পত্র বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। কিন্তু এ সমস্তের মধ্যে মানুষটি কতখানি ধরা দিয়েছে? ছিন্নপত্রাবলীর কোন কোন পত্রে সামান্য কিছু পরিচয় আছে তবে সে সব যেন কলমের অনবধানতা বশতঃ। মুহূর্ত মধ্যে সচেতন কলম অভ্যস্ত পথে ফিরে এসেছে। কীটসের চিঠিপত্রের সঙ্গে ছিন্নপত্রাবলীর চিঠিগুলো অন্যান্য বিষয়ে তুলনীয় হ'লেও এখানে তাদের প্রভেদ। কীটসের পত্রে, আমেরিকাপ্রবাসী ভ্রাতাকে বা ভ্রাতৃবধূকে লিখিত পত্রে, কিংবা ভগ্নী Fanny Keatsকে লিখিত পত্রে, লৌকিক জীবনের যে অনায়াস ও অপ্রত্যাশিত প্রকাশ আছে, রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্রে তেমন নাই। প্রথমদিকে কখনো কখনো আছে, শেষের দিকে একেবারেই নাই। শ্যামের গণ্ডী ক্রমেই অধিকতর দুর্লঙ্ঘ্য হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের মনে স্নেহ দয়ামায়া আন্তরিকতার অভাব ছিল না। অভাব ছিল তাদের যথাযথভাবে লৌকিক ক্ষেত্রে প্রকাশের ভাষার ও আচরণের। এ সমস্ত সাহিত্যের প্রসার খাতে নিঃশেষে প্রবাহিত, লৌকিক জীবনের ভাগীরথী খাত শুষ্ক-প্রায়। এ তাঁর জীবনের দুর্বিষহ ট্রাজেডি, আর এর অনুবৃত্তিরূপে তাঁর সম্বন্ধে ভুল বুঝাবুঝির অন্ত নেই। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আলোচনা রবীন্দ্র সাহিত্যের, রবীন্দ্র চিন্তাধারার, রবীন্দ্র ব্যক্তিত্বের আলোচনা হতে বাধ্য। যাঁরা তাঁর লৌকিক জীবন সম্বন্ধে লিখেছেন সকলেই বাইরে বাইরে ঘুরেছেন, কেউ ভিতরে প্রবেশপথ পেয়েছেন মনে হয় না, কারণ সে পথ কতকটা তাঁর স্বভাবের নিয়মে দুর্গম, কতকটা তাঁর বিশেষ অবস্থা গতিকে দুর্গম, তার পরেও যে সঙ্কীর্ণ একটুখানি পথ থাকা স্বয়ং কবি তা দুর্গমতর ক'রে তুলে দরজা বন্ধ ক'রে দিয়েছেন।

রবীন্দ্র রঙ্গমঞ্চের বিবর্তন ও তার প্রভাব

১৮৭২ সালে কলকাতা শহরে প্রথম পেশাদার রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত হল। অবশ্য তার আগেও অনেকদিন থেকে শহরের ধনীদের গৃহে রঙ্গমঞ্চ বেঁধে অভিনয় আরম্ভ হয়েছে। এ সমস্ত রঙ্গমঞ্চ তৎকালীন বিলাতী রঙ্গমঞ্চের ছাঁচে গঠিত। চিত্রিত পর্দার পটপরিবর্তন প্রভৃতি দর্শকের মনোরঞ্জন করতো।

রবীন্দ্রনাথদের গৃহেও এই ছাঁচের রঙ্গমঞ্চে অভিনয় হতো, প্রভেদের মধ্যে এই যে এখানে স্ত্রীভূমিকা গ্রহণ করতো কিশোর বয়সের পুরুষ, পেশাদার রঙ্গমঞ্চে প্রথম নটীদের আবির্ভাব হল।

রবীন্দ্রনাথদের গৃহে যখন বিলাতী ধরনের রঙ্গমঞ্চে অভিনয় হতো তখনো কবির জন্ম হয় নি। কিশোর বয়সেই তিনি ঘরের অভিনয়ে যোগদান করতে শুরু করেছেন। তারপরে বিশ বৎসর বয়সে, বাল্মীকি প্রতিভা নামে গীতি নাট্য রচনা ক'রে অভিনয়ের ব্যবস্থা করলেন। অনেকবার এই নাটকটি অভিনীত হয়েছে তাঁদের বাড়িতে। একবারের আলোক চিত্র পাওয়া যায়। ১ নং এই ছবি থেকে তৎকালীন রঙ্গমঞ্চের ও সাজ পোশাকের কতকটা ধারণা পাওয়া যাবে। রবীন্দ্রনাথ বাল্মীকি, তাঁর পায়ে নাগরা জুতো ও মোজা, কাঁধের উপর থেকে পিছনে ঝুলে পড়েছে খানিকটা কাপড়। এ তৎকালীন পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের প্রভাব। পিছনে ঝোলানো কাপড়ই বোধ করি যাত্রাদলের কৃষ্ণের পোশাকের প্রভাব। এর সঙ্গে তাঁর শেষ বয়সের নৃত্যনাট্যগুলির রঙ্গমঞ্চ ও সাজ পোশাকের তুলনা করলে দেখা যায় যে পঞ্চাশ বছরে দুস্তর পরিবর্তন ঘটেছে রঙ্গমঞ্চের আঙ্গিকে।

ত্রিশ বছর বয়সের কাছাকাছি তিনি পদ্যছন্দে দু'খানি পঞ্চাঙ্ক নাটক রচনা করলেন, রাজা ও রাণী এবং বিসর্জন। এ দুখানিও তৎকালে অভিনীত হয়েছিল তাঁদের বাড়িতে। তার সচিত্র বিবরণ

পাওয়া যায় না, তবে মনে হয় এ সময়েও প্রচলিত রঙ্গমঞ্চের আঙ্গিককে ছাপিয়ে উঠতে পারেন নি, যদিচ ঠাকুর বাড়ির উচ্চতর রুচি ও শালীনতার ছাপ স্পষ্ট।

১৯০১ সালে তিনি শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করলেন। এখানেও প্রথমদিকে পেশাদার রঙ্গমঞ্চের ছাঁচে রঙ্গমঞ্চ বাঁধা হ'তো, বাজারে রাজা মন্ত্রী সেনাপতিদের যে সব পোশাক পাওয়া যায় তাই কিনে এনে ব্যবহৃত হতো। কিন্তু ক্রমে পরিবর্তন দেখা গেল।

রঙ্গমঞ্চের সামনে ছবি আকা একটা পর্দা ছাড়া আর সব পর্দার ব্যবহার বন্ধ হল। মঞ্চের উইংস কাপড়ের বদলে পাতা ও ফুল দিয়ে তৈরি হতো। অবশেষে এক সময়ে সামনের পর্দাটা থাকতো তবে তাতে কোন চিত্র আর থাকতো না। নূতন পরিকল্পনায় তাঁর প্রধান সহায় হলেন বিখ্যাত চিত্রকর নন্দলাল বসু ও সুরেন্দ্রনাথ কর। আরও একটি পরিবর্তন ঘটে যা আরও গুরুতর। শান্তিনিকেতনের ছাত্রদের দিয়ে গানের দল (choir) তৈরি করা সম্ভব হ'লে তাঁর পরবর্তী নাটকগুলো গীতি বহুল হয়ে উঠল। এ বিষয়ে তাঁর প্রধান সহায় রবীন্দ্র সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠ ভাণ্ডারী দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তারপরে ১৯২১ সালে বিশ্বভারতী বা উচ্চতর বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হ'লে ছাত্রীদের সমাগম হল তখন গানের দলে ছাত্রীদেরও পাওয়া গেল। এই তিনটি বিষয়, রঙ্গমঞ্চের নূতন পরিকল্পনা, গীতি বহুল নাটক ও ছাত্র-ছাত্রীদের দ্বারা গঠিত গানের দল, এই তিনে মিলে পরবর্তী আমলের তাঁর শ্রেষ্ঠ নৃত্যনাট্যগুলির রচনা ও অভিনয় সম্ভব হল। এখানে দেখা যাবে চিত্রিত পর্দা অন্তর্হিত, বিচিত্র রঙের আলোক নিক্ষেপে রঙ্গমঞ্চে প্রয়োজনীয় আবহাওয়া সৃষ্টি করা হয়েছে, আর অভিনেতাদের মধ্যে ছাত্র ও ছাত্রী দু-ই আছে, সাজসজ্জা সম্পূর্ণ নূতন ধরনের। রবীন্দ্র সঙ্গীতের মতো এই নৃত্যকলাও বহুধারার মিলনে গঠিত, তার মধ্যে মণিপুরী ও জাভার নৃত্যরীতি প্রবল।

রবীন্দ্রনাথের পরিণত রঙ্গমঞ্চ বাংলাদেশে প্রচলিত যাত্রা গানের

আসরকে অবলম্বন ক'রে পরিকল্পিত মনে হয়। যাত্রা গানের আসরে মাঝখানে চলে অভিনয়, চারিদিকে ঘিরে বসে দর্শক—আর যাত্রা গানের নামেই প্রকাশ এগুলি গীতিবহুল। তার শারদোৎসব, ফাল্গুনী এমনকি মুক্তধারা এইভাবে অভিনীত হলে কম চিত্তাকর্ষক হবে না।

অবশ্য নৃত্য নাট্যগুলির এ ভাবে অভিনয় চলবে না, তার জন্যে একান্ত আবশ্যক আলোক নিক্ষেপের মায়া, কাজেই রাত ছাড়া অভিনয় সম্ভব নয়। আগে যে নাটক তিনখানির নাম করলাম সেগুলো দিনে রাতে যখন যেখানে খুশি আসর সাজিয়ে অভিনয় করা চলে। এবারে প্রশ্ন রবীন্দ্রনাথের অভিনয় বলো ও মঞ্চ বলো দেশের নাট্যমঞ্চ-গুলোকে কতদূর প্রভাবিত করেছে? এর উত্তর এক সঙ্গে 'না' ও 'হাঁ'।

কলকাতার চারটে পেশাদার রঙ্গমঞ্চ আছে। সাধারণ শিক্ষিত বাঙালীর উপর রবীন্দ্রনাথের প্রভাব যতখানি এদের উপর তার চেয়ে বেশী নয়। এসব রঙ্গমঞ্চ এখনো চিত্রপটের আতিশয্য এবং আলোক নিক্ষেপের চটকে পীড়িত। দর্শক যা চায় তাই তারা দিতে বাধ্য। অবশ্য প্রসিদ্ধ নট শিশিরকুমার ভাতুড়ীর আমলে তাঁর রঙ্গমঞ্চ রবীন্দ্রনাথের নাট্যকলার রীতি স্পষ্টভাবে প্রকট হয়েছিল, তবে তা স্থায়ী হয় নি, ভাতুড়ীর সঙ্গেই অন্তর্হিত হয়েছে।

কলকাতায় শৌখীন নাট্যসংস্থা সংখ্যায় হাজারের উপরে। এদের কোন বাঁধা স্টেজ নেই, অভিনেতারা সকলেই অন্যবৃত্তিধারী। এদের উপরে রবীন্দ্রনাট্যকলার প্রভাব আছে, এতদিনে আরও বেশি হতো, যদি না সিনেমার টেকনিকের কাছে এঁরা আত্মসমর্পণ করতেন।

কলকাতায় আর এক শ্রেণীর নাট্য সংস্থা আছে যাদের ধরা চলে আধাশৌখীন। এদের কোন নিজস্ব রঙ্গমঞ্চ নেই, দরকারের সময়ে অন্য রঙ্গমঞ্চ ভাড়া নিয়ে বা রঙ্গমঞ্চ তৈরি ক'রে নিয়ে অভিনয় করেন। এইসব দলে অনেক উচ্চমানের অভিনেতা আছেন, আর তাঁদের অভিনয়ের মানও উচ্চ। এঁদের হাতে রবীন্দ্রনাথের অনেক নাটক নূতন তাৎপর্য নিয়ে দেখা দেয়।

কলকাতায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত শিক্ষার অনেক বিদ্যালয় আছে, কিন্তু সরাসরি নাট্য শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আছে বলে জানি না। রবীন্দ্র সদন একট মনোরম হর্ম্য যার মধ্যে বাঁধা স্টেজ আছে—এই পর্যন্ত। এখানে যে কোন দল এসে অভিনয় করতে পারে, যাত্রাগানের আসরও মাঝে মাঝে বসে থাকে। বিশেষভাবে রবীন্দ্রনাথের নাট্য-কলার সঙ্গে এর কার্যকরণ সম্বন্ধ আছে মনে হয় না।

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় রবীন্দ্র সাহিত্য সঙ্গীতকলা ও নাট্য-রীতি শিক্ষাদানের একটি প্রধান কেন্দ্র, অবশ্য অন্য কৃত্যও তার আছে। সমস্ত ব্যাপারটাই এখনো পরীক্ষাধীন, কি রকম ওৎরাবে এখনই বলতে পারা যায় না।

অদ্যাবধি রবীন্দ্র সঙ্গীত, নাট্যকলা ও নৃত্য শিক্ষাদানের শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র বিশ্বভারতী। কিন্তু আগের জৌলুষ তার আর নাই। রবি অস্ত গেলে আকাশ অন্ধকার হবেই, তবে ভরসার মধ্যে এই যে গোধূলির আলো আঁধারির ভাবটা আকাশে আছে।

মহারাষ্ট্র ও রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথ বরাবর মহারাষ্ট্রের সঙ্গে বিশেষ একটু আত্মীয়তাবোধ পোষণ করেছেন। খুব সম্ভব কৈশোরে বোম্বাই প্রেসিডেন্সি তথা বোম্বাই বাসের স্মৃতিতে এই আত্মীয়তাবোধের উৎস, তারপরে, কালক্রমে অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি ও দৃষ্টি-প্রসার ঘটবার ফলে, এই আত্মীয়তা-বোধ একটি আদর্শের ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠালাভ করেছে। অর্থাৎ গোড়ায় যা ছিল নিতান্তই একটা ব্যক্তিগত অনুভূতি পরবর্তীকালে তা সর্বজনীন অভিজ্ঞতায় পরিণত হয়েছে। আজকের সভায় এই বিষয়টিকেই যথাসাধ্য বুঝিয়ে বলতে চেষ্টা করবো। কিন্তু তার আগে একটা ভূমিকা আবশ্যক। ভূমিকার পটের উপরে মহারাষ্ট্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত সম্বন্ধটি স্থাপন করতে পারলে দেখতে পাওয়া

যাবে বিষয়টি ক্ষুদ্র বা ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়—ওর একটা ভারত-জোড়া সার্থকতা আছে, আর সেই সার্থকতা আছে এই বিশ্বাসেই রবীন্দ্রানুরাগী এই সুধীজনের সভায় তা উত্থাপন করতে সাহসী হয়েছি।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে কবি, মনীষী ও ধর্মগুরুদের একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। এদেশের মহাকবি ও মনীষীরা যেমন সর্বাঙ্গীণভাবে এদেশকে গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন তার অনুরূপ বোধ করি আর কোন দেশে পাওয়া যাবে না। প্রাচীন গ্রীসে হোমার ছিলেন আবার হেরোডোটাস ছিলেন; এদেশে বেদব্যাস একাধারে হোমার ও হেরোডোটাস; মহাভারত একাধারে কাব্য ও ইতিহাস। প্রাচীন-কালে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় ইতিহাস যে লিখিত হয় নি, তার কারণ সে অভাব তেমন করে কেউ বোধ করেন নি। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, কালিদাসের কাব্য ও তুলসীদাসের রামচরিতমানস প্রভৃতি ইতিহাসের অভাব দূর করে এসেছে আর খুব সম্ভব গতানুগতিক ইতিহাসের চেয়ে অধিক পরিতৃপ্তি দান করতে সমর্থ হয়েছে। এই জন্যেই ভারতবর্ষের প্রকৃত ইতিহাস তার বিশ্বাসের ইতিহাস, তার আদর্শের ইতিহাস, তার আইডিয়ার ইতিহাস; সন তারিখ সন্ধি বিগ্রহ শর্ত চুক্তি ও রাজা মন্ত্রীদের নামাবলীর ইতিহাস নয়।

মহাকবি, মনীষী ও ধর্মগুরুগণ রূপান্তরে এদেশের ইতিহাস-স্রষ্টা বলে এদেশ, এই ভারতবর্ষ তাঁদের মনের মধ্যে সর্বদা স্পষ্ট ও সত্যভাবে বিরাজমান ছিল। তাঁদের কাছে এই দেশটি একই সঙ্গে জন্মভূমি কর্মভূমি ও ধর্মভূমি ছিল, সেইজন্য এদেশ সম্বন্ধে একটি বিশেষ মমত্ববোধ, বিশেষ একটি পবিত্রতাবোধ তাঁরা অনুভব করতেন, নিছক জন্মভূমি সম্বন্ধে যা সর্বতোভাবে প্রযোজ্য নয়। তাঁদের কাছে এ যেন একটি দেবমন্দির তুল্য ছিল। এদেশে পূজা সাঙ্গ করবার পরে দেবমন্দির প্রদক্ষিণ বিধেয়। এদেশের ধর্মগুরুগণ বুঝি সেই মনোভাবে অনুপ্রাণিত হয়েই বারংবার এদেশ প্রদক্ষিণ করেছেন। আচার্য শঙ্করের ভারত প্রদক্ষিণ, মহাপ্রভু চৈতন্যের দাক্ষিণাত্য পরিভ্রমণ করে

উত্তরভারতে গমন, এযুগে স্বামী বিবেকানন্দের ভারত পরিব্রাজকতা সমস্তই এই মনোভাব-প্রসূত। গান্ধীজির ভারত-ভ্রমণও মূলতঃ এই পর্যায়ের। আর রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতিতে যে রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞের বিবরণ পাওয়া যায়—তারও মূল কথাটি এই, কোন একটা উপলক্ষে সামাজিকদের কাছে ভারতবর্ষের সামগ্রিক রূপটা তুলে ধরা। কালিদাস লঙ্কা থেকে অযোধ্যা, আর রামগিরি থেকে অলকা অর্থাৎ দক্ষিণ থেকে উত্তর পর্যন্ত ভারতের ছবিটি এঁকে গিয়েছেন। আবার রঘুর দিগ্বিজয়ী সৈন্যবাহিনীকে নিয়ে গিয়েছেন বাংলাদেশ ছাড়িয়ে আসাম পর্যন্ত। এদিকেও আঁকা হল পুবে পশ্চিমে ভারতের ছবি। এ হচ্ছে গিয়ে মহাকবিদের মানসভ্রমণ, ধর্মগুরুদের পায়ে হেঁটে চলার সঙ্গে তাল রক্ষা করে এঁরা কলমে ভর দিয়ে ভারত ভ্রমণ করেছেন।

মধ্যভারতের মহাকবি রবীন্দ্রনাথকেও ভারত ভ্রমণ করতে হয়েছে, শুধু কায়িকভাবে নয়, সে কাজ তো এযুগে সহজ, তাঁকে ভারত প্রদক্ষিণ সমাধা করতে হয়েছে 'কায়েন মনসা বাচা'। বিপুল রবীন্দ্র-সাহিত্যের সঙ্গে যাঁদের মোটামুটি পরিচয় আছে তাঁরা নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন যে বিরাট ভারতে কাশ্মীর থেকে কুমারিকা, বোম্বাই থেকে আসাম—এমন কোন প্রধান রাজ্য নেই, নগর নেই, তীর্থ নেই যেখানে বসে কিছু না কিছু তিনি না লিখেছেন, যার কোন না কোন উল্লেখ তাঁর রচনায় না আছে। মনের মধ্যে যে ভারতবোধ তাঁর সতত জাগ্রত ছিল পূর্বোক্ত উপায়ে তাকেই যেন পঞ্চেন্দ্রিয় দিয়ে স্পর্শ করবার আকাঙ্ক্ষা। আবার ভারতের যাবতীয় অঞ্চলের মধ্যে মহারাষ্ট্রকেই যেন তিনি সবচেয়ে নিবিড়ভাবে স্পর্শ করেছেন। ভারতের যিনি মহাকবি হবেন ভারতের সমস্ত অঙ্গরাজ্য থেকে তাঁকে রস আহরণ করতে হবে, সমস্ত রাজ্য তাঁকে যোগাবে রস, সমগ্র দেশকে তাঁর করতে হবে রস-ভিত্তি। এক্ষেত্রেও দেখতে পাওয়া যায় যে মহারাষ্ট্রের ইতিহাস, ও জীবন থেকেই যেন তিনি সবচেয়ে

বেশী রস আহরণ করেছেন—মহারাষ্ট্রই যেন সবচেয়ে বেশী পুষ্ট ক'রে তুলেছে কবির মানস-প্রকৃতিকে। অবশ্য এই বিচারের প্রত্যেক ক্ষেত্রেই স্বভাবতঃই বাংলাদেশকে বাদ দিয়ে বিচার করতে হবে।

নব্য ভারতের মহাকবি ভারতের বিচিত্র জীবনকে যেন গণ্ডূষে পান করেছেন। এই রস বলাধান করেছে তাঁর মনে, আর বিপুল রবীন্দ্রসাহিত্যকে নব্যভারতের নূতন মহাভারতে পরিণত হতে সাহায্য করেছে। বৈদিক ভারত, পৌরাণিক ভারত, বৌদ্ধ ভারত, গুপ্তসম্রাটগণের ভারত, মধ্যযুগের ও মুঘলযুগের ভারত যুগিয়েছে তাঁকে রস ও কাব্যের উপাদান। রাজস্থানের বীর্য ও ত্যাগ, শিখের শৌর্য, মহারাষ্ট্রের মহত্ত্ব ও আদর্শবাদে তিনি অনুপ্রাণিত হয়েছেন—তাঁর কাব্যে তারা স্থান লাভ করেছে। আজকে বিশেষভাবে মহারাষ্ট্রের সঙ্গে তাঁর সুদীর্ঘ ও বিচিত্র সম্পর্ক বর্ণনাই আমাদের লক্ষ্য।

রবীন্দ্রনাথের মধ্যম অগ্রজ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন প্রথম সিভিলিয়ান। কর্মক্ষেত্ররূপে তিনি নির্বাচন করে নিয়েছিলেন বোম্বাই প্রেসিডেন্সি। তিনি যখন আমেদাবাদে জজ, তখন তিনি কিশোর রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে গেলেন সেখানে। তাঁর ইচ্ছা ছিল এখানে কিছুদিন থেকে ইংরাজিটা ভালো ক'রে শিখে নিলে ভাইকে বিলাতে পাঠিয়ে দেবেন। আমেদাবাদের শাহীবাগ প্রাসাদে বাস করবার কালেই রবীন্দ্রনাথ প্রথম সঙ্গীত রচনা করেন। এর পরেই ঘটনা-চক্রে তাঁর যোগ ঘটলো বোম্বাই তথা মহারাষ্ট্রের সঙ্গে। শেষ বয়সে লিখিত 'ছেলেবেলা' নামে স্মৃতি-কথায় এ বিষয়ে তিনি যা বলেছেন এখানে উদ্ধার ক'রে দিচ্ছি। তিনি লিখেছেন—

"এখানে কিছুদিন থাকার পর মেজদাদা মনে করলেন বিদেশকে যারা দেশের রস দিতে পারে সেই সব মেয়েদের সঙ্গে আমাকে মিলিয়ে দিতে পারলে হয়তো ঘরছাড়া মন আরাম পাবে। ইংরাজী ভাষা শেখবারও সেই হবে সহজ উপায়। তাই কিছুদিনের জন্য বোম্বাই-

এর কোন গৃহস্থঘরে আমি বাসা নিয়েছিলুম। সেই বাড়ির কোন একটি এখনকার কালের পড়াশুনাওয়ালা মেয়ে ঝকঝকে করে মেজে এনেছিলেন তাঁর শিক্ষা বিলেত থেকে। আমার বিদ্যা সামান্যই। আমাকে হেলা করলে দোষ দেওয়া যেতে পারতো না। তা করেন নি। পুঁথিগত বিদ্যা ফলাবার মতো পুঁজি ছিল না। তাই সুবিধা পেলেই জানিয়ে দিতুম যে কবিতা লেখবার হাত আমার আছে। আদর আদায় করবার ঐ ছিল আমার সবচেয়ে বড় মূলধন। যাঁর কাছে নিজের এই কবিআনার জানান দিয়েছিলেম তিনি সেটা মেপেজুখে নেন নি। মেনে নিয়েছিলেন। কবির কাছ থেকে একটা ডাক নাম চাইলেন, দিলেম যুগিয়ে, সেটা ভালো লাগল তাঁর কানে। ইচ্ছে করেছিলেম সেই নামটি আমার কবিতার ছন্দে জড়িয়ে দিতে। বেঁধে দিলুম সেটা কাব্যের গাঁথুনিতে। শুনলেন সেটা ভোরবেলাকার ভৈরবী সুরে, বললেন, কবি তোমার গান শুনলে আমি বোধহয় আমার মরণ-দিনের থেকেও প্রাণ পেয়ে জেগে উঠতে পারি। এর থেকে বোঝা যাবে, মেয়েরা যাকে আদর জানাতে চায় তার কথা একটু মধু মিশিয়ে বাড়িয়েই বলে। সেটা খুশি ছড়িয়ে দেবার জন্যেই। মনে পড়ছে তাঁর মুখেই প্রথম শুনেছিলুম আমার চেহারার তারিফ। সেই বাহবায় অনেক সময় গুণপনা থাকতো।

যেমন একবার আমাকে বিশেষ করে বলেছিলেন, একটা কথা আমার রাখতেই হবে, তুমি কোনদিন দাড়ি রেখো না—তোমার মুখের সীমানা যেন কিছুতেই ঢাকা না পড়ে। তাঁর এই কথা আজ পর্যন্ত মনে রাখা হয় নি সেকথা সকলেরই জানা আছে। আমার মুখে অবাধ্যতা প্রকাশ পাবার পূর্বেই তাঁর মৃত্যু হয়েছিলো।

আমাদের এই বটগাছটাতে কোন কোন বৎসরে হঠাৎ বিদেশী পাখি এসে বাসা বাঁধে। তাদের ডানার নাচ চিনে নিতে নিতেই দেখি তারা চলে গেছে। তারা অজানা সুর নিয়ে আসে দূরের বন থেকে। তেমনি জীবনযাত্রার মাঝে মাঝে জগতের অচেনা মহল

থেকে আসে আপন-মানুষের দূতী, হৃদয়ের দখলের সীমানা বড় করে দিয়ে যায়। না ডাকতেই আসে। শেষকালে একদিন ডেকে আর পাওয়া যায় না। চলে যেতে যেতে বেঁচে থাকার চাদরটার উপরে ফুলকাটা কাজের পাড় বসিয়ে দেয়, বরাবরের মতো দিনরাত্রির দাম দিয়ে যায় বাড়িয়ে।" [ছেলেবেলা]

ঘটনার পর ষাট বছরের বেশী অতিক্রম করা সত্ত্বেও যাঁর স্মৃতি এমন মমতা ও মাধুর্য আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়, বুঝতে হবে তিনি সামান্য ব্যক্তি ছিলেন না।

এ বিষয়ে রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় যা লিখেছেন এখানে তা উদ্ধার ক'রে দিলে বিষয়টি আরও পরিষ্কার হবে আশা করা যায়।

"কয়েকমাস আমেদাবাদে রাখিয়া সত্যেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথকে বোম্বাইয়ে তাঁহাদের এক বন্ধুর নিকট পাঠাইয়া দিলেন···বিলাতে যাইবার পূর্বে তাঁহাকে ইংরাজি চাল চলনে ও কথাবার্তায় পাকা করা দরকার। বোম্বাইয়ের পাণ্ডুরঙ্গ পরিবার ইংরেজি শিক্ষা ও ইংরাজি-আনার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। সত্যেন্দ্রনাথের বন্ধু দাদোবা পাণ্ডুরঙ্গের বিলাত-ফেরত কন্যা আন্না তড়খড়-এর ছিল ইংরেজিতে অসাধারণ দখল। রবীন্দ্রনাথ হইতে বয়সে তিনি কিছু বড়। ইহার নিকট তিনি ইংরেজি বলা-কওয়ার পাঠ লইতেন।"

[রবীন্দ্রজীবনী, ১ম খণ্ড]

খুব সম্ভব এই মহিলাটিই বাংলাদেশের বাহিরে রবীন্দ্রসাহিত্যের অনুরাগিণী। তখন রবীন্দ্রনাথ কীই বা লিখেছিলেন—তবু তিনি অস্ফুট উষার মধ্যে আভা দেখতে পেয়েছিলেন মধ্যাহ্ন সূর্যের। এও এক রকম প্রতিভা। অল্প বয়সেই এই তরুণীর মৃত্যু হয়। শুনতে পেলাম এই প্রতিভাময়ী রমণীর নশ্বরদেহ যেখানে সমাহিত—তা জীর্ণ, জঙ্গলাকীর্ণ এবং সম্পূর্ণ অবহেলিত। কবির জন্ম-শতবার্ষিকীর সময়

রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রথম অনুরাগিণীকে ভুললে চলবে না। তাঁর সমাধি যাতে সুরক্ষিত হয়, সুচিহ্নিত হয়—তার দায়িত্ব মহারাষ্ট্রের, বাংলা দেশের, তথা রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী উদ্যোক্তাগণের।

বিলাত থেকে ফিরে এলেন রবীন্দ্রনাথ—কিন্তু মহারাষ্ট্রের সঙ্গে যোগ ছিন্ন হল না—যোগসূত্ররূপ রইলো সত্যেন্দ্রনাথের কর্মজীবন। কখনও পুণায়, কখনও শোলাপুরে, কখনো কারোয়ারে এসে বাস করেছেন তরুণ কবি মধ্যমাগ্রজের আশ্রয়ে। তার মধ্যে কারোয়ার বাসের স্মৃতিটাই তাঁর কাছে সবচেয়ে মধুর মনে হয়েছিল। অনেককাল পরে 'জীবনস্মৃতি' নামে আত্মচরিত লিখবার সময়, বর্ণনা করেছেন কারোয়ারের সমুদ্রের, ঝাউগাছের অরণ্যের আর ক্ষুদ্র কালানদীর সমুদ্র-সঙ্গমের। এখানেই প্রকৃতির প্রতিশোধ নামে একটি নাট্য কাব্য তিনি রচনা করেন। "অর্ধ-চন্দ্রাকারে বেলাভূমি অকূল নীলাম্বুরাশির অভিমুখে দুই বাহু প্রসারিত" ক'রে দিয়ে সীমা যেন অসীমকে আলিঙ্গন করতে চেষ্টা করছে। হয়তো এই নৈসর্গিক দৃশ্যটি 'প্রকৃতির প্রতিশোধের' মূল ভাবটিকে সমর্থন করেছিল। নাট্যখানির মূল কথা সীমা ও অসীমের সম্বন্ধের রহস্যময় তত্ত্ব।

এর পরে কবি বিবাহ ক'রে সংসার-জীবনে প্রবেশ করলেন। তখনও মাঝে মাঝে এসেছেন মহারাষ্ট্রে। এই রকম একবার পুণাতে এসে রমাবাঈ-এর বক্তৃতা শুনে মুগ্ধ হন। রমাবাঈ কোঙ্কন প্রদেশের মহিলা, বাগ্মী ও পণ্ডিত। তিনি আর্য-মহিলা-সমিতির প্রতিষ্ঠাতা। রমাবাঈ সম্বন্ধে তিনি একটি প্রবন্ধও লিখেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের কেমন যেন একটা মায়া পড়ে গিয়েছিল মহারাষ্ট্র দেশটার উপরে। ১৮৮৯ সালে একখানি চিঠিতে লিখছেন— "খিড়কি স্টেশনের কাছাকাছি আমাদের সেই ক্ষেত, গাছের সার, টেনিস ক্ষেত্র। কাঁচের জানলামোড়া বাড়ি দেখতে পেলুম, দেখে

মনটা হঠাৎ কেমন হু হু করে উঠল। এই এক আশ্চর্য।" বাড়ি ছেড়ে, দেশ ছেড়ে যাওয়ার সময়ে মানুষ যে মাধুর্যময় মমত্ব অনুভব করে এ হচ্ছে তাই।

১৮৯১ সালে উড়িষ্যা থেকে লিখছেন—"এখানকার খালটি দেখে পুণার ছোট্ট নদীটি মনে পড়ে।" আবার ১৮৯২ সালে বাংলাদেশ থেকে লিখিত একখানি পত্রে রেলগাড়িতে ক'রে মহারাষ্ট্রে যেতে গেলে পথের মধ্যে যে সব দৃশ্য দেখা যায় তার বর্ণনা ক'রে মানস-ভ্রমণের আনন্দ-অনুভব করেছেন তিনি।

এখন কবি কর্মজীবনের দায়িত্বে বদ্ধ, মহারাষ্ট্রের সঙ্গে যাতায়াতের যোগাযোগ ক্ষীণ হয়ে এসেছে। আর সত্যেন্দ্রনাথও চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণ ক'রে ফিরে এসেছেন কলকাতায়। কিন্তু মহারাষ্ট্রের সঙ্গে কবির যোগ ছিন্ন হল না, হল তার রূপান্তর। সে সম্বন্ধের সূচনা হয়েছিল ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও অনুভূতিতে, এবারে ব্যাপক ও গভীর হয়ে সর্বজনীন রূপ গ্রহণ করলো। যে ঝরনা ছিল পাহাড়ের খেলবার সামগ্রী এখন সমতলে নেমে এসে তা নদীরূপ গ্রহণ করলো। তা ক্ষেতে যোগাচ্ছে চাষের জল, ঘাটে যোগাচ্ছে স্নানের জল, তাতে চলাচল করছে বাণিজ্যের নৌকা।

রবীন্দ্রনাথের বয়স অনেকদিন ত্রিশ পেরিয়েছে, এখন চল্লিশের কাছাকাছি। দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা তাঁকে উদ্বিগ্ন ক'রে তুলেছে। প্রাচীন কাব্য-শাস্ত্র ও ইতিহাস থেকে ভারতের যে আদর্শ তার মনের মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে—তার কোন সমর্থন পাচ্ছেন না বর্তমানের মধ্যে। এ রকম উদ্বেগজনক অভিজ্ঞতা সকল মনীষীকেই ভোগ করতে হয়—রবীন্দ্রনাথকেও হল। কিন্তু নীরবে সহ্য ক'রে তো শান্তি নেই। তিনি দেশের ইতিহাস ও পুরাণ থেকে কাহিনী নিয়ে তাঁর আদর্শকে কাব্যরূপ দিতে চেষ্টা করলেন।

মহারাষ্ট্র যুগিয়েছে এমন কয়েকটি উদাহরণ। প্রতিনিধি কবিতায়

(১৮৯৭) আঁকলেন রাজসন্ন্যাসী ছত্রপতি শিবাজীর চিত্র, তিনি সমগ্র রাজত্ব দানপত্র ক'রে সমর্পণ করলেন গুরু রামদাসের পায়ে। গুরু শিষ্য পরস্পরের যোগ্য। গুরু ফিরিয়ে দিলেন রাজত্ব, বললেন, এখন থেকে তুমি আমার প্রতিনিধি মাত্র,—

"তোমারে করিলা বিধি ভিক্ষুকের প্রতিনিধি
রাজ্যেশ্বর দীন উদাসীন ;
পালিবে যে রাজধর্ম জেনো তাহা মোর কর্ম,
রাজ্য লয়ে রবে রাজ্যহীন।"

তারপরে আরও বললেন—

"বৎস, তবে এই লহ মোর আশীর্বাদসহ
আমার গেরুয়া গাত্রবাস,
বৈরাগীর উত্তরীয় পতাকা করিয়া নিয়ো ;
কহিলেন গুরু রামদাস।"

এই হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের রাজার আদর্শ, আদর্শরাজা।

তারপর ন্যায়দণ্ডের মহিমা বর্ণনা করেছেন বিচারক কবিতায় (১৮৯৯) রঘুনাথ রাও ভ্রাতুষ্পুত্র মাধব রাও নারায়ণকেও হত্যা ক'রে নিজে পেশবা হলেন। কিন্তু তাঁর খেয়াল হয় নি যে রাজ্যের প্রধান বিচারক হচ্ছেন রামশাস্ত্রী। রামশাস্ত্রী তাঁকে হত্যার অপরাধে অভিযুক্ত করলে রঘুনাথ তাঁকে পদচ্যুত করলেন। নির্ভীক ব্রাহ্মণ রাজরোষ ও রাজদাক্ষিণ্যে ভ্রূক্ষেপ মাত্র না ক'রে পদত্যাগ ক'রে স্বগ্রামে ফিরে গেলেন।

কহিলা শাস্ত্রী—'রঘুনাথ রাও
যাও করো গিয়ে যুদ্ধ।
আমিও দণ্ড ছাড়িনু এবার,
ফিরিয়া চলিনু গ্রামে আপনার,
বিচার শালার খেলাঘরে আর
না রহিব অবরুদ্ধ।'

এই রকম রাজা, এই রকম বিচারককে অবলম্বন ক'রেই জাত বড় হয়ে ওঠে।

১৮৯৭ সালে একটি মারাঠী গাথা অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ সতী নামে এক নাট্যকাব্য রচনা করেন—এটি তাঁর একটি শ্রেষ্ঠ রচনা।

বিনায়ক রাও-এর কন্যা অমাবাঈয়ের সঙ্গে একটি মারাঠী যুবকের বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হয়। বরযাত্রীগণ যখন আসছে, পথের মধ্যে তাদের পরাজিত ক'রে, বিজাপুর রাজ্যের এক মুসলমান সভাসদ সদলে এসে অমাবাঈকে কেড়ে নিয়ে গেল বিয়ে ক'রে। অমাবাঈ তাকে পতি বলে স্বীকার ক'রে নিল। এদিকে বিনায়ক রাও, তার পত্নী রমাবাঈ এবং পরাজিত মনোনীত বর জীবাজী প্রতিশোধ গ্রহণের চেষ্টায় রইলো। অনেকদিন পর রণক্ষেত্রে পিতামাতার সঙ্গে সদ্য-বিধবা কন্যার সাক্ষাৎকার— যুদ্ধে জীবাজী এবং অমাবাঈয়ের স্বামী দুজনেই নিহত হয়েছে। বিনায়ক ও তার পত্নী চায় যে কন্যা জীবাজীর সঙ্গে সহমৃতা হোক। অমাবাঈ বলে তা সম্ভব নয়, কেননা জীবাজী পরপুরুষ। তখন রমাবাঈ-এর আদেশে সৈন্যগণ কন্যাকে বলপূর্বক জীবাজীর চিতায় আরোহণ করতে বাধ্য করলো।

ঘটনার এই কঙ্কাল থেকে কাব্যের মহত্ত্ব বুঝতে পারা যাবে না। এখানে দ্বন্দ্ব বেধেছে লৌকিক ধর্ম আর নিত্যধর্মের মধ্যে। লৌকিক ধর্মের বিচারে অমাবাঈ পতিত, নিত্যধর্মের বিচারে সে সতী। কবির সমর্থন নিত্যধর্মের দিকে। রবীন্দ্রনাথের মন তখন ধর্মের স্বরূপ চিন্তা করছে—এই নাটকটি তার একটি দৃষ্টান্ত।

ইতিমধ্যে দেশের রাজনীতি আবেদন নিবেদনের নিরাপদ পথ পরিত্যাগ করেছে। অনিশ্চিত দুর্গমের দিকে শুরু হয়েছে তার যাত্রা। রাজপুরুষের রক্তচক্ষুর প্রতিক্রিয়ায় দেশের দিগন্তেও রক্তরাগ দেখা দিতে আরম্ভ করেছে। রাজনীতিতে আত্মশক্তিনিয়োগের পথে মহারাষ্ট্র ভারতে অগ্রণী, মহারাষ্ট্রের একচ্ছত্র নেতা লোকমান্য টিলক।

পুণাতে প্রথম প্লেগ দেখা দিলে রোগের চেয়ে অধিকতর ভয়াবহ হয়ে উঠল রোগের প্রতিকার-চেষ্টা। তুজন ইংরাজ রাজকর্মচারী নিহত হল। লোকমান্য রাজদ্রোহের অপরাধে অভিযুক্ত হলেন। তখন তাঁর মামলার ব্যয় বাবদ চাঁদা তুলবার কাজে কলকাতায় যাঁরা অগ্রসর হলেন রবীন্দ্রনাথ তাঁদের মধ্যে প্রধান। সতেরো হাজার টাকা ও তিনজন কৌসুলী প্রেরিত হল লোকমান্যের সাহায্যার্থে। তারপরে ১৮৯৮ সালে সিডিশ্যন বিল বিধিবদ্ধ হয়—এই উপলক্ষে রচিত হল রবীন্দ্রনাথের 'কণ্ঠরোধ' প্রবন্ধ।

১৯০২ সালে রবীন্দ্রনাথ 'ব্রাহ্মণ' নামে একটি প্রবন্ধ লিখে ইংরাজ প্রভু কর্তৃক একজন মারাঠী ব্রাহ্মণের লাঞ্ছনার প্রতিবাদ জানালেন। তাঁর ধারণা এই যে, ব্রাহ্মণের লাঞ্ছনা ব্যক্তিবিশেষের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে না—দেশের একটি পবিত্র ঐতিহ্যের উপরে গিয়ে পড়ে।

১৯০৪ সালে কলকাতায় শিবাজী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এর প্রেরণা ১৮৯৭ সালে লোকমান্য কর্তৃক মহারাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত শিবাজী উৎসব—আর এর প্রধান উদ্যোক্তা সখারাম গণেশ দেউস্কর নামে একজন মহারাষ্ট্রী বাঙালী। তাঁরই অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ লেখেন শিবাজী উৎসব নামে বিখ্যাত কবিতাটি। সেটি কলকাতার টাউন হলে পঠিত হয়েছিল। শোনা যায় যে কবিতাটি মারাঠী অনুবাদ পাঠ ক'রে লোকমান্য কবিকে লেখেন যে তাঁর এই কবিতাই 'বঙ্গ মারাঠারে এক করি দিবে বিনা রণে।'

দেশাত্মবোধের উন্মেষের সেই প্রথম প্রহরে লোকের মন দেশের ইতিহাসের মধ্যে বীরের সন্ধানে বের হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের 'শিবাজী উৎসব' কবিতাটিতে সেই বীরের আবিষ্কার। সে বীর ছত্রপতি শিবাজী। তিনি 'এক ধর্মরাজ্যপাশে খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারতকে' বেঁধে দিতে চেয়েছিলেন। তিনি বিদেশী ঐতিহাসিকের পুঞ্জীভূত লাঞ্ছনা অপসারিত ক'রে স্বকীয় মহিমায় আজ প্রতিষ্ঠিত। তিনি

ভারতকে স্বারাজ্যে উদ্বোধিত করেছেন। সেই কথা স্মরণ ক'রে কবি বিশেষভাবে একত্র আহ্বান করেছেন মহারাষ্ট্র ও বাংলাকে—

"মারাঠির সাথে আজি হে বাঙালি, এক কণ্ঠে বলো
জয়তু শিবাজি,
মারাঠির সাথে আজি হে বাঙালি, এক সঙ্গে চলো
মহোৎসবে সাজি।
আজি এক সভাতলে ভারতের পশ্চিম পূরব
দক্ষিণে ও বামে
একত্রে করুক ভোগ এক সাথে একটি গৌরব
এক পুণ্য নামে।"

ছত্রপতি মহারাজের রাষ্ট্রীয় আদর্শ কি ছিল তা বিচারের যোগ্যতা আমার নেই—সে বিচার এই কবিতার লক্ষ্যও নয়। সেদিন লোকে বিশ্বাস করতে ভালোবাসতো যে ঐ রকম একটি বীর আছেন নিকট-ইতিহাসের মধ্যেই। মারাঠীর সঙ্গে বাঙালীর বোধহয় একটা আন্তরিক মিল আছে, দুই সমাজই মধ্যবিত্ত-প্রধান, চিত্ত-সম্পদে ধনী, ভাবুক ও আদর্শবাদী। খুব সম্ভব এই মিল স্মরণ ক'রেই রবীন্দ্রনাথ মারাঠী ও বাঙালীকে একত্র আহ্বান করেছিলেন। নব্য মহারাষ্ট্রের ভাবমূর্তি লোকমান্য টিলকের প্রতি রবীন্দ্রনাথের অশেষ শ্রদ্ধা ছিল, কেননা তিনি শুধু লোকমান্য ছিলেন না, তিনি ছিলেন লোকরাজ। টিলকও রবীন্দ্রনাথের প্রতি অশেষ শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন। টিলককে কবি কি চক্ষে দেখতেন রবীন্দ্রনাথের কথাতেই বলি—

"এই উপলক্ষে একটি কথা আমার মনে পড়ছে। তখন লোকমান্য টিলক বেঁচে ছিলেন। তিনি তাঁর কোন এক দূতের যোগে আমাকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে বলে পাঠিয়েছিলেন আমাকে য়ুরোপে যেতে হবে। যে সময়ে নন্‌-কো-অপারেশন আরম্ভ হয় নি বটে কিন্তু পোলিটিক্যাল আন্দোলনের তুফান বইছে। আমি বললুম—'রাষ্ট্রিক আন্দোলনের কাজে যোগ দিয়ে আমি য়ুরোপ যেতে পারবো না।'

তিনি বলে পাঠালেন—আমি রাষ্ট্রিক চর্চায় থাকি, এ তাঁর অভিপ্রায়-বিরুদ্ধ। ভারতবর্ষের যে বাণী আমি প্রচার করতে পারি সেই বাণী বহন করাই আমার পক্ষে সত্য কাজ, এবং সেই সত্য কাজের দ্বারাই আমি ভারতের সত্য সেবা করতে পারি। আমি জানতুম জনসাধারণ টিলককে পোলিটিক্যাল নেতারূপেই বরণ করেছিল এবং সেই কাজেই তাঁকে টাকা দিয়েছিল। এইজন্য আমি তাঁর পঞ্চাশ হাজার টাকা গ্রহণ করতে পারি নি। তারপরে, বোম্বাই শহরে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। তিনি আমাকে পুনশ্চ বললেন, 'রাষ্ট্রনীতিক ব্যাপার থেকে নিজেকে পৃথক রাখবে, তবেই আপনি নিজের কাজ সুতরাং দেশের কাজ করতে পারেন, এর চেয়ে বড় আর কিছু আপনার কাছ থেকে প্রত্যাশাই করি না।' আমি বুঝতে পারলুম টিলক যে গীতার ভাষ্য করেছিলেন সে কাজে তাঁর অধিকার ছিল ; সেই অধিকার মহৎ অধিকার॥" [রবীন্দ্র রচনাবলী, ১৯শ খণ্ড]

এ ঘটনা ১৯১৮ সালের।

প্রসঙ্গ দীর্ঘ হয়ে পড়ছে এবারে ক্ষান্তির সময় এলো। যে উদ্দেশ্য নিয়ে এ প্রসঙ্গ আরম্ভ করেছিলাম আশা করি তার একটা আভাস দিতে সক্ষম হয়েছি। শুধু একটি কথা। মহারাষ্ট্র তার এই মহান আত্মীয়টিকে চিনতে ভুল করে নি, এখান থেকে তিনি সম্মান, সমাদর ও সংবর্ধনা যথেষ্ট পেয়েছেন। এঁরা বিশ্বভারতীর সাহায্যকল্পে দাক্ষিণ্য ভোলেন নি। কবির শেষজীবনের এসব বিবরণ এখনও জীবিত স্মৃতির মধ্যেই আছে, বিস্তার অনাবশ্যক। 'ঘ' পরিশিষ্টে কয়েকটি মাত্র তথ্যের উল্লেখ করলাম।

রবীন্দ্রনাথের জন্ম-শতবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হচ্ছে মহারাষ্ট্রের রাজধানী বোম্বাই নগরীতে। দুর্লভ উপলক্ষ্য নিঃসন্দেহ। এখানে কিছু হাতে ক'রে উপস্থিত হতে হলে মহারাষ্ট্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রীতির সম্বন্ধই যোগ্যতম বিষয়। সেই ভরসায় আমার এই সামান্য প্রচেষ্টা।

রবীন্দ্রনাথের মতে ভারতবর্ষ একটি ভূখণ্ড মাত্র নয়--একটি মহৎ আইডিয়া। আর সে আইডিয়া বিচিত্র বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে চরিতার্থতার দিকে এগিয়েই চলেছে স্থাণু স্থির জড়ধর্মী বস্তু এ নয়—এ চির ভূয়মান। সারা জীবন ধরে এই তত্ত্বটি তিনি দেশকে বোঝাতে চেষ্টা করেছেন, দেশ যে সম্পূর্ণভাবে বুঝে উঠেছে এমন মনে হয় না। অথচ ঐ পথে এগিয়ে যাওয়া ছাড়া আর তো উপায় নেই—ইতিহাসের প্রেরণাই ঐ দিকে। রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী কবির এই শিক্ষা স্মরণ করবার উপলক্ষ্য। তাতে ক'রে শুধু মহারাষ্ট্র ও বাংলাদেশ নয়—ভারতের প্রত্যেক অঙ্গরাজ্য পরস্পরের সঙ্গে একটি ব্যক্তিগত অন্তরঙ্গতা ও পারিবারিক ঘনিষ্ঠতা অনুভব করবে। একেই নামান্তরে বলতে পারা যায় ভারতবর্ষ। নব্য ভারতের বেদব্যাসকে আমরা প্রণাম করতে সমবেত হয়েছি, ভারতের চিরন্তন মূর্তি সার্থক হয়ে উঠুক, উজ্জ্বল হয়ে উঠুক, সত্য হয়ে উঠুক আমাদের সম্মুখে।*

॥ পরিশিষ্ট ॥

ক

মহারাষ্ট্রের কাহিনী অবলম্বনে লিখিত কবিতা ও নাটক—

১ ॥ প্রতিনিধি। ১৮৯৭।

ছত্রপতি শিবাজী কর্তৃক গুরু রামদাসকে রাজ্য সমর্পণের ঘটনা অবলম্বনে লিখিত। ॥ রবীন্দ্র রচনাবলী, ৭ম খণ্ড ॥

২ ॥ সতী। ১৮৯৭।

"মিস ম্যানিং সম্পাদিত ন্যাশনাল ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের পত্রিকায় মারাঠী গাথা সম্বন্ধে অ্যাকওয়ার্থ সাহেব রচিত প্রবন্ধ-বিশেষ হইতে বর্ণিত ঘটনা সংগৃহীত।" ॥ রবীন্দ্র রচনাবলী, ৫ম খণ্ড ॥

* এই প্রবন্ধের অনেক উপাদান শ্রীঅমল হোম ও শ্রীপুলিনবিহারী সেনের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

৩ ॥ বিচারক। ১৮৯৯।

রঘুনাথ রাও কর্তৃক ভ্রাতুষ্পুত্র মাধব রাও নারায়ণ নিহত হলে, রঘুনাথ রাও পেশবা পদে অধিষ্ঠিত হন। তখন মহারাষ্ট্র রাজ্যের প্রধান বিচারপতি রামশাস্ত্রী রঘুনাথকে হত্যাপরাধে অভিযুক্ত করেন। উত্তরে রঘুনাথ তাঁকে পদচ্যুত করলে রামশাস্ত্রী প্রধান বিচারপতির পদ ত্যাগ করে স্বগ্রামে ফিরে যান। এই ঘটনাটি অবলম্বন করে বিচারক কবিতাটি লিখিত। ॥ রবীন্দ্র রচনাবলী, ৭ম খণ্ড ॥

৪ ॥ শিবাজী উৎসব। ১৯০৪।

লোকমান্য টিলকের প্রেরণায় সখারাম গণেশ দেউস্কর নামে মারাঠী সাহিত্যিকের উদ্যোগে ১৯০৪ সালে কলিকাতায় শিবাজী উৎসব উদ্‌যাপিত হয়।—তদুপলক্ষে কবিতাটি লিখিত। ॥ সঞ্চয়িতা ॥

॥ পরিশিষ্ট ॥

খ

মহারাষ্ট্রের ইতিহাস ও সমসাময়িক প্রসঙ্গ নিয়ে লিখিত প্রবন্ধাদি—

১ ॥ সুবিচারের অধিকার। ১৮৯৪।

প্রসঙ্গ : "সংবাদপত্র পাঠকগণ অবগত আছেন অল্পকাল হইল সেতারা জিলায় বাই নামক নগরে তেরজন সম্ভ্রান্ত হিন্দু জেলে গিয়াছেন। তাঁহারা অপরাধ করিয়া থাকিবেন, এবং আইনমতেও হয়তো তাঁহারা দণ্ডনীয় —কিন্তু ঘটনাটি সমস্ত হিন্দুর হৃদয়ে আঘাত করিয়াছে এবং আঘাতের ন্যায্য কারণও আছে।" ॥ রবীন্দ্র রচনাবলী, ১০ম খণ্ড ॥

২ ॥ কণ্ঠরোধ। ১৮৯৮।

প্রসঙ্গ : সিডিশ্যন বিল পাস হইবার পূর্বদিনে টাউন হলে পঠিত।

॥ রবীন্দ্র রচনাবলী, ১০ম খণ্ড।

"কেশরীর বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের মামলা দীর্ঘকাল চলিবার পর টিলকের দুইবৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হইল (১৮৯৮) এই ব্যাপারে সমস্ত দেশময় যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হইল, তাহা গভর্ণমেণ্ট যাহা চাহিয়াছিলেন ঠিক

তাহার বিপরীত ; দিকে দিকে প্রবল অসন্তোষ নানাভাবে ছড়াইয়া পড়িল ; সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে নূতন আইন হইল। এই আইন সিডিশ্যন বিল, ১৮৯৮ পাশ, হইবার পূর্বদিন কলিকাতার টাউনহলের প্রতিবাদ সভায় রবীন্দ্রনাথ 'কণ্ঠরোধ' নামে যে প্রবন্ধ পাঠ করেন তাহা 'গভর্ণমেণ্ট···পুণা শহরের বক্ষের উপর রাজদণ্ডের যে জগদ্দল পাথর চাপাইয়া দিলেন' তাহারই পরিপ্রেক্ষিতে।"

(বলবন্ত গঙ্গাধর টিলক, অমল হোম, বিশ্বভারতী, পত্রিকা, ১৩৬৩)

এই প্রবন্ধে এই প্রসঙ্গে দণ্ডিত নাটু সর্দারগণের উল্লেখ আছে।

৩॥ প্রসঙ্গ কথা। ১৮৯৮।

প্রসঙ্গ : প্লেগ মহামারী চিকিৎসা ও প্রতিরোধ উপলক্ষে পুণা ও কলিকাতায় কর্তৃপক্ষের মনোভাবের তুলনামূলক আলোচনা।

॥ রবীন্দ্র রচনাবলী, ১০ম খণ্ড ॥

৪॥ ব্রাহ্মণ। ১৯০২।

প্রসঙ্গ : "সকলেই জানেন, সম্প্রতি কোন মহারাষ্ট্রী ব্রাহ্মণকে তাঁহার ইংরেজ প্রভু পাদুকাঘাত করিয়াছিল—তাহার বিচার উর্ধ্বতন বিচারালয় পর্যন্ত গড়াইয়াছিল—শেষ বিচারক ব্যাপারটাকে তুচ্ছ বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন।"

॥ রবীন্দ্র রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড ॥

৫॥ শিবাজী ও মারাঠা জাতি। ১৯১০।

শিবাজী মহারাজের প্রতিভায়, নেতৃত্বে ও আদর্শবাদে মারাঠাজাতি কি ভাবে একটি নেশনে দানা বেঁধে উঠল তারই ব্যাখ্যা।

॥ ইতিহাস ॥

৬॥ শিবাজী ও গুরুগোবিন্দ সিংহ। ১৯১০।

মহারাষ্ট্রের ও শিখসমাজের মহানায়কদের তুলনামূলক আলোচনা।

॥ ইতিহাস ॥

৭॥ বোম্বাই শহর। ১৯১২।

বোম্বাই শহরের চারিত্রিক ও আর্থিক বৈশিষ্ট্যের বিশ্লেষণ।

॥ রবীন্দ্র রচনাবলী, ২৬শ খণ্ড ॥

৮॥ লোকমান্য টিলক সম্বন্ধে। ১৯২৪।

॥ রবীন্দ্র রচনাবলী, ১৯শ খণ্ড ॥

॥ পরিশিষ্ট ॥

গ

রবীন্দ্রনাথ এক সময়ে সন্ত তুকারামের অনেকগুলি অভঙ্গের বঙ্গানুবাদ করেছিলেন—তন্মধ্যে কয়েকটি এখানে প্রদত্ত হল।*

॥ ১ ॥

আমারি বেলায় উনি যোগী,
নিজের তো বাকি নাই সুখ,
সব সুখ ঘরে আসে, শুধু
আমারি ত ঘুচিল না দুখ।
ঘরে মোর অন্ন নেই বলে
বল দেখি যাই কার দ্বার;
এই পোড়া সংসারের তরে,
আপদ সহিব কত আর ?
অন্ন অন্ন করে রাত দিন
ছেলেগুলো খেলে যে আমায় !
মরণ তাদের হয় যদি
সকল বালাই ঘুচে যায়।
সকলি ঝেঁটিয়ে নিয়ে যান
তিলমাত্র ঘরে থাকা ভার।
তুকা বলে 'দূর পোড়ামুখী,
আপনি মাথায় নিলি ভার।
এখন তাহার তরে মিছে
কাঁদিলে কি হবে বল আর !'

—নবরত্নমালা, পঞ্চম ভাগ, পৃ ৮
—অভঙ্গ ৫৬৬

* শ্রীপুলিনবিহারী সেন ও শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্যের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

॥ ২ ॥

বোধ হয় এ পাষণ্ড,
পূর্বজন্মে ছিল মোর অরি।
এ জনমে স্বামী হয়ে
বৈর সাধিতেছে এত করি।

কত দুঃখ সব আর,
কত ভিক্ষা মাগি পর দ্বারে,
বিঠোবার মুখে ছাই—
কি ভাল কল্লেন এ সংসারে ?
তুকা বলে "স্ত্রী আমার
রাগিয়া কতই কটু ভাষে,
কভু বা কাঁদিয়া মরে,
কভু বা আপন মনে হাসে।" —অভঙ্গ, ৫৬৭

॥ ৩ ॥

ঘরে দুটা অন্ন এলে
ছেলেদের দেব কোথা খেতে।
হতভাগা তা দেবে না,
সকলি পরের যান দিতে।
তুকা বলে 'অতিথিরে
যখনি গো দিতে যাই ভাত,
রাক্ষসীর মত এসে
হতভাগী ধরে মোর হাত।
না জানি যে পূর্ব জন্মে
কতই করিয়াছিলি পাপ।'
তুকা বলে 'এ জনমে
তাই এত পেতেছিস্ তাপ।' —অভঙ্গ ৫৬৮

॥ ৪ ॥

খাবার কোথায় পাবি বাছা,
বাপ তোর থাকেন মন্দিরে—
মাথায় জড়ান তিনি মালা,
ঘরে আর আসেন না ফিরে।
নিজের হলেই হল খাওয়া
আমাদের দেখেন না চেয়ে।
খর্তাল বাজিয়ে তিনি শুধু
মন্দিরে বেড়ান গেয়ে গেয়ে।
কি করিব বল্ দিখি, বাছা,
কিছুই ত ভেবে নাহি পাই।
ঘরে না বসেন একরতি,
চলে যান অরণ্যে সদাই।
তুকা বলে "ধৈর্য ধর মনে
এখনো সকল ফুরায় নাই।" —অভঙ্গ ৫৬৯

॥ ৫ ॥

গেছে সে সম্পদ গেছে,
ঘরেতে থাকিবে শুধু রুটি,
যা হোক্ তা হোক্ করে
পেট ভরে খেতে পাব দুটি·
বোকে বোকে দিনু এল্যে
জ্বালাতন হনু হাড়ে মাসে,
তুকা বলে 'যদিও সে
দিবানিশি কত কটু ভাষে।
তুকারে তুকার স্ত্রী যে
মনে মনে তবু ভাল বাসে।' —অভঙ্গ ৫৭০

॥ ৬ ॥

ঘরে আর আসে না সে,
কোনো পরিশ্রম নাহি করে
নিজে নাকি খেতে পায়
রোজ রোজ সুখে পেট ভরে !
না উঠিতে শয্যা হতে—
মিলি দলবল গুল্লা সাথে
করতাল বাজাইতে
আরম্ভ করেন অতি প্রাতে।
খেয়েছে লজ্জার মাথা,
জ্যান্তে তারা মড়ার মতন,
ঘরে আছে ছেলে পিলে,
তাদের ত না করে যতন ।
স্ত্রী তাদের পড়ে আছে—
হতভাগী লাজ দুঃখ ভরে
অভিশাপ দিতে দিতে
মাথায় পাথর ভেঙে মরে ।
'ভাগ্যে যাহা আছে তাহা'
তুকা বলে, 'থাক সহ্য করে ।' —অভঙ্গ ৫৭১

॥ ৭ ॥

হেথা কেন আসে লোকগুলা,
তাদের কি কাজ নাই হাতে ?
তুকা কহে, 'ঈশ্বরের তরে,
ব্রহ্মাণ্ড মিলেছে মোর সাথে ।
ভাল বুঝে দু-চারিটা কথা,
না জানি তাহে কি ক্ষতি আছে ;

কোথাও যায় না যারা কভু,
ভালবেসে আসে' মোর কাছে।
এও সে বাসে না ভাল হায়,
ভাগ্য কিবা আছে এর বাড়া—
সকল লোকের পাছে পাছে
কুকুরের মত করে তাড়া।' —অভঙ্গ ৫৭২

॥ পরিশিষ্ট ॥

ঘ

রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনে বোম্বাই তথা মহারাষ্ট্রের সঙ্গে যোগাযোগ।

১ ॥ ১৯২০ সালে মহাত্মা গান্ধীর আমন্ত্রণে আমেদাবাদ যাওয়ার পথে বোম্বাই স্টেশনে রবীন্দ্রনাথের বিপুল সম্বর্ধনা। বনিতা আশ্রমে নারীমঙ্গল প্রতিষ্ঠানে কবির ভাষণ।

২ ॥ ১৯২২ সালে পুণায় কিরলোসকর থিয়েটারে 'ইণ্ডিয়ান রেনেসাঁস' সম্বন্ধে কবির বক্তৃতা। টিলকের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন।

৩ ॥ ঐ সালেই দক্ষিণ ভারত থেকে ফিরবার পথে বোম্বাই শহরে কবি ইণ্ডো-ইরানিয়ান্‌স্ সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন।

৪ ॥ ১৯৩২ সালে পুণা জেলে অনশন-ব্রতী গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার উদ্দেশ্যে কবির পুণা গমন। মহাত্মাজীর জন্মদিন উপলক্ষে তিনি একটি প্রবন্ধ লেখেন, প্রবন্ধটি মালব্যজী কর্তৃক শিবাজী মন্দিরে পঠিত হয়।

৫ ॥ ১৯৩৩ সালে বোম্বাই নগরীতে রবীন্দ্র সপ্তাহ উদ্‌যাপন। সরোজিনী নাইডুর নেতৃত্বে কবি বিপুল সম্বর্ধনা লাভ করেন। এই উপলক্ষেই রিগ্যাল থিয়েটারে 'দি চ্যালেঞ্জ অফ জাজ-

মেণ্ট’ নামে কবি এক বক্তৃতা দেন। ২৯শে নভেম্বর মালাবার হিলে শ্রীমতী তাতিয়া বেগমের বিরাট উদ্যানে কবির সম্বর্ধনা। ২রা ডিসেম্বর সরোজিনী নাইডুর নেতৃত্বে কাওয়াসজী জাহাঙ্গীর হলে কবির ‘দি প্রাইস অফ ফ্রিডম’ সম্বন্ধে বক্তৃতা।

রবীন্দ্রনাথ ও কংগ্রেস

রবীন্দ্রনাথের জন্ম ১৮৬১ সালে, কংগ্রেসের ১৮৮৫ সাল। রবীন্দ্রনাথ কংগ্রেসের চেয়ে ২৪ বছরের বড়, তখন তিনি নব-যুবক। তখনকার দিনের কংগ্রেস এবং গান্ধী রচিত সংবিধান কংগ্রেসে প্রচলিত হওয়ার পরের কংগ্রেস কার্যতঃ ভিন্ন প্রতিষ্ঠান। তখন কংগ্রেসের অধিবেশন বছরে একবার কয়েক দিনের জন্য অনুষ্ঠিত হতো, কতগুলি প্রস্তাব পাস ক’রে কর্তব্য সমাধান করতো। সে-সব প্রস্তাবের উদ্দেশ্য সরকারের কানে পৌঁছে দেওয়া। অর্থাৎ তখন কংগ্রেস ছিল পরমুখী, আত্মমুখী নয়। দেশের সাধারণ লোক তার লক্ষ্য ছিল না। তখন কারো আনুষ্ঠানিকভাবে কংগ্রেসের সদস্য হওয়ার প্রয়োজন হতো না। মুষ্টিমেয় শিক্ষিত লোকের প্রতিষ্ঠান ছিল কংগ্রেস। কিন্তু আনুষ্ঠানিক-ভাবে কংগ্রেসের সদস্য না হলেও দেশের কল্যাণকামী ব্যক্তিমাত্রেই কংগ্রেসকে আপন প্রতিষ্ঠান বলে মনে করতো। বঙ্কিমচন্দ্র “আমাদের কংগ্রেস” বলে উল্লেখ করেছেন। আরও দুটি গুরুতর কথা তিনি বলেছেন। কতক কথা সরকারের কানে পৌঁছে দেওয়া আবশ্যক, কংগ্রেস সেই কাজ করছে—আরও বলেছেন যে কংগ্রেস একসূত্রে সমস্ত দেশকে এক করবার চেষ্টা করছে। প্রথমে সরকার কংগ্রেসের পৃষ্ঠপোষক ছিল—কিন্তু পরে যখন সরকার বুঝলো যে কংগ্রেস মুখতঃ দেশের (অর্থাৎ মুষ্টিমেয় শিক্ষিত লোকের) মুখপাত্র হয়েও তার গঠন ও উদ্দেশ্য অতিশয় বিপদের স্থল, কংগ্রেসের হস্তক্ষেপে নানা স্বার্থে

বিভক্ত দেশ তলে তলে- এক হয়ে উঠবার প্রবণতা দেখাচ্ছে তখন কংগ্রেস সম্বন্ধে সরকারের মত বদলাতে শুরু করলো। রবীন্দ্রনাথ রচিত 'রাজটীকা' গল্পে দেখানো হয়েছে অন্তঃপুরিকারা অবধি কংগ্রেসের অনুরাগী। আর 'মেঘ ও রৌদ্র' নামক গল্পে কিভাবে কংগ্রেসওয়ালারা সরকারের বিষ নজরে পড়েছে তা বর্ণিত হয়েছে। তৎকালীন কংগ্রেসের "আবেদন ও নিবেদনের" নীতিকে যাঁরা সমর্থন করতেন না তাঁরাও যে কংগ্রেসের অনুরাগী ছিলেন তার কারণ যাকে আমরা কংগ্রেসের গৌণ উদ্দেশ্য বলেছি, সমস্ত দেশকে একভাবে অনুপ্রাণিত করবার চেষ্টা। রবীন্দ্রনাথ প্রধানতঃ এই কারণেই কংগ্রেসের অনুরাগী ছিলেন।

এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক মতামত বিশ্লেষণ কিংবা কংগ্রেসের ইতিহাস বর্ণনা নয়। তৎকালীন ও পরবর্তী কংগ্রেসের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মাঝে মাঝে যে যোগাযোগ হয়েছে তারই খসড়া দিতে চেষ্টা করছি। আর অধিক অগ্রসর হওয়ার আগে রবীন্দ্রনাথের মানসিকতা সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলা আবশ্যক। রবীন্দ্রনাথ রাজ-নীতিতে না নরমপন্থী না গরমপন্থী, তিনি না রক্ষণশীল না বিপ্লবী, বস্তুতঃ তিনি আদৌ রাজনীতিক নন, তিনি কবি। একাধিকবার একাধিক প্রসঙ্গে ব্যক্ত করেছেন যে তাঁর একমাত্র পরিচয় তিনি কবি। এ উক্তি বিনয় বা দায়িত্ব এড়ানো নয়। তাঁর মনের চরিত্রের উপরে কংগ্রেস যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে—তাই তিনি প্রকাশ করেছেন, সে-সব মন্তব্য কখনো কংগ্রেসের অনুকূলে গিয়েছে, কখনো প্রতিকূলে। কিন্তু কদাপি তিনি কংগ্রেস বিরোধী ছিলেন না। মন্ত্রী অভিষেক প্রবন্ধ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন যে "কংগ্রেসের বিরোধী পক্ষে যোগ দিতে পারিব না।" পরবর্তীকালে কংগ্রেসের অসহযোগ ও চরখা নীতির ঘোরতর বিরোধী ছিলেন—কিন্তু সে বিরোধ কংগ্রেস বিরোধিতা নয়। গান্ধীজী তাঁকে "দি গ্রেট সেন্টিনেল" আখ্যা দিয়েছেন—বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথ কংগ্রেসের বাইরে থেকেই প্রহরীর কাজ ক'রে কংগ্রেসের

সহায়তা ক'রে গিয়েছেন। সাধারণভাবে রাজনীতি তথা কংগ্রেস সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্যগুলিকে কবি-মনের প্রতিক্রিয়ারূপে গ্রহণ করলেই তাঁর প্রতি সুবিচার করা হবে। কারণ নানা বিষয়ে তিনি যে মাঝে মাঝে ভুল মত প্রকাশ করেছেন তার মূলে আছে কবি-মনের লীলা।

আগে বলেছি যে তখনকার দিনে আনুষ্ঠানিকভাবে কংগ্রেসের সদস্য হওয়ার প্রয়োজন ছিল না, দেশের কল্যাণকামী ব্যক্তিমাত্রেই ছিলেন কংগ্রেসের সদস্য। অর্থাৎ কংগ্রেস তখনো পার্টি হয়ে ওঠে নি —ছিল একটা প্ল্যাট্‌ফর্ম। এ অবস্থা দীর্ঘকাল ছিল—এখনো তার রেশ কাটে নি। কংগ্রেসের দ্বিতীয় অনুষ্ঠান হয় কলকাতায়—সে ১৮৮৬ সালের কথা। এই সভাতে তিনি "আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে" গানটি করেন, শোনা যায় এই উদ্দেশ্যেই নাকি গানটি রচিত। আবার ১৮৯৭ সালে যখন কলকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন বসে তখন তিনি বন্দে মাতরম্ সঙ্গীতের প্রথমাংশে সুর যোজনা ক'রে গেয়েছিলেন। কংগ্রেসের প্রতি আন্তরিক আকর্ষণ ছাড়াও একটা বাহ্যিক কারণ ছিল—তাঁর এক ভগ্নীপতি কংগ্রেসের সেক্রেটারী ছিলেন, দেখা যাচ্ছে যে কংগ্রেসের সূত্র তাঁর পরিবারের মধ্যেও প্রবেশ করেছিল।

গান ও আশীর্বচন পাঠ (১৯১৭ সালের কংগ্রেসে) ছাড়া কংগ্রেসে কখনো তিনি বক্তৃতাদি করেছেন বলে জানা যায় না। তবে কংগ্রেসের শাখারূপে বছর বছর যে যে প্রাদেশিক কনফারেন্স হতো তাতে তাঁর সহায়তা উল্লেখযোগ্য। ১৮৯৭ সালে নাটোরে যে প্রাদেশিক কনফারেন্স হয় তার সভাপতি ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর লিখিত ইংরাজি অভিভাষণের বাংলা অনুবাদ তিনি মুখে মুখে ক'রে শোনান। এই প্রথম প্রাদেশিক কনফারেন্সে বাংলা ভাষা উচ্চারিত হল। তার পরে ১৯০৮ সালে পাবনা শহরে প্রাদেশিক কনফারেন্স বসে। তার আগেই গুজরাটের অন্তর্গত সুরাট শহরে নরমপন্থী ও গরমপন্থীতে অপ্রীতিকর কাণ্ড হয়ে কংগ্রেসের অধিবেশন ভেঙে

যাওয়ায় রবীন্দ্রনাথ আন্তরিক দুঃখিত হয়েছিলেন। সে ঢেউ বাংলা-দেশে এসে পৌঁছানোর ফলে নিরপেক্ষ সভাপতি পাওয়া দুষ্কর হওয়ায় মধ্যস্থরূপে রবীন্দ্রনাথ সভাপতি নির্বাচিত হন। এই উদ্দেশ্যে "স্বদেশী সমাজ" নামে প্রসিদ্ধ প্রবন্ধ তিনি পাঠ করেন। এই প্রবন্ধে নরমপন্থী, গরমপন্থী কেউ খুশি হল না। মধ্যস্থ সর্বদা বিপন্ন। তাঁদের খুশি না হওয়ার কারণ এখন সহজবোধ্য। তখন তেমন সহজবোধ্য ছিল না। রবীন্দ্রনাথের ভরসা রাষ্ট্রের চেয়ে সমাজের উপরে বেশি, তখনকার কালে রাজনৈতিক চিন্তার মধ্যে সমাজের স্থান ছিল না। গান্ধী আবির্ভাবের আগে পর্যন্ত কংগ্রেস সমাজ সম্বন্ধে উদাসীন ছিল। রবীন্দ্রনাথের গান্ধী-অনুরাগের প্রধান কারণ, তাঁর চরিত্র-মাহাত্ম্য ছাড়াও—এই যে গান্ধী-রাজনীতি সর্বব্যাপক, তার মধ্যে রাষ্ট্র, সমাজ, শিক্ষা, অর্থনীতি প্রভৃতি সমস্তর স্থান আছে। ১৯০৮ সালের অনুরূপ কাণ্ড আর একবার ঘটলো ১৯১৭ সালে। সেবারে কলকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন। গরমপন্থীরা চান অন্তরীনাবদ্ধ শ্রীমতী এ্যানি বেশান্তকে সভাপতিরূপে, নরমপন্থীরা রাজি নন। তখন আবার রবীন্দ্রনাথের উপরে মধ্যস্থতার ভার পড়লো অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি পদ গ্রহণের উদ্দেশ্যে। কিন্তু সুখের বিষয় দুইজনে আপোস হয়ে যাওয়ায় রবীন্দ্রনাথকে আর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিত্ব করতে হল না। এই অধিবেশনে তিনি 'ইণ্ডিয়াজ্ প্রেয়ার' নামে কয়েকটি ইংরাজি কবিতার অনুবাদ পাঠ করেন—আর গীত হয় এই উদ্দেশ্যে লিখিত "দেশ দেশ নন্দিত করি" সঙ্গীতটি।

অতঃপর কংগ্রেসের ইতিহাস হয়ে দাঁড়ালো গান্ধী রাজনীতির ইতিহাস। এবারে সেই কথা। তবে তার আগে স্মরণ করিয়ে দেওয়া কর্তব্য যে গান্ধী-রবীন্দ্রনাথে অনেক গুরুতর বিষয়ে মতভেদ থাকা সত্ত্বেও এই দুই মহাপুরুষের মধ্যে যে মনান্তর ঘটে নি—তা এই দুর্ভাগ্য দেশের মস্ত একটা সৌভাগ্য।

অসহযোগ আন্দোলনের প্রধান দুটি সূত্র তদানীন্তন ভারত

সরকারের সঙ্গে অসহযোগিতা আর চরখা কাটা। দুঃখের বিষয় এ-দুটিকেই রবীন্দ্রনাথ ভুল বুঝলেন। তিনি তখন ইউরোপে—বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার আদর্শ প্রচার করছেন। তিনি ভাবলেন যখন তিনি আন্তর্জাতিক সহযোগিতার আদর্শ প্রচার করছেন—তখন কংগ্রেসের অসহযোগিতা প্রচার তাঁর আদর্শ সম্বন্ধে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি করবে। গান্ধী বারে বারে বুঝিয়েছেন যে অসহযোগিতা পাশ্চাত্যের বা তার জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে নয়—ভারত সরকারের নীতির সঙ্গে। রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন বলে মনে হয় না। না বুঝবার একটি কারণ তার ভুল ব্যাখ্যা। চরখা সম্বন্ধেও তিনি ভুল বুঝলেন। বললেন, ত্রিশ কোটি লোককে দিয়ে চব্বিশ ঘণ্টা চরখা কাটালে মানুষের বিচিত্র শক্তি বিকাশের পথে বাধা সৃষ্টি করা হয় বলে তাঁর বিশ্বাস। কিন্তু গান্ধী তো চব্বিশ ঘণ্টা চরখা কাটতে বলেন নি, বুদ্ধিজীবীরা দিনের মধ্যে আধ ঘণ্টা চরখা কাটলেই তিনি খুশি। তাছাড়া তিনি কর্মযজ্ঞে ত্রিশ কোটি লোককে ডাক দিয়েছেন, ত্রিশ কোটি লোকের হাতে তুলে দেবার মতো একমাত্র অস্ত্র চরখা। এতে দেশময় একাত্মতা সৃষ্টি হবে বলে তাঁর ধারণা। আর দেশে বহু কোটি নর-নারীর একখানি মাত্র পরিধের ধুতি বা শাড়ী, যাদের দৈনিক রোজগার গড়ে তিন আনা থেকে ছ' পয়সা তাদের পক্ষে দু' আনার সুতো কাটার মূল্য গান্ধী যেমন বুঝেছিলেন এমন আর কে! চরখা নৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে বিচার করা চলে। রবীন্দ্রনাথ এর কোনটাই স্বীকার করলেন না। বস্তুতঃ তিনি অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে অসহযোগ করলেন। গান্ধী অনেক সময়ে ভুল করেছেন, তবে তা তাঁর অহিংস রণ-নীতির ট্যাক্‌টিক্‌স-এ, স্ট্র্যাটেজি-তে নয়। সামগ্রিক সংগ্রামের পথে তিনি দশ সালা ধাপ দেখে এগিয়েছেন, ১৯২০-এ অসহযোগ আন্দোলন, ১৯৩০-এ আইন অমান্য আন্দোলন, ১৯৪০-এ যুদ্ধ বিরোধী আন্দোলন। তিনি কখনো এগিয়েছেন, কখনো পিছিয়েছেন, কখনো সময় বুঝে সন্ধি করেছেন—

কিন্তু চরম লক্ষ্য সর্বদা অব্যাহত ছিল—যার পরিণাম ভারত ছাড়ো আন্দোলন এবং বৃটিশ সরকারের ক্ষমতা হস্তান্তর। অবশ্য শেষ দৃশ্যটি দেখবার সুযোগ রবীন্দ্রনাথের ঘটে নি, ১৯৪১ সালে তাঁর মৃত্যু ঘটে।

১৯৩২ সালে গান্ধী আমরণ অনশন ব্রত গ্রহণ করলেন—হিন্দু সমাজে ভেদ ঘটাবার চেষ্টার প্রতিবাদে। উপবাস আরম্ভ করবার আগে রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ যাচ্ঞা করলেন গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ পুণা পর্যন্ত ছুটে গেলেন। এখন তিনি পুরোপুরি কংগ্রেসের সমর্থক। আর কংগ্রেসের প্রতিনিধিরূপেই গান্ধীর উপবাস।

১৯৩৯ সালে 'কংগ্রেস' নামে এক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য বোধ করি কংগ্রেস সম্পর্কে তাঁর শেষ উক্তি। তাঁর ধারণা এক হাতে অতিরিক্ত ক্ষমতা পুঞ্জীভূত হওয়ার ফলে কংগ্রেসে দুর্বলতা দেখা দিয়েছে। মহাত্মাজীর মহাত্ম্যের প্রতি আস্থা প্রকাশ ক'রেও—তিনি এই ক্ষমতা লোলুপতার নিন্দা করলেন। তখন রবীন্দ্রনাথ অসুস্থ, তাছাড়া ভুল বোঝাবার লোকের অভাব ছিল না তার আশেপাশে। তবে তিনি যতই প্রতিবাদ করুন না কেন—কংগ্রেস সম্বন্ধে তাঁর চরম ধারণা এই যে 'আমি কংগ্রেসের বিরোধী পক্ষে যোগ দিতে পারিব না।"

আগেই বলেছি যে এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধ রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক মতামত বিশ্লেষণ নয়, কিংবা কংগ্রেসের ইতিহাস নয়—এমনকি এই প্রচেষ্টা গান্ধী-রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধ বিচারও নয—এ হচ্ছে কংগ্রেস সম্বন্ধে মাঝে মাঝে তাঁর মনে যে-সব প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে তারই সংক্ষিপ্ত প্রকাশ। গান্ধী মন্তব্য করেছেন যে বাইরের অমিল সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর মৌলিক অমিল নেই। কংগ্রেস সম্বন্ধে তথা গান্ধী সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথেরও এই মনোভাব। কংগ্রেসের কর্মপন্থাকে সব সময়ে তিনি সমর্থন করতে পারেন নি সত্য কিন্তু তার কর্মপন্থায় তাঁর প্রগাঢ় আস্থা ছিল।

মধুসূদন ও দেশাত্মবোধ

১৮৫৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে মধুসূদন অনেকদিন পরে মাদ্রাজ থেকে দেশে ফিরে এলেন। তারপরে প্রায় এক বৎসরের মাথায় দেখা দিল সিপাহী বিদ্রোহ। যদিচ বিদ্রোহের আসল রূপ প্রকট হল পশ্চিমোত্তর ভারতে তবু তার প্রথম গোটা দুই স্ফুলিঙ্গ জ্বলে উঠেছিল হাতের কাছে বহরমপুরে ও ব্যারাকপুরে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে মধুসূদনের চিঠিপত্রে এই স্ফুলিঙ্গের বা দাবানলের কোন উল্লেখ নাই। মাইকেলের চোখ কান জাগ্রত ছিল তবু না ধরা পড়লো তাতে স্ফুলিঙ্গের চমক বা দাবানলের গর্জন। পরবর্তীকাল সিপাহী বিদ্রোহের মধ্যে যে দেশাত্মবোধের সূচনা আবিষ্কার করেছে মধুসূদন কি সে বিষয়ে অচেতন ছিলেন? কিংবা মধুসূদনের কাল ঐ ঘটনার মধ্যে তেমন কোন অর্থ দেখতে পায় নি বলেই ব্যাপারটা তাঁর মনের উপর দিয়ে ফস্কে চলে গিয়েছে? শেষেরটাই সত্য বলে মনে হয়। শুধু মধুসূদন কেন সেকালের অনেক মনীষী যাদের আমরা দেশাত্মবোধের উৎস-স্বরূপ মনে করি সিপাহী বিদ্রোহকে একটা অবাঞ্ছিত হাঙ্গামার বেশী মনে করতে পারেন নি। এ থেকে প্রমাণ হয় যে একদিকে যেমন কালক্রমে দেশাত্মবোধে বিবর্তন ঘটেছে তেমনি আর একদিকে পরবর্তীকাল নিজ মনোভাব প্রক্ষেপ করেছে পূর্ববর্তীকালের উপরে—একেই বলা হয়ে থাকে Reading History backward! মধুসূদনের দেশাত্মবোধের আলোচনা উপলক্ষ্যে আমাদের সমাজে বিবর্তন সম্বন্ধে আলোচনা করা যেতে পারে।

॥ ২ ॥

মানুষের ইতিহাস কতকগুলি Irony-র সমষ্টি। এই সব Irony-র লীলা অনুসরণ ও পর্যবেক্ষণই ঐতিহাসিকের প্রকৃত কর্তব্য। ভারতীয় ইতিহাসের ঊনবিংশ শতকের প্রধান Ironyটি বড়

শিক্ষাপ্রদ। একদিকে জন কোম্পানী এই বৃহৎ দেশকে ক্রমেই কঠিনতর শাসন পাশে আবদ্ধ করতে চেষ্টা করছে আর একদিকে কয়েকজন জনবুল এমন সব কার্যের সূত্রপাত করছে যার দূরপ্রসারী ফলে শেষ পর্যন্ত সেই শাসন পর্যন্ত সেই শাসন পাশ আলগা হয়ে পড়বে—মেকলের ইংরাজি শিক্ষা সমর্থন ও কয়েকজন মহাপ্রাণ ইংরেজ কর্তৃক ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার সমর্থন ও উৎসাহদান। আরও একটি Irony, এই যুগে বিদেশীর কণ্ঠেই ভারতভূমি সর্বপ্রথম মাতৃ সম্বোধন শুনলো—যদিচ ডিরোজিও জনবুল ছিল না। ডিরোজিওর মৃত্যু ১৮৩১ সালে। কাজেই তার আগেই কোন সময়ে ভারতকে মাতৃ সম্বোধনে স্বদেশ আমার কবিতাটি লিখিত হয়েছিল, হিন্দু মেলায় গীত "জাতীয় ভাবোদ্দীপক" সঙ্গীতগুলি রচনার অনেক আগে বন্দে মাতরম্ সঙ্গীত রচনার আরও অনেক আগে। জন্মে, বংশে, ধর্মে, ভাষায় যার সঙ্গে কোন সংস্রব নাই এ দেশের, তবু কিনা এ দেশ হল তার কাছে স্বদেশ। তখন এদেশের লোকে হয় এ বিষয়ে অচেতন ছিল, নয় ইংলণ্ডের গৌরবে এমনি অভিভূত ছিল যে স্বদেশ সম্বন্ধে গৌরববোধ করতে শুরু করে নি। ডিরোজিওর কাব্যে যে দেশাত্মবোধ দেখতে পাই মধুসূদনের কাব্যে দেশাত্মবোধ যা থেকে ভিন্ন নয় এ দুই আবার সম্পূর্ণ ভিন্ন উনবিংশ শতকের শেষে বিশেষ করে বিংশ শতকের গোড়াতে দেশাত্মবোধের যে রূপ দেখতে পাই তা থেকে; প্রশ্ন হচ্ছে, এই প্রভেদটা ঘটলো কখন? ঐ সিপাহী বিদ্রোহের ফলে বলেই মনে হয়। ঐ ঘটনাটাই দেশাত্মবোধ বিবর্তনের প্রধান কারণ। আগে বলেছি যে সিপাহী বিদ্রোহ দেশাত্মবোধক সংগ্রাম নয়, তবে তার ফলে দেশের শাসন-ব্যবস্থায়, শাসক সম্প্রদায়ের দৃষ্টিতে এবং শাসক ও শাসিতের সম্বন্ধে এমন গূঢ়গর্ভ পরিবর্তন ঘটেছে যার ফলে ডিরোজিওর 'স্বদেশ আমার' দেশাত্মবোধ "দেখে রক্তারক্তি বাড়বে শক্তি"—দেশাত্মবোধে পরিণত হয়েছে। ডিরোজিও ও মাইকেলের দেশাত্মবোধে জাতিবৈরের স্থান

নাই। দেশের প্রাচীন গৌরবে গর্ববোধ আছে, বর্তমানহীনতায় বেদনাবোধ আছে, কিন্তু ইংরেজ শাসন বা ইংরেজ শাসক বা ইংরাজ জাত সম্বন্ধে জাতিবৈরের ভাব নাই। থাকা সম্ভবও নয়। কারণ ডিরোজিও, মাইকেল ও ইয়ং বেঙ্গল সম্প্রদায় মনে মনে ইংরেজ ছিল।

॥ ৩ ॥

মধুসূদন ইংরেজের ধর্ম, আচরণ, পরিচ্ছদ ও লোকব্যবহার গ্রহণ করেছিলেন। তিনি সাহেব পাড়ায় বাস করতেন, বলতেন বামুন পাড়ায় থাকি, গাঁয়ের মধ্যে বামুন পাড়া শ্রেষ্ঠ শহরের মধ্যে সাহেব পাড়া। যখন তিনি মারাত্মক অন্তিম ব্যাধিতে ভুগছিলেন কোন ভক্ত আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসার সুব্যবস্থা করে দিতে চেয়েছিল, তিনি রাজি হন নি। সাহেবরা হাসবে যে! প্রথম যৌবন থেকেই ইংলণ্ড যাওয়ার উৎকট আশা পোষণ করতেন তিনি। ইংলণ্ড যাওয়ার জন্যেই সাহিত্য জীবন বিসর্জন দিলেন, বিষয় আশয়ও। তিনি মাকে বলেছিলেন, যাই বলো মা, ইংরেজের মেয়ের কাছে বাঙালীর মেয়ে লাগে না। বিয়ে করলেন প্রথমবারে ইংরেজের মেয়ে, দ্বিতীয়বারে ফরাসী মেয়ে।

তিনি কাব্য লিখলেন ইংরাজিতে: ইংরাজিতে স্বপ্ন দেখতে হবে এই ছিল তাঁর আকাঙ্ক্ষা; আকাঙ্ক্ষা প্রায় সফল হয়েছিল, 'পৃথিবী' বানান লিখেছিলেন 'প্রথিবী'। কেবল গায়ের বর্ণ সম্বন্ধে তাঁর অভিমান করবার উপায় ছিল না। এহেন লোকের দেশাত্মবোধ জাতিবৈর হওয়া সম্ভব নয়, হয়ও নি। তবে তাই বলে মধুসূদনের মনে দেশাত্মবোধ ছিল না, বা তার গভীরতা কম ছিল এমন মনে করা উচিত হবে না। মধুসূদনের দেশাত্মবোধ অকৃত্রিম ও গভীর।*

* তাই বলে রাম রাবণের লড়াইয়ের মধ্যে ইংরাজ ও ভারতবাসীর ভাবী যুদ্ধের আভাস দর্শন কিংবা সুন্দ উপসুন্দের লড়াইয়ের মধ্যে গৃহযুদ্ধ বা শ্রেণী সংগ্রামের অগ্রিম চিত্র দর্শন উচিত হবে না। এমন ব্যাখ্যা কেউ কেউ করে থাকেন বলেই মনে করিয়ে দিতে হল।

মধুসূদনের দেশাত্মবোধ সম্বন্ধে মনে রাখবার মতো প্রথম বিষয় এই যে দেশ বলতে কখনো তিনি ভারত বুঝেছেন কখনো বঙ্গদেশ।

শুনগো ভারত ভূমি,
কত নিদ্রা যাবে তুমি,
আর নিদ্রা উচিত না হয়।
উঠ, ত্যাজ ঘুমঘোর,
হইল, হইল ভোর
দিনকর প্রাচীতে উদয়।
কোথা বাল্মীকি ব্যাস,
কোথা তব কালিদাস,
কোথা ভবভূতি মহোদয়।

আবার—

রেখো মা দাসেরে মনে
এ মিনতি করি পদে।
কিন্তু কোন্ গুণ আছে,
যাচিব যে তব কাছে,
হেন অমরতা আমি
কহগো, শ্যামা জন্মদে।

একটি ভারতভূমির প্রতি অপরটি বঙ্গভূমির প্রতি। শুধু তাই নয়। প্রথমটির মধ্যেই দ্বিতীয়টি বর্তমান।

অলীক কুনাট্য রঙ্গে,
মজে লোক রাঢ়ে বঙ্গে,
নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়।

মধুসূদনের দেশ ভারতভূমি কাজেই তার অংশরূপে বঙ্গভূমি। অবশ্য বঙ্গভূমির প্রতি কবিতাটির শিরোদেশে তিনি **my native land, good night'** বায়রনের এই উক্তি উদ্ধার না করে পারেন নি। বায়রন দেশত্যাগের সময়ে লিখেছিলেন। তিনিই বা কি কম,

দেশত্যাগের সময়ে তিনিই বা কেন না লিখবেন। এ নিঃসন্দেহ স্নবারি। ইয়ং বেঙ্গলের স্নবারি তখনো মজ্জাগত হয় নি, মধুসূদনের স্নবারি শিরোনামাতেই নিবদ্ধ কবিতাটির বেদনার মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে তাকে লঘু করে ফেলতে পারে নি।

মধুসূদনের দেশাত্মবোধ সম্বন্ধে মনে রাখবার মতো দ্বিতীয় বিষয় পাঠকের মনের উপরে একটি সুকুমার আবেদন। দেশের নৈসর্গিক সৌন্দর্য, পৌরাণিক মাহাত্ম্য, ঐতিহাসিক গৌরব এবং সর্বোপরি দেশের মহাকবিগণ সম্বন্ধে একটি সচেতন অভিমান।* পরাধীনতার গ্লানির কথা নাই। হয়তো তখনো ইংরাজ শাসনের উপকারের দিকটাই স্পষ্টতর ছিল চোখের সামনে, অপকারের দিকটা তখনো হয়তো তেমন প্রকট হয়ে 'ওঠে নি, কিংবা নবাবী শাসনের বিষফলের স্মৃতি তখনো হয়তো স্মৃতিশ্রুতির মধ্যেই ছিল। আর তখনো ইংরাজ ও ভারতীয়ের সম্বন্ধে জাতিবৈরের রূপ গ্রহণ করে নাই—যদিচ সামান্য কিছুকাল পরেই তার সূচনা হয়েছিল। অক্ষয় সরকার মেঘনাদ বধ কাব্যে দেখতে পেয়েছেন। হেমচন্দ্রের ভারত সঙ্গীত জাতিবৈরের তূর্য নিনাদ। এ বস্তু মধুসূদনের কাব্যে নাই। কিন্তু ঠিক সেইজন্যেই মধুসূদনের দেশাত্মবোধের মূল্য বেশি।

জাতিবৈর বা সাময়িক উত্তেজনার উপরে যে দেশাত্মবোধের প্রতিষ্ঠা তার ভিত্তি বড় শিথিল। ´বৈরী জাতি বন্ধু হয় এখন যেমন ইংরাজ ভারতবাসীর বন্ধু, সাময়িক উত্তেজনা যথাসময়ে শান্ত হয়ে আসে, তখন দেশাত্মবোধক রচনার কী মূল্য দাঁড়াবে? বন্দে মাতরম্ সঙ্গীতের মূল্য কখনো কমবে না, দেশের ঐতিহ্য ও আত্মশক্তির উপরে তার প্রতিষ্ঠা। 'স্বদেশী যুগের' কত গান সাময়িক কর্তব্য সাধন করে আজ বিস্মৃত। মধুসূদনের কাব্যে জাতিবৈর নেই, ইংরেজ তখনো বৈরী হয়ে দেখা দেয় নি। মধুসূদনের কাব্যে সাময়িক উত্তেজনা নেই,

* চতুর্দশপদী কবিতাগুলি দ্রষ্টব্য।

কারণ ইংরেজ শাসকের আচরণে সময়টা তখনো তপ্ত হয়ে ওঠে নি। কিন্তু এ দুয়ের বদলে যা আছে, বিশেষভাবে তাঁর চতুর্দশপদী কবিতা-বলীতে তা অকৃত্রিম দেশাত্মবোধজনিত। এ দেশের প্রাচীন কবি ও কাব্য, নৈসর্গিক ও মনুষ্যরচিত সৌন্দর্য, সংস্কৃত ও বঙ্গভাষার মাহাত্ম্য, এ দেশের পাল পার্বণ, এ দেশের দেবদেবী, (মনে রাখতে হবে ধর্মে তিনি খৃষ্টান ছিলেন, সামাজিক আচরণে ইংরেজ), সর্বজনমান্য ব্যক্তি প্রভৃতি তাঁর দেশাত্মবোধের ভিত্তি। এ ভিত্তি উদার ও অটল। উদার বলেই এর মধ্যে একাধারে ভারত ও বঙ্গের স্থান আছে—

"জ্যোতির্ময় কর বঙ্গ—ভারত রতনে!" আর অটল বলেই একাধারে বাল্মীকি, ব্যাস, কালিদাস প্রভৃতি প্রাচীন কবিগণের সঙ্গে ভারতচন্দ্র, মুকুন্দরাম, ঈশ্বর গুপ্ত প্রভৃতি অর্বাচীনকালের কবিগণের স্থান হয়েছে। মধুসূদনের দেশাত্মবোধ শূলের মতো সঙ্কীর্ণ বা স্তম্ভের মতো উত্তুঙ্গ নয়—ভূতলের মতো সমতল ও নিরাভরণ। আর রাজপুত্র অশোকের মতো সেখানে উপবিষ্ট বলেই সম্রাটজনোচিত সুনিশ্চিত তাঁর ভবিষ্যৎ।

মধুসূদনের কয়েকটি সনেট

মাইকেল মধুসূদন প্রধানত এপিক বা আখ্যায়িকা কাব্যের কবি। এইসব কাব্যে কবির আত্মপ্রকাশের স্থান স্বভাবতই সঙ্কীর্ণ। সঙ্কীর্ণ তবে একেবারে নীরন্ধ্র নয়। এমন আখ্যায়িকা কাব্য কোন কবির কলম থেকে নির্গত হয় নি যাতে কবির আত্মপরিচয় না আছে তবে তা গবেষণা সাপেক্ষ। মেঘনাদ বধ কাব্যেও মধুসূদনের ব্যক্তিগত কথা আছে, তবে তা সামান্য ও প্রচ্ছন্ন। কেবল চতুর্দশপদী কবিতা-গুলোতে তাঁর অনায়াস আত্মপ্রকাশ অবিরল। সেই সঙ্গে আত্মবিলাপ এবং বঙ্গভূমির প্রতি কবিতা দুটিও ধরা উচিত। এসব কবিতা নিয়ে অল্পবিস্তর আলোচনা হয়েছে কাজেই সে প্রসঙ্গের এখানে পুনরাবৃত্তি করতে চাই না।

আমার আজকে আলোচনার বিষয় মধুসূদনের কয়েকটি সনেট। এ সনেটগুলিও সমালোচকদের দৃষ্টি আরোপ করেছে তবু আরো কিছু বলা যেতে পারে।*

পাদটীকা দেখলে বুঝতে পারা যাবে কতকগুলি কবিতায় নাম ও ক্রমিক সংখ্যা দুইই আছে, কতকগুলি কবিতার নাম নাই শুধু ক্রমিক সংখ্যা। অনেক কবিতায় নামের বদলে কয়েকটি তারকা চিহ্ন মাত্র আছে। নাম না থাকলেই কবিতায় যে কিছু গোপনীয়তা আছে এমন মনে করা উচিত হবে না, কারণ গোপনীয় কিছু নেই এমন কবিতাও নামহীন। তবে পাদটীকায় যে সব কবিতার উল্লেখ করলাম তাদের মধ্যে এমন কিছু গোপনীয় আছে কবি যা স্পষ্ট করে বলতে চান নি। আর এই গোপনীয় বিষয়টি কোন একটি নারীর দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করছে। একটি কি একাধিক নিশ্চয় করে বলতে পারি না।

এবারে এমন একটি কবিতা নিয়ে আলোচনা করা যাক, যার উদ্দিষ্ট কোন নারী নয়। তবে কবিতাটি তৎকালীন বাংলা কাব্যের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত বলে সমধিক প্রসিদ্ধ। কোন এক পুস্তকের ভূমিকা পড়িয়া (৯৬) কবিতাটি লিখিত। কোন্ পুস্তক? পণ্ডিতদের জিজ্ঞাসা করতে গিয়ে দেখলাম পণ্ডিতে পণ্ডিতে মতভেদ। তবে স্পষ্টই বুঝতে পারা যায় বাংলাভাষায় দীনতা প্রকাশ করে এমন কোন পুস্তক বটে। কি সেই পুস্তকের নাম? কি সেই লেখকের নাম? আমার বিশ্বাস কবিতাটির ত্রয়োদশ ছত্র এই রহস্যের চাবিকাঠি।

'দূর করে নন্দ ঘোষে, ভজ শ্যামে, রাধে,
ও বেটা নিকটে এলে ঢাকো মুখ মানে।'

---

* কবিতাগুলির নাম ও ক্রমিক সংখ্যা, যেখানে নাম নাই, শুধু ক্রমিক সংখ্যার উল্লেখ করছি। মেঘদূত (১০), বউ কথাকও (১২), পরিচয় (১৩), (১৪) (৫৮), কোন এক পুস্তকের ভূমিকা পড়িয়া (৭৬), (১০০)।

এখানে ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ দুটি ছত্রই উদ্ধৃত হলো। ত্রয়োদশ ছত্রে কবি রাধাকে অনুরোধ করছেন তিনি যেন নন্দ ঘোষকে উপেক্ষা করে শ্যামকে ভজনা করেন। নন্দ ঘোষ শ্যাম বা কৃষ্ণের পালক পিতা, তাকে উপেক্ষা বা 'দূর করি' দেবার কোন প্রশ্নই ওঠে না। ব্রজাঙ্গনার কবি এই সাধারণ পৌরাণিক কথাটা জানতেন না এমন মনে করা যায় না। তবে কৃষ্ণ ও নন্দ ঘোষের পৌরাণিক সম্বন্ধ উপেক্ষা করে হঠাৎ তিনি একথা বল্‌তে গেলেন কেন? কবি বেশ জানতেন কিন্তু ইচ্ছা করেই এই সম্বন্ধ ব্যতিক্রমটুকু ঘটিয়েছেন। নতুবা গ্রন্থকারকে টেনে আনা যায় না। স্পষ্টত নাম উল্লেখ করায় সঙ্কট ছিল, Libel হতে পারতো। কাজেই পুরাণের ইঙ্গিতে কথাটা প্রকাশ করেছেন। আমার বিশ্বাস নন্দ ঘোষ শ্যাম ও রাধা এই তিনটি শব্দের মধ্যে রহস্যের চাবিটি লুকিয়ে রেখেছেন। সেকালের লোক অবশ্য বুঝতো, একালের লোকের পক্ষেই রহস্য। কিন্তু এখন যে কবিতাগুলি আলোচনা করতে উদ্যত হয়েছি সেগুলিতে রহস্য অধিকতর ঘনীভূত। চাবিকাঠি বলে কিছু চোখে পড়ছে না, কেবল বন্ধ সুবর্ণ পেটিকার চারদি ক বৃথা ঘুরে মরা। প্রসঙ্গে প্রবেশ করবার আগে কয়েকটি স্থূল কথা মনে করিয়ে দেওয়া আবশ্যক।

দেশে থাকতে তিনি বঙ্গ-ভাষা নামে চতুর্দশপদীটির প্রথম খসড়া লিখেছিলেন, বাকি সব চতুর্দশপদী—যা নামের গ্রন্থে প্রকাশিত, সেগুলি ফ্রান্সের ভার্সাই শহরে বাসকালে লিখিত।

১৮৬২ সালে কবি ইংল্যাণ্ড গমন করেন।

পত্নী ও পুত্র-কন্যাদের এদেশে রেখে যান।

যাদের উপরে টাকা যোগান দেবার ভার ছিল তাদের কর্তব্য-শৈথিল্য হেতু খরচাভাবে ১৮৬৩ সালের ২রা মে পত্নী ও পুত্র-কন্যাগণ ইংল্যাণ্ডে গিয়ে উপস্থিত হন।

ইতিমধ্যে সেখানে ঐ একই কারণে মধুসূদনের অর্থাভাব ঘটেছে, ইংল্যাণ্ডে খরচ বেশী তাই মধুসূদন সপরিবারে ১৮৬৩ সালের

মধ্যভাগে প্যারিসের উপকণ্ঠবর্তী ভার্সাই শহরে চলে আসেন। সেখানে অর্থাভাবে যখন তাঁদের দুর্দশার চরম সেই সময়ে বিদ্যাসাগরের কৃপায় আর্থিক সচ্ছলতা হওয়ায় ফিরে আসেন লণ্ডনে। তারপরে এদেশে ফিরে ১৮৬৬ সালের আগস্ট মাসে কলকাতা থেকে চতুর্দশ-পদী কবিতাবলী প্রকাশিত হয়। এই কটি ঘটনার কঙ্কাল মনে রেখে অগ্রসর হওয়া আবশ্যক।

এবারে 'মেঘদূত' (১০) কবিতাটির আলোচনা করা যাক। কবিতাটির প্রথম আট ছত্র মেঘের প্রতি যক্ষের আবেদন। শেষের ছটি ছত্রে কবির নিজের কথা তাকে আর কিছুতেই যক্ষের কথা বলে চালাবার উপায় নেই।

'তেঁই গো প্রবাসে আজি
এই ভিক্ষা করি
দাসের বারতা লয়ে যাও শীঘ্র গতি
বিরাজে, হে মেঘরাজ,
যথা সে যুবতী।'

এখন প্রশ্ন এই যুবতীটি কে?

ভার্সাই শহরে কবির সঙ্গেই তাঁর পত্নী বাস করছিলেন। কাজেই হেনরিয়েটা হওয়া সম্ভব নয়। অথচ এ যুবতীকে কাল্পনিক বা পৌরাণিক বলে ব্যাখ্যা করাও অসম্ভব। তবে তিনি কে?

১১ সংখ্যক কবিতাটিকে মেঘদূত কবিতার অনুক্রম বলে ব্যাখ্যা করা চলতে পারত, কিন্তু ঠিক তার পরবর্তী হওয়াতে সেরূপ ব্যাখ্যার জোর কমে যায়। (১০) ও (১১) সংখ্যক মিলিয়ে পড়লে মনে করা অসম্ভব নয় যে সেই 'যুবতী' দূর দেশে অবস্থান করছেন। এই যুক্তির মধ্যে যদি কোন সার থাকে তবে রহস্য আরও ঘনীভূত হয়।

'বউকথাকও' (১২) কবিতাটি তন্নামে প্রসিদ্ধ পাখির প্রতি লিখিত। কিন্তু শেষের ছয় ছত্রে আবার গোল বাধে।

সত্য যদি, তবে শুন, দিতেছি যুকতি ;
(শিখাইব শিখেছি যা ঠেকি এ কুদায়ে)
পবনের বেগে যাও যথা এ যুবতী ;

এখানেও কবির নিজের কথা এবং আবার সেই যুবতী। কে তিনি ?

অনেকে বলতে পারেন এ যুবতী আর কেউ নন, তাঁর পত্নী হেনরিয়েটা। এই সিদ্ধান্তে দুটি বাধা। প্রথম, হেনরিয়েটা বাংলা জানতেন না। বাংলা সনেটে প্রকাশিত স্বামীর মনোভাব তিনি কি বুঝবেন, আর অত ছন্দ মিলিয়ে সনেট লিখবারই কি প্রয়োজন। দুটো মুখের কথা বললেই তো হতো। দ্বিতীয়, হঠাৎ পত্নীর সম্বন্ধে এমন বিরহের কবিতা লিখিতে যাবেন কেন ? তাঁকে দেশে ফেলে এসেছিলেন সেই বকেয়া ব্যথা সংশোধনের পূর্বে লিখিত এমন মনে করা হাস্যকর। তাও বা কোন রকমে চালানো যেত কিন্তু পরিচয় নামে (১৩) সংখ্যক কবিতা এক আঘাতে পূর্বোক্ত থিওরি ধসিয়ে দেয়।

কবি নিজের পরিচয় দিচ্ছেন। সনেটটি কৌতূহলী পাঠককে আমার বক্তব্যের সঙ্গে মিলিয়ে পড়তে বলি।

ভারতের মনোরম প্রাকৃতিক বর্ণনা দিয়ে অবশেষে কবি বলছেন,

'সে দেশে জনম মম ; জননী ভারতী ;
তেঁই প্রেমদাস আমি, ওলো বরাঙ্গনে।'

হেনরিয়েটা আদৌ হতে পারে না। তাকে নূতন করে ভারতের বর্ণনা দেওয়া অনাবশ্যক। কাজেই এই বরাঙ্গনা অভারতীয় এবং ভারতবর্ষ সম্বন্ধে পরিচয়হীন। এখন প্রশ্ন দাঁড়ায় পূর্বোক্ত সনেটগুলির যুবতী এই বরাঙ্গনা কি এক না ভিন্ন ? প্রত্যেকটি সনেটের নিচে রচনার তারিখ থাকলে নিশ্চিত হওয়া যেত তৎসত্ত্বেও অনিশ্চিত নই, একই বটে ভিন্ন নয়। কারণ স্বল্পকালের ব্যবধানে লিখিত কবিতায় ঘন ঘন লক্ষ্য পরিবর্তন মানুষের স্বভাব নয়।

(১৪) সংখ্যক কবিতাটি (নামহীন) এই প্রসঙ্গে পঠনীয়।

'কে না জানে কবিকুল প্রেমদাস ভবে,
কুসুমের দাস যথা মারুথ, সুন্দরী,
ভাল যে বাসিব আমি এ বিষয়ে তবে
এ বৃথা সংশয় কেন ?'

পরবর্তী কয়েক ছত্রে অলঙ্কারছলে সুন্দরীর দৈহিক সৌন্দর্যের ব্যাখ্যা। রহস্য ক্রমেই জটিলতর হচ্ছে। এই যুবতী সুন্দরী বরাঙ্গনা কে? কোন ফরাসী মহিলা কি? মধুসূদনের ভার্সাই বাসকালীন বৃত্তান্ত থেকে জানতে পারা যায় যে, তাঁদের দুরবস্থায় দয়াপন্ন হয়ে একজন ফরাসী মহিলা কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করেছিলেন। তিনি-ই কি? আমার হাতে উত্তর নেই, প্রশ্ন তুলতেই পারি।

(৫৮) ও (১০০) সংখ্যক কবিতা দুটির নামের স্থলে তারকা চিহ্নিত। (৫৮) সংখ্যে চারটি তারা, (১০০) সংখ্যে তিনটি। এই সংখ্যার ভেদ ছাপাখানাকৃত হতে পারে, আর কবিকৃত যদি হয় তবে তা বিশেষার্থবহ হওয়া অসম্ভব নয়। যাই হোক (৫৮) সংখ্যক কবিতাটি কৌতূহলী পাঠক পড়লে বুঝতে পারবেন এ রমণী বাস্তব এবং কবির সঙ্গে তার সম্বন্ধ রমণীয়ভাবে ঘনিষ্ঠ—যদিচ বর্ণনায় ভারত-চন্দ্রের প্রভাব আছে তবু তার বাস্তবতা অস্বীকার করা চলে না।

(১০০) সংখ্যক কবিতাটিতে এই পর্যায়ের শেষ। এটিও আগাগোড়া পঠনীয়। মনে হয় ভার্সাই শহর থেকে এবং প্রসঙ্গত সেই রমণীর কাছ থেকে বিদায় উপলক্ষ্যে এটি রচিত। কতকটা অংশ উল্লেখ করছি।

'দূরে কি নিকটে,
যেখানে যখন থাকি, ভজিব তোমারে ;
যেখানে যখন যাই যেখানে যা ঘটে।
প্রেমের প্রতিমা তুমি, আলোক আঁধারে।
অধিষ্ঠান নিত্য তব স্মৃতিসৃষ্ঠ মঠে,
সতত সঙ্গিনী মোর সংসার মাঝারে'

শেষের ছত্রটিকে কেউ কেউ হেনরিয়েটার পক্ষে ব্যাখ্যা করতে পারেন কিন্তু কবিতাটির উদ্ধৃত ও অনুদ্ধৃত ছত্রগুলি পড়লে আর হেনরিয়েটাকে টেনে আনা সম্ভব হয় না।

মোটের উপর আমার ধারণা যে ভার্সাই শহরে এসে কোন বিদেশিনী কুহকিনীর মায়ায় কবি আবদ্ধ হয়েছিলেন আর ইংল্যাণ্ডে ফিরে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই সে মায়াপাশ খুব সম্ভব ছিন্ন হয়েছিল। সেই যে রমণী মধুসূদনের দুরবস্থার দিনে সাহায্য করেছিলেন তিনি হলেও হতে পারেন, অপর কেউ হওয়াও অসম্ভব নয়। তবে তিনি যে হেনরিয়েটা নন এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত। যাই হোক আমার সিদ্ধান্ত আমি পাঠকের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে চাই না। কাজেই এ রহস্যের ভেদের ভার সাহিত্য সমালোচনা শার্লক হোমস্‌দের উপর অর্পণ করা রইলো। আমি নিরীহ ওয়াটসন মাত্র। এখন ইচ্ছে করলে শার্লক হোমসের দল বলতে পারেন,

'Elementary, Watson, Elementary'.

আজ যদি আসতেন

দুপুরবেলায় বিশ্রামান্তে বৈঠকখানায় বসে বঙ্কিমচন্দ্র আলবোলায় তামাক খাচ্ছিলেন, বেলা তখন চারটে। এমন সময়ে তাঁর খাস খানসামা গুপি এসে জানালো কর্তা একজন ভদ্রমহিলা দেখা করতে এসেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের খানসামা, তাই সে মেয়েছেলে না বলে ভদ্রমহিলা বলে। বঙ্কিমচন্দ্র কিঞ্চিৎ বিস্ময়ে ততোধিক বিরক্তি সহকারে বললেন, ভদ্রমহিলা আবার কে এলো? তারপর বললেন, আচ্ছা, যা নিয়ে আয়।

একটি কাঁচা বয়সের মেয়ে ঘরে ঢুকে প্রণাম ক'রে উঠে দাঁড়ালো। তিনি দেখলেন মেয়েটির বয়স কুড়ির কাছে, শ্যামোজ্জ্বল বর্ণ মুখে-চোখে বুদ্ধির ছাপ। সধবা কি বিধবা বুঝতে পারলেন না, পরনে কালোপাড় শাড়ী অথচ মাথায় সিঁদুর নাই, হাতে দুখানি সোনার বালা। কুমারী নিশ্চয় নয়, এত বয়স অবধি কোন মেয়ে অবিবাহিত থাকে না।

কিভাবে পরিচয় জিজ্ঞাস করা যায় ভেবে না পেয়ে বললেন, তোমার নাম কি?

মেয়েটি বলল, আমার নাম বিনোদিনী।

তোমার স্বামী কি করেন?

তিনি অনেককাল গত হয়েছেন। তখন আমি বালিকা।

একটি মোড়া দেখিয়ে দিয়ে তিনি বললেন, বসো।

মেয়েটি বসলে শুধালেন, তা কি মনে করে?

একটি বিষয়ে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করতে এসেছি, আপনার কাছেই জিজ্ঞাসা করছি, কেউ সদুত্তর দিতে পারে নি।

ঈষৎ হেসে তিনি বললেন, অর্থাৎ কারো উত্তর তোমার পছন্দ-মতো হয় নি, এই তো। তা আমার উত্তরই যে পছন্দসই হবে তার নিশ্চয়তা কি?

না হলে অন্যত্র যাবো।

মেয়েটি বেশ সপ্রতিভ।

বেশ, এবার তোমার বিষয়টা কি শুনি।

বিধবা বিবাহ কি সব ক্ষেত্রেই অচল ?

এ প্রশ্ন আমাকে কেন করছ ? কুন্দনন্দিনীর তো দ্বিতীয়বারও বিবাহ হয়েছিল।

কিন্তু সে তো সুখী হয় নি। মানুষ বিবাহ দিতে পারে, বিধবা বিবাহের অনুকূলে আইন পাস করতে পারে। সুখী করা তার হাতে নয়।

শুনেছি আপনি বিধবা বিবাহ আইন সমর্থন করেন নি।

অসমর্থনও করি নি।

মাঝামাঝি ?

হাঁ তাই।

কেন বলবেন কি ?

মেয়েটির প্রশ্নের ধরনে মনে মনে খুশি হয়েছিলেন, নতুবা এত বাদ-প্রতিবাদ অপরিচিতের সঙ্গে করা তাঁর স্বভাব নয়।

ঔপন্যাসিক সমাজ সংস্কারক নয়। যা ঘটে তাই নিয়ে তার কারবার, কী ঘটা উচিত তা তার এলাকার বাইরে।

আপনি তো শুধু ঔপন্যাসিক ছিলেন না, নূতন বিধিবিধান দাতাও ছিলেন।

আমার বিধিবিধান কে মানছে ?

মানবো বলেই তো এসেছি।

বিস্মিত বঙ্কিমচন্দ্র শুধালেন, তুমি এত লেখাপড়া শিখলে কোথায় ?

কিছুদিন মিশনারীদের স্কুলে পড়েছিলাম, কিন্তু লেখাপড়া শিখবার আগেই বিয়ে হয়ে গেল, ইস্কুল ছেড়ে দিতে হল।

ঠিক লেখাপড়ার কথা বলছি না, বলছি তোমার স্বাভাবিক বুদ্ধির কথা।

লজ্জিত হয়ে মেয়েটি বলল, বুদ্ধি যদি থাকে তবে তা স্বভাবের মধ্যেই আছে।

এবারে বঙ্কিমচন্দ্র শুধালেন প্রশ্নটা কার উপকারার্থে?

মেয়েটি আঁচলের খুঁট নাড়তে নাড়তে বলল, আমার।

তিনি এমন স্পষ্টোক্তি আশা করেন নি। বললেন, তুমি আবার বিয়ে করতে চাও?

মেয়েটির নীরবতা প্রশ্নকে সমর্থন করলে।

তা বেশ করো না।

সমাজে সমর্থন পাইনে।

আমি বললেই কি সমাজ সমর্থন করবে?

মনে অন্তত জোর পাবো।

বেশ আমি বলছি তুমি বিয়ে করো। মেয়েছেলের একটা আশ্রয় দরকার।

সেই জন্যই কি রোহিণীর জুটিয়ে দিয়েছিলেন গোবিন্দলালকে?

প্রশ্নের ধাঁচে চমকে উঠে তিনি বললেন, বিয়ে করলে গোবিন্দলালকে সে হয়তো আশ্রয়রূপে পেতো।

তবে বিয়ে দিলেন না কেন? সূর্যমুখী থাকা সত্ত্বেও নগেন্দ্রনাথ বিয়ে করেছিল কুন্দনন্দিনীকে। গোবিন্দলাল কেন বিয়ে করলো না।

হেসে উঠে বঙ্কিমচন্দ্র বললেন, সে কথা গোবিন্দলাল বলতে পারে, আমি বলবো কি ক'রে?

আপনাদের ঔপন্যসিকদের ঐ এক প্যাঁচ, সঙ্কটে পড়লেই প্রশ্ন এড়িয়ে যাওয়া।

আমাদের ঔপন্যাসিকদের! আর কে কে?

রবিবাবুকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম ননীবালার সঙ্গে শচীনের বিয়ে দিলেন না কেন? ঐ প্যাঁচে কেটে বেরিয়ে গেলেন। শরৎবাবুকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে শ্রীকান্তের বিয়ে দিলেন না কেন। আবার ঐ প্যাঁচ।

বিনোদিনী, বিধবা বিবাহের চেয়ে বড় সমস্যা কি আর নাই দেশে ?

অন্তত বিধবাদের কাছে নয়।

তাহলে তুমি একটি পাঁতি চাও। সে তো ভাটপাড়ার কাজ।

সেখানে কাউকে চিনিনে।

তবে সবার বড়ো বিদ্যাসাগরের কাছে যাওনা কেন ?

গিয়েছিলাম।

কি হল ?

সব শুনে খুশি হয়ে বললেন বিয়ে করবি ? কর। কিন্তু মা, আমি আর ঘটকালির মধ্যে নেই। বুড়ো বয়সে আমি আর পাতকের ভাগী হতে পারব না।

আপনি হবেন পাতকী ?

তিনি শুনে বললেন, পাতকী নইতো কি ? দেশের লোক নেমক-হারাম। বিধবা বিবাহ করলে টাকা পাওয়া যায় শুনে অনেক বেটা এক স্ত্রী থাকতে আর একবার বিবাহ করেছে। শেষে তিনি দীর্ঘ-নিশ্বাস ছেড়ে বললেন, বহু বিবাহ রোধ আইন পাস না হলে বিধবা বিবাহ আইনে সুফল হবে না।

আমি শুধোলাম, সে আইন পাস করিয়ে নিন না।

তিনি বললেন, হয়তো নিতাম বঙ্কিম বড় বাধা দিল। তারপরে একটু হেসে বললেন, ভাটপাড়া আর কাঁঠালপাড়া কাছাকাছি।

এই পর্যন্ত বলে মেয়েটি থামলে বঙ্কিমচন্দ্র বললেন, তা এখন কি করবে শুনি।

আপনিই বলুন।

দেখো সমাজের পিছু পিছু সাহিত্যিক এগোয়, সাহিত্যিকের পিছু পিছু সমাজ নয়। সমাজের অবস্থাকে স্বীকার করে নিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি করতে হয়। আমার সময়ে যেমন ছিল তাই অবলম্বন ক'রে লিখতে হয়েছে, তারপরে বদলেছে, সাহিত্যও বদলেছে, আরও

বদলাবে, সাহিত্যও বদল হবে। আমার সময়ে কুন্দ বিধবা বিবাহ করবার কথা ভাবতে পারে নি, এমন কি রোহিণীও নয়। এখন তুমি এসে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করছ। এর পরে আর পরামর্শ জিজ্ঞাসার প্রয়োজন হবে না। আপনা আপনি বিয়ে করে ঘর বাঁধবে।

কোনটা ভালো শুধোয় বিনোদিনী।

যুগ নিরপেক্ষ ভালো-মন্দ নেই। সে যুগের পক্ষে কুন্দর পন্থা ভালো ছিল, এ যুগের পক্ষে ভালো তোমার পন্থা. পরবর্তী যুগের পক্ষে আরও কিছু ভালো হবে। 'আমার মানসিক অবস্থাকে স্বীকার ক'রে নিয়ে বিবাহিত দম্পতি ইন্দিরা ও উপেন্দ্রনাথের মধ্যে Flirt-এর অভিনয় করাতে হয়েছে। লবঙ্গলতা অমরনাথকে পরকালের ভরসা দেখিয়েছে, কারণ ইহকালের দরজা বন্ধ। অন্যরকম কিছু করলে অবাস্তব হতো, সাহিত্য হতো না, হতো প্রচারকার্য। সাহিত্যিক প্রচারক নয়।

তবে আমাকে বিয়ে করবার পরামর্শ দিচ্ছেন।

হাঁ। যদি সে রকম পুরুষ পাও। এদেশে পুরুষ কাপুরুষ। লোকে বলে আমার নায়িকারা জ্বলন্ত। কথাটা মিথ্যা নয়, তবে যে তারা দেশে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে নি, তার কারণ এ দেশের পুরুষ ভিজে কাঠ। যত ধোঁয়ায় তত জ্বলে না। একেই বলে কাপুরুষ। শোনো বিনোদিনী, এখনো আমাদের দেশে নারীর নিরাশ্রয় থাকা সম্ভব নয়, হয়তো কোন কালে হবে, এখনো আশ্রয়ের দরকার আছে।

না নেই, নারীর স্বয়ম্ নির্ভর হওয়ার সময় এসেছে। কোন আশ্রয়ের দরকার নেই তার, না স্বামী আশ্রয়, না গৃহ আশ্রয়।

বঙ্কিমচন্দ্র ও বিনোদিনী তাকিয়ে দেখলো একটি জ্বলন্ত নারী গৃহে প্রবেশ করেছে। তার গড়ন সুঠাম, হাত দু'খানা সম্পূর্ণ খালি, গায়ে আসমানী রঙের কাঁচুলি, পিঠে পেটে খাটো দু'দিকের অনেকটা অংশ বের হয়ে আছে, বা হাতের তর্জনী ও মধ্যমাতে চাপা অর্ধদগ্ধ কুণ্ডলায়িত ধূম সিগারেট, বাঁ হাতের কব্জিতে বিড়ালের চোখের মতো

ছোট্ট একটা ঘড়ি, হাতে ঝোলানো চামড়ার থলে, আভরণের মধ্যে গলায় পলার মালা।

বিস্মিত বঙ্কিমচন্দ্রের মুখ দিয়ে কথা বের হয় না। তার বদলে আপনি কথা বের হয় মেয়েটির মুখ দিয়ে—

আপনাদের সব কথা শুনেছি। স্বামী আশ্রয় নয়, স্বামী হচ্ছে সংসারে ছোট বড় একখানা সালতি। প্রতিরোধের ঢাল। ঢাল ভেঙে গেলে আর একখানা নিতে বাধা কি। নন্দকিশোর নামে যে লোকটাকে আমি বিয়েতে বা‍ণ্‍ করেছিলাম, সে ছিল ঢাল, বেশ মজবুত। যা হোক তবু সে গেল। এখন কি বাকি জীবনটা কেঁদে কেঁদে কাটাবো! না তা হবে না। এখন আর একটা ঢালের সন্ধানে আছি।

সে বলে চলে, আসল কথা কি জানেন, মেয়েদের চাই কাজ, এতদিন তাদের কাজ ছিল না, তাই আশ্রয় চেয়েছে। এখন কাজ জুটেছে, তাই চাই ঢাল। মেয়ে কাজ করবে, আর সেই ঢাল সাময়িকভাবে তাকে স্বামী বলতে আপত্তি নাই, সংসারের আঘাত প্রত্যাঘাত থেকে রক্ষা করবে নারীকে। এই হচ্ছে নূতন যুগের বিবাহের ফিলজফি।

বিরক্ত বঙ্কিমচন্দ্র ঈষৎ বক্রভাবে শুধালেন তোমার কি কাজ জুটেছে?

একটি ল্যাবরেটারি।

তোমার নাম জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?

Oh yes! I am Sohini! and I presume you are Bankim Chandar, that which are re-actionary! তাহলে ক্ষতি নেই। এখন বলুন এই বিয়ের ফিলজফি কেমন লাগলো?

বঙ্কিমচন্দ্র বললেন, তোমরা বসো, আমি এখনি আসছি।

এদিকে বঙ্কিমচন্দ্রের ফিরতে বিলম্ব দেখে চামড়ার ব্যাগ খুলে

সোহিনী ছোট্ট আয়না বের করে মুখখানা দেখে নিয়ে লাল রঙের তুলি দিয়ে ঠোঁটের রং ঝালিয়ে নিল, কাল রঙের তুলি দিয়ে ভুরু টেনে দিয়ে, গালে রং ঘষে প্রসাধন ক্রিয়া সমাপ্ত করলো। তারপর একটা সিগারেট বের করে বিনোদিনীর উদ্দেশ্যে বলল, **Have a cigarette** !

বিনোদিনী বলল, **No, thanks.**

আচ্ছা ক্রমে হবে'খন। বুড়োর বোধকরি আসতে দেরি আছে! **in the meantime** তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাস করি! তুমি আমার সঙ্গে থাকবে ?

কেন ?

তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে, তোমাকে দিয়ে নীনার অভাব পূরণ হবে। ভেবেছিলাম তাকে একটা ঢাল যোগাড় ক'রে দেবো। ঢাল তলোয়ারে মিলে আমার ল্যাবরেটারি রক্ষা করতে পারবে। তা হল না, বেটি মনে মনে আশ্রয়প্রার্থী ছিল, বিয়ে ক'রে ফেলল, আগে বুঝতে পারি নি! **You are proper staff** !

আমিও নীনার মতো আশ্রয়প্রার্থী, আমি স্বামী চাই।

না হয় তাকে স্বামী বলো, ক্ষতি কি ? চট ক'রে না বলো না, **all found, all provided for** এমন **offer** আর পাবে না, উপরির মধ্যে পাবে এমন একটা লোক, যে স্বামীকে স্বামী, ঢালকে ঢাল। চট ক'রে রিফিউস করো না, ভেবে দেখো।

ভাববার কিছু নেই।

রাজি নও।

না।

Coward ! চললাম আমি।

এদিকে বঙ্কিমচন্দ্র কক্ষান্তরে গিয়ে পিরান গায়ে দিলেন, চটি জুতো খুলে পাম্পশু পরলেন, তারপর চুপিসাড়ে খিড়কির দরজা দিয়ে সদর রাস্তায় এসে দাঁড়ালেন। একখানা ঠিকে গাড়ি যাচ্ছিল, থামিয়ে

উঠে পড়লেন। কোচম্যান শুধালো, কর্তা কোথায় যাবো? বঙ্কিমচন্দ্র জানালা দিয়ে মুখ বার করে বলে উঠ্লেন, "হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোন খানে?"

কোচম্যান না বুঝতে পেরে নিরুদ্দিষ্ট নির্বিকার ভাবে ঘোড়ার পিঠে চাবুক মারলো।

অজিতকুমার চক্রবর্তী

অজিতকুমার চক্রবর্তী স্বল্পায়ু ব্যক্তি ছিলেন; মাত্র বত্রিশ বৎসর ১৯১৮ সালের ভারতব্যাপী নিদারুণ ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে তাঁর মৃত্যু ঘটে। মৃত্যুর সময়ে তিনি শান্তিনিকেতনের কর্ম থেকে বিদায় নিয়ে কলকাতায় বাস করতেন, সে সময়ে রামমোহনের জীবনী রচনায় নিযুক্ত ছিলেন, কাজটা বেশি দূর এগোয় নি, তার আগে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবনচরিত রচনা শেষ করেছিলেন, তাঁর জীবনকালেই বইখানা প্রকাশিত হয়েছিল। একথা গোড়াতেই বলবার উদ্দেশ্য এই যে, শান্তিনিকেতনের কর্মসূত্র ছিন্ন হলেও রবীন্দ্রনাথের স্নেহসূত্র ছিন্ন হয় নি। সদ্যপ্রতিষ্ঠিত বিচিত্রা ক্লাবের উৎসাহী সভ্যরূপে ঘনিষ্ঠ সূত্রে যুক্ত ছিলেন এই সংস্থার সঙ্গে। অজিতকুমাররা তিনজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন তিনি সতীশচন্দ্র রায় ও সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। তিনজনেই শক্তিমান লেখক; তিনজনেই রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতনের সঙ্গে কমবেশি যুক্ত, প্রথম দুজন বেশি, শেষোক্ত জন অপেক্ষাকৃত কম; তিনজনেই স্বল্পায়ু, অজিতকুমার বত্রিশ, সতীশচন্দ্র একুশ, সত্যেন্দ্রনাথ চল্লিশ। নানাদিকে এঁদের মিল, তাই একজনের প্রসঙ্গে অন্য দুজনের উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক নয়।

১৯১০ সালে বাল্যকালে ছাত্ররূপে শান্তিনিকেতনে গিয়ে অজিতবাবুকে শিক্ষকরূপে পেলাম, কাজেই তাঁর জীবনের অনেকটা অংশ আমার প্রত্যক্ষ। যতদূর জানি ১৯০৪ সালে বি-এ পাস করবার পরে তিনি শান্তিনিকেতনের কাজে যোগ দেন, আর যতদূর স্মরণ হচ্ছে ১৯১৫।১৬ সালে শান্তিনিকেতন পরিত্যাগ করেন, কাজেই তাঁকে ৫।৬ বছরকাল নিত্য দেখেছি, ইংরাজি, বাংলা, ভূগোল তাঁর কাছে পড়েছি।

অজিতকুমারের দেহ দোহারা গঠন, তবে ঝোঁকটা স্থূলতার দিকে

নয়, রঙ শ্যামল, মাথায় মাঝখানে চেরা সিঁথি, চোখ উজ্জ্বল, প্রসন্ন ওষ্ঠাধর, দেখলে মনে হবে এই মাত্র কোন একটা রসিকতা শুনে হেসেছিলেন এখনো রেশ লেগে রয়েছে ওষ্ঠাধারে। তার উপরে তিনি সুরসিক, সুবক্তা ও সুকণ্ঠ। রবীন্দ্রনাথের গানে তিনি তন্ময় থাকতেন (কাব্যে তো বটেই, সে কথা পরে হবে)। তখনকার দিনে শান্তিনিকেতনে দুজন রবীন্দ্রসঙ্গীতের ভাণ্ডারী ছিলেন দিনেন্দ্রনাথ ও অজিতকুমার। প্রধানত তাঁদের কল্যাণে সেখানে আকাশ রবীন্দ্র-সঙ্গীতে পূর্ণ থাকতো ; আর যা'দের গলায় রবীন্দ্রসঙ্গীত বা কোন সঙ্গীত আদৌ খোলে না, তারাও যথাসাধ্য গানের খোরাক যোগাতো। ফলতঃ সুরাসুরের চেষ্টায় আকাশ-বাতাস থমথম করতো। এখনকার শান্তিনিকেতন নীরব, বৃথা সঙ্গীত বোধ করি নিষিদ্ধ। তবে সুরের অভাব পূরণ করেছে ফুলে, এত ফুল, এত রকমের ফুল, ছোট একটি পল্লীতে দেখা যায় না। তখনকার দিনে শান্তিনিকেতন পুষ্প বিরল ছিল, মনে আছে পলাশ ফুল আনবার জন্যে যাতায়াতে ছয়-সাত মাইল পথ হাঁটতে হয়েছিল।

আমার শান্তিনিকেতন যাওয়ার অল্পদিন পরেই অজিতবাবু ইংলণ্ডে যান, সে বোধ হয় ১৯১১ সালের কথা। আমরা সকলে শোভাযাত্রা ক'রে গিয়ে তাঁকে কলকাতা রওনা ক'রে দিলাম। বিলাতে তিনি অল্পদিন ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের কিছু কবিতা প্রবন্ধ অনুবাদ ক'রে ইংরেজি শ্রোতাদের শুনিয়েছিলেন, তারা মুগ্ধ হয়েছিল বলে শুনতে পাই। বিলাত থেকে ফিরে আসবার পরে তাঁর আর একটা স্মৃতি স্পষ্ট মনে আছে। বিকালের দিকে বা সন্ধ্যাবেলায় শিক্ষকদের নিয়ে ইংরাজি সাহিত্য ও দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা করতেন, আমরা বলতাম পড়াতেন। আমাদের যাঁরা শিক্ষক, তাঁদের তিনি শিক্ষকতা করছেন, এতে আমাদের বিস্ময়ের অন্ত থাকতো না, বুঝতাম অজিতবাবু মস্ত পণ্ডিত।

তারপরের স্মৃতি হচ্ছে ১৯১২ সালের নভেম্বর মাসের। সেদিন

রাতের বেলায় সকলে খেতে বসেছি এমন সময় অজিতবাবু ছুটে এসে ঘরে ঢুকলেন, আনন্দে ও উচ্চস্বরে বলে উঠলেন, গুরুদেব নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন। তার আগে নোবেল প্রাইজ নাম শুনি নি, কিন্তু অজিতবাবু ও অন্যান্য শিক্ষকদের আনন্দ দেখে, একসঙ্গে তিন দিন ছুটি ঘোষণা শুনে বুঝলাম বড় রকম ব্যাপার একটা কিছু হয়েছে। এই সময়েই তাঁর কাছে ইংরেজি, ভূগোল প্রভৃতি পড়া শুরু করেছি। তিনি অবশ্যই যোগ্য শিক্ষক ছিলেন, কিন্তু যোগ্য শিক্ষক যোগ্য ছাত্র প্রত্যাশা করে, সে আশা তাঁর পূর্ণ হয়েছিল মনে হয় না, অন্তত আমাকে দিয়ে নিশ্চয় হয় নি।

ছুটির আগে কলকাতা থেকে অনেক রবীন্দ্রানুরাগী ব্যক্তির আগমন হতো। তাঁদের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও মণিলাল গাঙ্গুলী অজিতবাবুর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তাঁরা এলে অজিতবাবুর আনন্দের সীমা থাকতো না। তাঁর গানের কথা আগে বলেছি সেই সঙ্গে অভিনয়ের কথাও বলা উচিত ছিল। তিনি সুদক্ষ অভিনেতা ছিলেন; ছুটির আগে রাজা, শারদোৎসব প্রভৃতি নাটক অভিনীত হতো, এইসব নাটকে তাঁর অভিনয় দেখেছি। শিক্ষক, গায়ক ও অভিনেতা ছাড়া যে তিনি একজন সাহিত্যিক ছিলেন, একথাও জানতাম, কিন্তু অনেকটা পরোক্ষে, কেননা তাঁর রচনা বুঝবার বয়স সেটা নয়। ১৯১১ সালে রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশ বৎসর বয়ঃপূর্তি উপলক্ষে শিক্ষক ও সমাগত সুধীজনের সভায় রবীন্দ্রনাথের কবিজীবন সম্বন্ধে একটা ধারাবাহিক রচনা পড়ে শুনিয়েছিলেন। এ তাঁর সেই বিখ্যাত রবীন্দ্রনাথ নামে গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি। পরবর্তী কালে বইখানা মুদ্রিত হয়ে সমাদর ও খ্যাতি লাভ করেছে। তার বোধ হয় কিছুদিন আগে কিংবা পরেও হতে পারে ৮ই পৌষে শান্তিনিকেতনিকদের সভায় আশ্রম সম্বন্ধে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ পড়েছিলেন বলে মনে আছে, তার দৈর্ঘ্য ছাড়া তখন আর কিছু বুঝি নি। আরও দু' একটা ঘটনার কথা না বললে এ রচনা অসম্পূর্ণ থাকবে। তাঁর প্রথম সন্তানের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে

রবীন্দ্রনাথ একটি অভিভাষণ দিয়েছিলেন, সেটি তাঁর গ্রন্থাবলীতে রয়ে গিয়েছে। তারপরে একদিন তাঁর মৃত্যুসংবাদ এলো : তখন সেই দেশব্যাপী মহামারীর মধ্যে মৃত্যুর সংবাদটাই ছিল প্রধান সংবাদ, তৎসত্ত্বেও তাঁর মৃত্যুসংবাদটি মনে রয়ে গিয়েছে। এ উপলক্ষেও রবীন্দ্রনাথ একটি অভিভাষণ দিয়েছিলেন। অজিতবাবুর শরীর কোনদিনই বেশ সুস্থ সবল ছিল না, মহামারী সহজেই তাঁকে আয়ত্ত করে নিতে সক্ষম হয়েছিল। এইতো সংক্ষেপে তাঁর বত্রিশ বছরের জীবন সম্বন্ধে আমার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ জ্ঞান। কিন্তু অনেক বিষয় আছে যা শেষ হলেও সমাপ্ত হয় না। ভাবুক ও রসিকের জীবন এমনি একটি বিষয়। অজিতবাবুর শ্রাদ্ধবাসরে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন যে, ভাবুকের মৃত্যু নেই, কারণ ভাবের মধ্যে সে বেঁচে থাকে। অজিতকুমারকে নিয়ে এই যে আলোচনা করতে বসছি তাতেই প্রমাণ হয় আজও তিনি ভাব-জীবনে প্রত্যক্ষ হয়ে রয়েছেন।

॥ ২ ॥

অজিতকুমার চক্রবর্তীর রচনার পরিমাণ খুব বেশি নয়, তবে বয়সের তুলনায় নিতান্ত কমও নয়। তন্মধ্যে রবীন্দ্রনাথ নামে ক্ষুদ্র পুস্তিকাটি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও সর্বপ্রধান। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যেসব বৃহদায়তন পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে, তাদের তুলনায় বইখানা ক্ষুদ্র, তবে এ ক্ষুদ্রতা বীজের ক্ষুদ্রতা, ঐ বীজের মধ্যে অসংখ্য বনস্পতির সম্ভাবনা। এই প্রথম রবীন্দ্রকাব্যের ধারাবাহিক আলোচনার সূত্রপাত। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা ও রবীন্দ্রকাব্যের ক্রম স্ফুটমান তত্ত্বধারাকে অনুসরণের চেষ্টা অবশ্য ইতিপূর্বে মোহিতচন্দ্র সেন রবীন্দ্রনাথের কবিতাগুলিকে বিষয়ানুসারে নূতনভাবে সাজিয়ে যে গ্রন্থাবলী প্রকাশ করেছিলেন, তাতেও এই চেষ্টা হয়েছিল। অনেকের মুখে এই সংস্করণটির প্রশংসা শুনেছি, আমার মন সায় দেয় নি। এতে রবীন্দ্রকাব্যবোধের পথ সুগম করেছে মনে হয় না। বিশ্ব, নারী, শিশু

স্বদেশ, প্রকৃতি প্রভৃতি শিরোনামায় কবিতা বিভক্ত হলে কবির মনের ধারাবাহিকতা পাওয়া যায় না, আর মনের প্রধান লক্ষণই যে ধারাবাহিকতা। নদীর শ্যাওলা, পাঁক, জল, মাছ, নৌকা প্রভৃতিকে আলাদা ক'রে দেখলে আর যাই পাওয়া যাক নদীর সত্য পরিচয় পাওয়া যায় না, কারণ নদীর পরিচয় তার ধারাবাহিকতায়। কালানুক্রমিক আলোচনাই কাব্যবোধের প্রশস্ততম পথ। অবশ্য ইংরাজি অলঙ্কারশাস্ত্রানুমোদিত লিরিকাল ন্যারাটিভ, ড্রামাটিক বিভাগও চলতে পারে, তবে মন্দর ভালো হিসাবে। ওয়ার্ডস্বার্থের কাব্যসঙ্কলনের ভূমিকায় ম্যাথু অর্নল্ড এ বষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, এখানে তার পুনরুল্লেখ বাহুল্য। অজিতবাবু ধারাবাহিক আলোচনার পথ গ্রহণ করে পরবর্তীদের পথপ্রদর্শক হয়েছেন।

১৯১১ সালে যখন বইটি লিখিত হয় তখন গীতাঞ্জলি পর্যন্ত প্রকাশিত হলেও অজিতবাবুর আলোচনার সীমা ততদূর যায় নি। আলোচনার ঝোঁকটা রসের চেয়ে তত্ত্বের দিকে বেশি। আর তার মধ্যে অনেকটা জায়গা জুড়েছে জীবনদেবতার তত্ত্ব। রবীন্দ্রকাব্যলোচনার আজ জীবনদেবতাতত্ত্ব যে গুরুত্ব লাভ করেছে তার মূলে অজিতবাবুর ইঙ্গিত, অবশ্য সেই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথকৃত ব্যাখ্যানও আছে। আমি যত দূর বুঝি জীবনদেবতাতত্ত্বের গুরুত্ব আরোপিত, কাজেই অনেক পরিমাণে অলীক। কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না, ওটা রবীন্দ্রকাব্য আলোচনার একটা প্রধান বিষয় হয়ে যে দাঁড়িয়েছে তার প্রেরণা অজিতবাবুর গ্রন্থে। এতে বইখানার প্রভাবের প্রমাণ হয়।

এর পরে প্রকাশিত হয় কাব্য পরিক্রমা। কাব্য পরিক্রমা মানে রবীন্দ্র কাব্য পরিক্রমা। 'রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে আলোচনার ধারা যতদূর এসেছিল কাব্যপরিক্রমাই তার অঙ্গবর্তন। গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য, জীবনস্মৃতি, ছিন্নপত্র, ডাকঘর প্রভৃতির আলোচনা কাব্যপরিক্রমার অন্তর্গত। তৎপূর্বে এ সব বই সম্বন্ধে আলোচনা হয় নি। এ বইখানাকে 'রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থের জের বলা যেতে পারে, প্রভেদের মধ্যে

পূর্বলিখিত ধারাবাহিকতা এতে নেই, কিন্তু তাতে ক্ষতি হয়েছে মনে হয় না। রবীন্দ্রকাব্য সম্বন্ধে বই দু'খানা সমালোচক হিসাবে, রবীন্দ্র-সমালোচক হিসাবে তার শ্রেষ্ঠ কৃতি। তখনকার দিনে রবীন্দ্রনাথের কাব্য "পাঠ্যগ্রান্থ" পরিণত হয় নি, কাজেই ছাত্রসমাজের মুখ তাকিয়ে অজিতবাবুকে লিখতে হয় নি : আবার রবীন্দ্রনাথের পাঠকসমাজও আজকের মতো বিস্তৃত ছিল না। তবে কাদের জন্য এসব বই লিখতে হয়েছিল ? এক কথায় বলা যেতে পারে যে, ভবিষ্যতের মুখ তাকিয়ে তিনি লিখেছিলেন আর লিখেছিলেন নিজের মতো রসিক ও বোদ্ধাদের জন্য। এখানেই অজিতবাবুর আলোচনার গাঢ়তার আসল রহস্য, আজকালকার আলোচনায় অনেক সময়ে যে তরলতা দেখা যায় তার অভাবের হেতু।

অজিতবাবুর পরিণত কলমের আর একখানি আলোচনাগ্রন্থ 'বাতায়ন'। "বাতায়ন যেমন বিশ্বের আলো-বাতাসকে ঘরের ভিতরে আনে, আমার এই গ্রন্থ যদি ভাবলোকের আলো-হাওয়াকে খুব সামান্য পরিমাণেও সংগ্রহ করিয়া আনিতে কৃতকার্য হইয়া থাকে, তাহা হইলেই এই নামকরণ সার্থক হইবে।" "একালের ভাবজগতে এদেশে ও বিদেশে যে সকল আলোচনা নানা ধারায় প্রবাহিত হইতেছে, আমি আমার ক্ষুদ্র অঞ্জলি পূর্ণ করিয়া তাহা হইতে কতক কতক তীর্থে বহন করিয়া আনিয়াছি মাত্র।"

গ্রন্থনিবেদনে লিখিত এই দুটি অংশে বাতায়ন গ্রন্থের উদ্দেশ্য বুঝতে পারা যাবে। এতে একদিকে যেমন মেটারলিঙ্ক ও এডমণ্ড হোলমের কবিতার আলোচনা আছে, তেমনি আছে কবীর ও উপনিষদের আলোচনা। তা ছাড়া আছে কতকগুলি বিষয়ানুগ প্রবন্ধ যথা, শিল্প, কবিতা, সৌন্দর্য ও মহিমা, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাধনা, ধর্ম ও স্বাজাত্য এবং কর্মকথা (রামেন্দ্রসুন্দরের উক্ত নামধেয় গ্রন্থের আলোচনা)। এ জাতীয় আলোচনা বিশেষ বিদেশী গ্রন্থকার সম্বন্ধে, একেবারেই নূতন ছিল।

খ্রীস্ট নামে অজিতবাবুর আর একখানি বই রবীন্দ্রনাথ-লিখিত ভূমিকা সংবলিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। বইখানার বিষয় খ্রীস্টের জীবন ও বাণী। ১৯১৬ সালে অজিতকুমার লিখিত 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর' জীবনচরিত প্রকাশিত হয়। মৃত্যুর সময়ে তিনি রামমোহন সম্বন্ধে গ্রন্থ রচনায় নিযুক্ত ছিলেন।

অজিতবাবুর মৃত্যুর পরে প্রায় পঞ্চাশ বছর অতিবাহিত হয়েছে; পঞ্চাশ বছর শতাব্দীর অর্ধ। এই সময়ের মধ্যে অনেক পরিবর্তন ঘটেছে, সে পরিবর্তনের বেগ সাহিত্যকেও বাদ দেয় নি। সাহিত্যের একটা চিরকালীন ধর্ম থাকা সত্ত্বেও তার সাময়িক পরিচ্ছদের বদল ঘটে, বাংলা সাহিত্যেও ঘটেছে। তৎসত্ত্বেও অজিতবাবুর নাম এখনো উজ্জ্বল। এর কারণ কি? creative বা কারয়িত্রী রচনার সঙ্গে critical বা ভাবয়িত্রী রচনার তুলনা করা ঠিক সঙ্গত নয়, কারণ দুয়ের প্রেরণা ও উদ্দেশ্য আলাদা। তবু বললে অন্যায় হয় না যে কারয়িত্রী রচনা যদি একেবারে প্রথম শ্রেণীর না হয়, তবে তার টিকে থাকবার সম্ভাবনা কম। দ্বিতীয় শ্রেণীর কারয়িত্রী রচনা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ সময় টিকে। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, রামেন্দ্রসুন্দরের তুলনায় অজিতবাবুর রচনাকে দ্বিতীয় শ্রেণীর বলা নিশ্চয় নিন্দা নয়, বিশেষ পূর্ণ পরিণতির সুযোগ জীবনে যখন তিনি পান নি।

আর একটা প্রশ্ন। অজিতবাবু প্রধানতঃ সমালোচক, কিন্তু শেষজীবনে তিনি জীবনী রচনায় হস্তক্ষেপ করেছিলেন। মহর্ষির জীবনী সমাপ্ত ক'রে রামমোহনের জীবনী লিখতে শুরু করেছিলেন। এখন প্রশ্নটা হল সমালোচনা ও জীবনচরিত এ দুয়ের মধ্যে কোন্ শ্রেণীর রচনায় তাঁর প্রতিভার উজ্জ্বলতর প্রকাশ ঘটতো। বলা সহজ নয়, তবে আমার বিশ্বাস সমালোচনার কলম নিয়েই তিনি জন্মেছিলেন। প্রকৃত জীবনচরিত উপন্যাসের সমগোত্র রচনা, দুয়ের আদর্শ আলাদা হলেও প্রেরণা এক। ডিকেন্সের অধিকাংশ উপন্যাস কোন-না কোন কল্পিত মানুষের জীবনী; বসওয়েলের জনসন এবং লখার্টের

স্কট বাস্তব মানুষ। জীবনীকার ছদ্মবেশী ঔপন্যাসিক। এ গুণ কিছু-কিঞ্চিৎ না থাকলে প্রকৃত জীবনী রচনা সম্ভব নয়। অজিতবাবুর এ গুণ ছিল মনে হয় না। অপরপক্ষে সমালোচনার কলম তাঁর হাতে এমন সহজাত ও সুপ্রচুর ক্ষমতাসম্পন্ন ছিল যে মহর্ষির জীবনী একখানি সমালোচনা গ্রন্থে পরিণত হয়েছে, তৎকালীন সমাজে ধর্মের, শিক্ষার ও সমাজের যে শুভ পরিবর্তন ঘটছিল তারই আলোচনা, মহর্ষি যার যোগ্য প্রতিনিধি। এ জীবনী নয়, সমালোচনা। আর তাঁর সমালোচক-কলমের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধীয় গ্রন্থ দু'খানি, পঞ্চাশ বছরের পরিবর্তন কাটিয়ে আজও যার তাৎপর্য অটুট আছে।

বাংলা সাহিত্যের একটি বৃহৎ অধ্যায় স্বল্পায়ু লেখকের, "upfulfilled renown" গণের ইতিহাসে পূর্ণ। অজিতবাবুদের তিন বন্ধুদের কথায় ধরা যাক, যাঁদের দিয়ে সূচনা করেছিলাম প্রবন্ধের। সতীশচন্দ্র রায়ের বাংলা সাহিত্যের একজন শ্রেষ্ঠ কবি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বোধ করি কাব্যসৃষ্টির সীমান্তে এসে পৌঁছেছিলেন, তবে সমালোচক এবং ঔপন্যাসিক রূপে নূতন খ্যাতি অর্জন তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল না। আর অজিতকুমার দীর্ঘতর জীবনের সুযোগ পেলে সমালোচক রূপে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ রামেন্দ্রসুন্দরের যোগ্য অনুজত্ব লাভের গৌরব অর্জন করতে সক্ষম হতেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যচিন্তা

চিন্তাকে তত্ত্বে পরিণত করা আবার তত্ত্বকে আরও ঘনীভূত ক'রে সূত্রে পরিণত করা মনীষার একটি শ্রেষ্ঠ লক্ষণ। কিন্তু এই প্রক্রিয়া বাংলা সাহিত্যে অত্যন্ত বিরল। খুব সম্ভবতঃ বাংলার মত Analytical ভাষা এই প্রক্রিয়ার অনুকূল নয়। এ ভাষায় উল্টো প্রক্রিয়াটাই অনায়াস। সূত্র এখানে তত্ত্বে এবং তত্ত্ব এখানে সহজেই চিন্তার বাষ্পীয় রূপ গ্রহণ করে। ভাষার ধর্মই এখানে লেখকের ধর্মের নিয়ামক। রবীন্দ্র সাহিত্যে এর উদাহরণ সুপ্রচুর। তাঁর মানুষের ধর্ম, ব্রহ্মমন্ত্র, ঔপনিষদ ব্রহ্ম ও শান্তিনিকেতন পর্যায়ের রচনা-গুলি এই প্রক্রিয়ার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। উপনিষদ প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্রের উক্তিগুলিকে অবলম্বন ক'রে ব্যাখ্যাচ্ছলে নূতন ভাষা রচনা করেছেন কবি এবং শেষ পর্যন্ত সেই ভাষ্য বা তত্ত্ব আরও সূক্ষ্ম আকার গ্রহণ ক'রে ধর্মবিষয়ে রবীন্দ্র-চিন্তার একটি বাষ্পীয় পরিমণ্ডল রচনা করেছে। যে বাষ্পীয় মণ্ডল এমন সূক্ষ্ম যা অঙ্গুলি নির্দেশ ক'রে দেখানো যায় না, কিন্তু সহৃদয় পাঠক প্রত্যেক নিশ্বাসে তার অস্তিত্ব অনুভব করতে পারে। এখানে বাংলা ভাষার প্রকৃতির সঙ্গে রবীন্দ্র-প্রতিভার প্রকৃতি মিলে গিয়েছে। এ একাধারে বাংলা ভাষা ও রবীন্দ্রনাথ দুয়েরই বৈশিষ্ট্য। ধর্মচিন্তা সম্বন্ধে যেমন রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য, সমাজ ও রাজনৈতিক চিন্তা সম্বন্ধেও এ কথা অল্পবিস্তর সত্য। মোট কথা এই যে ঘনত্ব থেকে সূক্ষ্মতার দিকে তাদের গতি। সূত্রের অতি পিনদ্ধ ঘনত্ব রবীন্দ্রনাথের চিরচঞ্চল কবি-প্রতিভার অনুকূল নয়।

আগেই বলেছি যে বাংলা ভাষার প্রকৃতিও তার অনুকূল নয়। তাই বাংলা সাহিত্যে উল্টো প্রক্রিয়া অর্থাৎ চিন্তা থেকে তত্ত্ব হয়ে সূত্রে পৌঁছাবার দৃষ্টান্ত বড় চোখে পড়ে না। গোড়ায় এই বলে শুরু করেছিলাম সূত্র সৃষ্টি-মনীষার একটি শ্রেষ্ঠ লক্ষণ। এখন বাংলা

ভাষার বিশেষ প্রকৃতি স্মরণ ক'রে সামান্য একটুখানি সংশোধন ক'রে বলেছি, চিন্তাকে তত্ত্বের পথে সূত্রে পরিণত করায় মনীষার উৎকর্ষের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। আর এই লক্ষণটির উদাহরণ বাংলা সাহিত্যে অত্যন্ত দুর্লভ।

॥ ২ ॥

কিন্তু সুখের বিষয় এই যে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যের উদাহরণ কখনো কখনো বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় দেখতে পাওয়া যায়। ভাটপাড়ার নিকটবর্তী কাঁটালপাড়ার অধিবাসী বঙ্কিমচন্দ্রের নৈয়ায়িক মন সূত্র রচনার অনুকূল ছিল। সহজেই তাঁর হাতে চিন্তা তত্ত্বে এবং তত্ত্ব সূত্রে পরিণত হয়ে উঠত। তাঁর সমস্ত উপন্যাসই উপন্যাসের সূত্ররূপ। তাদের ঘনত্ব অতিশয় প্রত্যক্ষ। দুর্বল লেখকের বা ভিন্নধর্মী লেখকের হাতে পড়লে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রত্যেকখানি উপন্যাস বিপুল কলেবরে স্ফীত বাষ্পীয় আকার লাভ করতে পারত। তাঁর প্রবন্ধগুলি সম্বন্ধে এ কথা আরও সত্য। একটি পরিচ্ছেদের বস্তুকে একটি অনুচ্ছেদে, একটি অনুচ্ছেদের বস্তুকে একটি বাক্যে পরিণত তিনি করেছেন। "যে রচনা সকলেই বুঝিতে ' ারে এবং পড়িবামাত্র যাহার অর্থ বুঝা যায়, অর্থগৌরব থাকিলে তাহাই সর্বোৎকৃষ্ট রচনা।" একটিমাত্র বাক্যে বঙ্কিমচন্দ্র যে-ভাব প্রকাশ করেছেন, পরবর্তীকালে সেই ভাবটি প্রকাশ করতে অনেকের প্রবন্ধের দৈর্ঘ্য আবশ্যক হয়েছে। কিন্তু এই বাক্যটির মধ্যে 'অর্থগৌরব' শব্দটি প্রাণস্বরূপ। ওটির অভাবে বক্তব্য অসম্পূর্ণ ও তরল, ঐ শব্দটির সম্ভারে বাক্য প্রাণলাভ করল—বলবার আর কিছু অবশিষ্ট থাকল না। চিন্তাকে এইরূপ একটি শব্দে ঘনভূত রূপদানে বঙ্কিমচন্দ্রের অনায়াস নৈপুণ্য ছিল।

"যখন হৃদয় কোন বিশেষভাবে আচ্ছন্ন হয়, স্নেহ কি শোক কি ভয়, কি যাহাই হউক, তাহার সমুদায় অংশ কখনো ব্যক্ত হয় না। কতকটা ব্যক্ত হয়, কতকটা ব্যক্ত হয় না। যাহা ব্যক্ত হয়, তাহা

ক্রিয়ার দ্বারা বা কথা দ্বারা। সেই ক্রিয়া এবং কথা নাটককারের সামগ্রী। যেটুকু অব্যক্ত থাকে, সেটুকু গীতিকাব্য প্রণেতার সামগ্রী। যেটুকু সচরাচর অদৃষ্ট, অদর্শনীয় এবং অন্যের অননুমেয় অথচ ভাবাপন্ন ব্যক্তির রুদ্ধ হৃদয়মধ্যে উচ্ছ্বসিত, তাহা তাঁহাকে ব্যক্ত করিতে হইবে। মহাকাব্যের বিশেষ গুণ এই যে, কবির উভয়বিধ অধিকার থাকে; বক্তব্য এবং অবক্তব্য উভয়ই তাঁহার আয়ত্ত। মহাকাব্য, নাটক এবং গীতিকাব্যে এই একটি প্রধান প্রভেদ বলিয়া বোধ হয়।" মহাকাব্য, নাটক ও গীতিকাব্যের স্বরূপ লক্ষণ ও পার্থক্য কেমন অনায়াস সংক্ষেপে উক্ত হয়েছে, আসল কথা একটিও বাদ পড়ে নি, অবান্তর একটি কথাও প্রবেশ করে নি। এ গুণ পরবর্তীকালে রামেন্দ্রসুন্দরের রচনায় অনেক পরিমাণে দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু তেমন এক-আধটি নিদর্শন বাদ দিলে স্বীকার করতে হয় যে কালের গতিতে সূত্রাত্মক বাংলা সাহিত্য ক্রমে ব্যাখ্যাত্মক হয়ে উঠেছে। অবশ্য উদ্ধৃত উদাহরণগুলি সূত্রাত্মক কিন্তু ঠিক সূত্র নয়। সৌভাগ্যের বিষয় তেমন উদাহরণও বঙ্কিম সাহিত্যে বর্তমান।

॥ ৩ ॥

বিশুদ্ধ সূত্রাকারে বঙ্কিমচন্দ্র কর্তৃক লিখিত একটি প্রবন্ধ পাওয়া যায়। "বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন।" প্রবন্ধটি প্রচার পত্রের ১২৯১ সালের মাঘে প্রকাশিত। তার পরে আটাত্তর বৎসর অতিবাহিত হয়েছে। সেদিন যে-সব পরামর্শ নব্য লেখকদের অনুসরণ করা উচিত বলে বঙ্কিমচন্দ্রের মনে হয়েছিল, এতকাল পরেও আজ তাদের মূল্য কিছুমাত্র কমে নি। এই সূত্রগুলিই আজকার প্রবন্ধের বিষয়। সে আলোচনা আরম্ভ করবার পূর্বে মনে করিয়ে দেওয়া আবশ্যক যে বঙ্কিমচন্দ্র নানা প্রসঙ্গে নানা প্রবন্ধে সাহিত্য বিষয়ে যেসব চিন্তা করেছেন 'নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদনে' তারই ঘনীভূত রূপ। বস্তুতঃ একে বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যচিন্তার সার বা

ঘনীভূততম রূপ বলা যেতে পারে। চিন্তা এখানে তত্ত্বাবস্থা অতিক্রম ক'রে সূত্রে পরিণত। কথিত প্রবন্ধের বারোটি সূত্রের মধ্যেই তাঁর সাহিত্য তত্ত্বের স্থায়ী আশ্রয়।

এই বারোটি সূত্রের প্রথম চারটি সাহিত্যনীতি বিষয়ক, বাকি আটটিতে সাহিত্যরীতি। নীতি বিষয়ক সূত্রগুলির প্রধান লক্ষ্য সাহিত্যিক, আর রীতি বিষয়ক সূত্রগুলির লক্ষ্য সাহিত্য। তবে এমন বাঁধা-ধরা নিয়ম কল্পনা করা উচিত হবে না, এই নিয়ম প্রয়োগ করতে গেলে ব্যতিক্রম ধরা পড়বে। তবে মোটের উপর এ নিয়ম খাটে বটে। আরও একটি কথা। বঙ্কিমচন্দ্র যে-সময়ে লিখেছিলেন তার পরে শিক্ষার বিস্তার বেড়েছে, আর্থিক উন্নতি ঘটেছে, ফলে কোন কোন সূত্রের জোর কমে এসেছে। এই রকম কিছু কিছু গৌণ মূল্য-হ্রাস সত্ত্বেও সূত্রগুলির মুখ্য মূল্য আজও সমান সতেজ রয়েছে।

> ১॥ যশের জন্য লিখিবেন না। তাহা হইলে যশও হইবে না, লেখাও ভাল হইবে না। লেখা ভাল হইলে যশ আপনি আসিবে।

এটি সাহিত্য-সৃষ্টির একটি পুরাতন নীতি, কিন্তু দুঃখের বিষয় অল্প সাহিত্যিকেই এ নীতি সম্বন্ধে সচেতন। যশের জন্য লেখা আর লেখার জন্য যশ এ দুয়ে অনেকেই প্রভেদ করতে অক্ষম। একখানি বই লিখে যশস্বী হলে লেখক প্রায়শ তার অনুবৃত্তি করতে উদ্যত হয়। এ পথটি বড়ই সঙ্কটের। অনুবৃত্তি সার্থক না হলে আগের বইখানারও তেজ কমে আসবার আশঙ্কা। কিন্তু এই ব্যবহারিক বিচার ছেড়ে দিলেও দেখা যায় যে মনের মধ্যে যশের আকাঙ্ক্ষা প্রবল আকারে থাকলে দ্বিধাগ্রস্ত মনের ফাঁক দিয়ে অনেকটা শক্তির অপচয় ঘটে, ফলে অনন্যমনা শিল্প-সৃষ্টি অসম্ভব না হলেও নিতান্ত কঠিন হয়ে পড়ে। বিশেষ, যশের প্রকৃতি বড় বিচিত্র—

> "Fame, like a wayward girl, will still by coy,
> To those who woo her with too slavish knees,

But makes surrender to some thoughtless boy,
And dotes the more upon a heart at ease ;

... ...

Ye love-sick Bards ! repay her scorn for scorn
Ye Artists lovelorn ! mad men that ye are !
Make your best bow to her and bid adiau,
Then, if she likes it, she will follow you !"

যশের প্রকৃতি সম্বন্ধে এ উক্তি সেই তরুণ কবির, অকালে দীপ নির্বাণের সময়ে যিনি ভেবেছিলেন যে জলের উপরে তাঁর নাম লিখিত হল। কিন্তু দেখা গেল যে তা হয় নি। লেখক জীবনের শুরুতেই যাঁরা যশ পান তাঁরা সত্যই হতভাগ্য কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সে যশ প্রথম প্রহরের পরেই ম্লান হয়ে আসে, খ্যাতির পুনরাবর্তন কদাচিৎ ঘটে। তখন তাঁদের মন আর সৃষ্টিকার্যের অনুকূল থাকে না, অপস্রিয়মাণ খ্যাতির পিছে ছুটোছুটি করেই জীবনটা কেটে যায়। "লেখা ভাল হইলে যশ আপনি আসিবে।" বলা সহজ, কিন্তু কত দিন পরে আসবে, কি আকারে আসবে—এ সব প্রশ্নের উত্তর তত সহজ নয়—অত্যন্ত কঠিন। কীটস ও শেলী অল্প বয়সে মারা যান, তখন যশ পান নি। আর দশ বছর বাঁচলেই যশের মুখ দেখতে পেতেন। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থকে যশের জন্য আরও দীর্ঘকাল অপেক্ষা করতে হয়েছিল—তবে নিজে দীর্ঘজীবী ছিলেন বলে জীবিত অবস্থাতেই নিজেকে খ্যাতিমান দেখতে সক্ষম হয়েছিলেন। আসল কথা লেখককে একটু একরোখা হতে হবে, কে কি বলবে না ভেবে নিজের নাক-বরাবর চলতে হবে, তাতে যদি "মৃত্যুর মাঝে নিয়ে যায় পথ, সুখ আছে সেই মরণে।" নবীন লেখকের পক্ষে সব চেয়ে সঙ্কটের হচ্ছে "ভাই হাত-তালির" উস্কানি। এ যুগে "ভাই হাততালি" রাজনৈতিক দলের উৎসাহ বাণীরূপে অবতীর্ণ। আধুনিক রাজনীতিতে দলে জনকতক কবি, লেখক, চিত্রকর, নৃত্যশিল্পী প্রভৃতি আবশ্যক। কাঁচা মাথা ও অপটু কলম সহজেই এ ফাঁদে পা দেয়—কারণ খ্যাতি ও

অর্থ হাতে হাতে। রাজনৈতিক দলের কল্যাণে শক্তিবানের শক্তি অপচয় এবং অক্ষমের অভ্যুদয়ের অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে। যশোলাভের আশায় সাহিত্যিকে পারে না এমন কাজ অল্পই আছে। এই নিষ্ঠার সামান্য অংশও যদি সাহিত্য রচনায় নিযুক্ত হত তবে স্থায়ী সাহিত্য ও স্থায়ী যশ দুই করায়ত্ত হত তার।

> ২॥ টাকার জন্য লিখিবেন না। ইউরোপে এখন অনেক লোক টাকার জন্যই লেখে, এবং টাকাও পায়; লেখাও ভাল হয়। কিন্তু আমাদের এখনও সে দিন হয় নাই। এখন অর্থের উদ্দেশ্যে লিখিতে গেলে, লোকরঞ্জন প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া পড়ে। এখন আমাদিগের দেশের সাধারণ পাঠকের রুচি ও শিক্ষা বিবেচনা করিয়া লোকরঞ্জন করিতে গেলে রচনা বিকৃত ও অনিষ্টকর হইয়া ওঠে।

বঙ্কিমচন্দ্র যখন লিখেছিলেন তার পরে দেশের অবস্থার কিছু পরিবর্তন হয়েছে। শিক্ষার প্রসারের ফলে পাঠকের সংখ্যা বেড়েছে, রুচিরও কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। কাজেই টাকার জন্যে লিখে টাকা উপার্জন করা আগের চেয়ে সহজ হয়েছে। শুধু তাই নয়, শিল্পের খাতিরে লিখেও টাকা উপার্জন করছে এমন লেখকের সংখ্যা কম নয়। কালক্রমে অবস্থার আরও পরিবর্তন ঘটবে। বঙ্কিমচন্দ্রের সময়ে অবস্থা অন্য রকম ছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু অনেক বাঙালী লেখক এখন টাকার মুখ দেখেছে আর তাতেই নূতন সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। বই বিক্রির সংখ্যার উপরে এখন বইয়ের গুণ নির্ভর করতে শুরু করেছে। এ ধারণা সাহিত্যের পক্ষে স্বাস্থ্যকর নয়। আর এই সূত্রে অনেকের ধারণা হয়েছে যে সব বইয়ের কাটতি বেশি যেমন উপন্যাস বা উপন্যাস-ধর্মী রচনা, সেইগুলি বুঝি সাহিত্য। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, যে ব্যক্তি উপন্যাস লিখতে পারল না তাকে সাহিত্যিক বলেই গণ্য করা হয় না। ফলে উপন্যাসের বাজারে কেবল খদ্দের

নয় লেখকেরও ভিড়। তার উপরে আর এক আপদ সিনেমার দাবী। অনেক ঔপন্যাসিক এখন সিনেমার দিকে অর্থাৎ সিনেমার অভিনেতাদের দিকে চোখ রেখে কলম চালনা করেন, এবং অনেক সময়েই তাঁদের বই উপন্যাসের আকারে সিনেমার **script**-এর রূপ পরিগ্রহণ করে। সিনেমার আকর্ষণ মানে সহজ টাকা ও বিজ্ঞাপনের আকর্ষণ। টাকা ও বিজ্ঞাপনকে অবাঞ্ছনীয় এমন বলি না; কিন্তু সাহিত্যিক উৎকর্ষের বদলে নিশ্চয় বাঞ্ছনীয় নয়। সাহিত্য শিল্পের দাবী ছাড়া অন্য দাবী প্রবল হয়ে উঠলে সাহিত্যগুণের অপকর্ষ ঘটতে বাধ্য। আশঙ্কা করি ঘটছেও। বইয়ের বিক্রি দিয়ে যেমন বইয়ের গুণ নির্ধারিত হচ্ছে তেমনি সিনেমার উপযোগিতা দিয়েও বইয়ের গুণ নির্ধারিত হতে চলেছে। ইংরাজী ফরাসী প্রভৃতি সাহিত্যে এ রীতি হয়তো তেমন ক্ষতিকর নয়, অনেক শতাব্দীর চেষ্টায় সাহিত্যের বনিয়াদ সেখানে পাকা। নব্য বাংলা সাহিত্য নিতান্তই নূতন। শিক্ষার প্রসার এখনও সীমাবদ্ধ, লোকের রুচি এখনও নির্ভরযোগ্য নয়, কাজেই সিনেমার মারফতে লোকরঞ্জন চেষ্টা এখনো আশঙ্কার কারণ।

বঙ্কিমচন্দ্রের ৩য় ও ৪র্থ সূত্র একত্র আলোচনা করা যেতে পারে।

> ৩॥ যদি মনে এমন বুঝিতে পারেন যে, লিখিয়া দেশের বা মনুষ্য জাতির কিছু মঙ্গল সাধন করিতে পারেন, অথবা সৌন্দর্য সৃষ্টি করিতে পারেন, তবে অবশ্য লিখিবেন। যাঁহারা অন্য উদ্দেশ্যে লেখেন, তাঁহাদিগকে যাত্রাওয়ালা প্রভৃতি নীচ ব্যবসায়ীদিগের সঙ্গে গণ্য করা যাইতে পারে।
>
> ৪॥ যাহা অসত্য, ধর্মবিরুদ্ধ, পরনিন্দা বা পরপীড়ন বা স্বার্থসাধন যাহার উদ্দেশ্য, যে সকল প্রবন্ধ কখনো হিতকর হইতে পারে না, সুতরাং তাহা একেবারে পরিহার্য। সত্য ও ধর্মই সাহিত্যের উদ্দেশ্য। অন্য উদ্দেশ্যে লেখনী ধারণ মহাপাপ।

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যনীতির আলোচনায় পূর্বোক্ত সূত্র দুটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিশেষ কমলাকান্তের দপ্তর প্রকাশের পর থেকে শেষ

পর্যন্ত প্রায় সমস্ত রচনাই সূত্র দুটির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। প্রথম জীবনের দুর্গেশনন্দিনী বা কপালকুণ্ডলা সূত্রে কথিত সৌন্দর্যসৃষ্টির উদাহরণ। বিশুদ্ধ সৌন্দর্য পরোক্ষে মানুষের হিতকর। কিন্তু পরোক্ষ ক্রিয়ার উপরে নির্ভর না ক'রে বঙ্কিমচন্দ্রে বলেছেন, "লিখিয়া দেশের বা মনুষ্য-জাতির কিছু মঙ্গলসাধন করিতে. পারেন, অথবা সৌন্দর্যসৃষ্টি করিতে পারেন তবে অবশ্য লিখিবেন।" রবীন্দ্রনাথ হলে ও দুইকে ভিন্ন ক'রে দেখাতেন না। এখানে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যনীতির পার্থক্য প্রকট। রবীন্দ্রনাথের মতে সাহিত্য শব্দটি সহিত শব্দজাত, লেখকের সহিত পাঠকের সাহিত্য। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে স+হিত শব্দ থেকে সাহিত্য শব্দজাত, হিতকারিতা সাহিত্যের আদর্শ। শেষ বিচারে এই দুই মতে হয়তো পার্থক্য নেই, সৌন্দর্য ও মঙ্গলে একই শক্তির ভিন্ন প্রকাশ, কারণ "সুন্দরের পাদপীঠতলে যেখানে মঙ্গলদীপ জ্বলে" সেখানেই জীবনের চরিতার্থতা মনে করেন রবীন্দ্রনাথ। তবে এক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র ও দুইকে আলাদা ক'রে দেখিয়েছেন।

কমলাকান্তের দপ্তরেই প্রথম সচেতনভাবে দেশের ও মনুষ্যজাতির মঙ্গল সাধনকে সাহিত্যের আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেছেন লেখক। আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী ও সীতারামে এই নীতির পূর্ণমূর্তি প্রকট। কিন্তু একেবারে জীবনশেষের রাজসিং· ও ইন্দিরাতেও কি এই নীতি বর্তমান? বঙ্কিমচন্দ্র বলবেন অবশ্যই বর্তমান, কেননা, হিন্দুর বাহুবল প্রদর্শনই রাজসিংহ উপন্যাসের লক্ষ্য। কিন্তু ইন্দিরার বেলায়। সেখানে এই নীতির প্রত্যক্ষ রূপ কোথায়। ইন্দিরা নিছক সৌন্দর্যসৃষ্টি। জীবনশেষে এই দুখানি গ্রন্থ পুনর্লিখিত ক'রে তিনি যেন প্রকারান্তে স্বীকার করেছেন—মঙ্গলসাধন ও সৌন্দর্যসৃষ্টি কার্যতঃ আলাদা হলেও বস্তুতঃ আলাদা নয়। বস্তুতঃ আলাদা না হলেও কার্যতঃ আলাদা হয়ে থেকে এই নীতি একটা স্বতোবিরুদ্ধতা বা contradiction সৃষ্টি করেছে বঙ্কিমসাহিত্যে।

বিষবৃক্ষের অভিজ্ঞতায় অমৃত ফলের আশা, এই বিষ চিকিৎসার

মধ্যে স্বতোবিরুদ্ধতা বা contradiction-এর প্রকাশ। নীতি শব্দটাতেই যাঁদের আপত্তি রোহিণী হত্যার দায়ে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারা অনুসারে তাঁরা বঙ্কিমচন্দ্রকে অভিযুক্ত করেছেন। অবৈধ প্রেমের পথিক বলেই নাকি রোহিণী নিহত হয়েছেন। কিন্তু তারা ভুলে যায় যে অবৈধ প্রেমের অপরাধে নয়, অবৈধ প্রেম লঙ্ঘন করবার দোষেই রোহিণীকে মরতে হয়েছে গোবিন্দলালের হাতে। অবৈধ প্রেমেও একটা code of honour আছে, রাসবিহারীর প্রতি রোহিণীর অনুরাগে সেই রেখাটি লঙ্ঘিত হয়েছে। এমন হামেশা হচ্ছে। কাজেই বঙ্কিমকে নীতিবাদী না বলে বাস্তববাদী বলা উচিত। এই ঘটনাকে মঙ্গলসাধনের দৃষ্টান্তরূপে গণ্য করা হবে কিংবা সৌন্দর্য-সৃষ্টির দৃষ্টান্তরূপে গণ্য করা হবে তা নির্ভর করে পাঠকের রুচির উপরে। হয়তো ঘটনাটি স্বতোবিরুদ্ধতার সাময়িক সমাধানের একটি নিদর্শন।

রবীন্দ্রনাথের চোখের বালি, নৌকাডুবি, যোগাযোগ ও দুই বোনের অতৃপ্তিদায়ক উপসংহার তুলনায় অনেক বেশী আপত্তিকর। এসব ক্ষেত্রে স্বতোবিরুদ্ধতা স্বভাবের নিয়মে দুয়ে মিলে এক হয়ে যায় নি, দুটোকে দ্রুত সমাপ্তির তাগিদে বেঁধে এক প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা হয়েছে মাত্র। এসব উপসংহার বীজাকারে সূচনার মধ্যে ছিল না। আনন্দমঠের উপসংহার যাঁরা পছন্দ করেন না তাঁদেরও স্বীকার করতে হবে যে আদিতেই অন্ত নিহিত ছিল।* মনুষ্যজাতির মঙ্গলসাধন ও সৌন্দর্যসৃষ্টির দ্বন্দ্ব উনবিংশ বাংলা সাহিত্যের একটি প্রধান সমস্যা। সে যুগের কোন সাহিত্যিক নিছক সাহিত্যসৃষ্টির আকাঙ্ক্ষায় লেখনী ধারণ করেন নি। একটা sense of destiny বা

* আনন্দমঠের উপসংহারে মহাপুরুষ এসে সত্যানন্দকে নিয়ে গেল, তার এখানকার কাজ শেষ হয়েছে। অচলায়তনের উপসংহারে গুরু এসে আচার্যকে নিয়ে গেল—তার এখানকার কাজ ফুরিয়েছে। এ মিল কি কাকতালীয় না ততোধিক কিছু?

নিয়তির নির্দেশ তাঁদের চালিত করেছিল সাহিত্যসাধনার পথে। তাঁদের কাছে মসী ছিল অসির বিকল্প। এ ব্যাপারটাই একটা মস্ত contradiction কাজেই উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে contradiction আছে আর থাকতে বাধ্য। শুধু বঙ্কিমচন্দ্রকে দোষ দিলে চলবে কেন? এ অভিযোগ থেকে কেউ মুক্ত নন, এমন কি মধুসূদনও নন।

> ৫॥ যাহা লিখিবেন তাহা হঠাৎ ছাপাইবেন না। কিছুকাল ফেলিয়া রাখিবেন। কিছুকলে পরে উহা সংশোধন করিবেন। তাহা হইলে দেখিবেন, প্রবন্ধে অনেক দোষ আছে। কাব্য নাটক উপন্যাস দুই-এক বৎসর ফেলিয়া রাখিয়া তার পর সংশোধন করিলে বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করে। যাহারা সাময়িক সাহিত্যের কার্যে ব্রতী, তাঁহাদের পক্ষে এই নিয়ম-রক্ষাটি ঘটিয়া উঠে না। এজন্য সাময়িক সাহিত্য লেখকের পক্ষে অবনতিকর।
>
> ৬॥ যে বিষয়ে যাহার অধিকার নাই; সে বিষয়ে হস্তক্ষেপণ অকর্তব্য। একটি সোজা কথা, কিন্তু সাময়িক সাহিত্যতে এ নিয়মটি রক্ষিত হয় না।

বঙ্কিমচন্দ্র যখন এ সূত্রগুলি লিখছিলেন সেই প্রায় আশী বছর আগে সাহিত্য ও সাময়িক সাহিত্য পৃথক ছি এবং আজকার তুলনায় দুয়েরই স্রোত মন্থর ছিল। আজ সাহিত্য ও সাময়িক সাহিত্য একান্নবর্তী আর দুয়েরই স্রোত প্রবল। বর্তমানে কোন্‌টি বিশুদ্ধ সাহিত্য আর কোন্‌টি সাময়িক সাহিত্য নির্ণয় করা সহজ নয়। তা ছাড়া দুই আজ বৃহৎ ব্যবসায় পরিণত। আশী বৎসর আগে সাহিত্যের বাজার বলে কিছু ছিল না, সাময়িক সাহিত্যের বাজারের অবস্থা আরও খারাপ ছিল। সাহিত্য ও সাময়িক সাহিত্য তখন অন্ন যোগাত না বলে তার মধ্যে ত্বরা ছিল না। এখন চাহিদার সঙ্গে ত্বরা বেড়েছে, লিখে ফেলে রাখবার বা কলম গুটিয়ে বসে থাকবার সত্যযুগ সাহিত্য-ক্ষেত্র থেকে অপসৃত। কাজেই সূত্র দুটির আগের গুরুত্ব আর নেই। অধিকার

ও অনধিকারের প্রশ্ন সাময়িক সাহিত্যের ক্ষেত্রে ওঠে না বলে বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই স্বীকার করেছেন। তবে সাময়িক সাহিত্য লেখকের পক্ষে অবনতিকর কি না নিশ্চয় করে বলা যায় না। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ দুজনকেই যথেষ্ট পরিমাণ সাময়িক সাহিত্য রচনা করতে হয়েছে। ঐ কাজে সময় না দিতে হলে তাঁরা আরও কিছু রসরচনা লিখতে পারতেন নিঃসন্দেহ। কিন্তু আর একখানি কৃষ্ণকান্তের উইল বা বলাকা রচিত হত কি না সন্দেহ। অপর পক্ষে তাঁদের রচিত সাময়িক সাহিত্য দেশের মতি-গতি নির্ধারণে যে ভূমিকা গ্রহণ করেছে —বিশেষ উপকারের হেতু হয়েছে, দেশের মঙ্গলসাধন করতে সমর্থ হয়েছে—তা পেতাম না। কাজেই তাঁদের ক্ষেত্রে অন্ততঃ সাময়িক সাহিত্য অবনতিকর হয় নি, দেশের পক্ষে উন্নতিকর হয়েছে। তবে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের মত মহারথী কোন নিয়মের বশীভূত নন। স্বল্প শক্তিমানদের জন্য নিয়মের আবশ্যক আছে সত্য কিন্তু যেকালে সাহিত্য ও সাময়িক সাহিত্যের সীমানা লুপ্তপ্রায়,তখন নিয়ম থাকলেই বা তা মেনে চলবার উপায় কোথায় ? উপায় থাকুক বা নাই থাকুক সতর্কবাণী হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্রের কথা মনে রাখলে উপকার ছাড়া অপকার হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

> ৭॥ বিদ্যা প্রকাশের চেষ্টা করিবেন না। বিদ্যা থাকিলে, তাহা আপনিই প্রকাশ পায়, চেষ্টা করিতে হয় না। বিদ্যা প্রকাশের চেষ্টা পাঠকের পক্ষে অতিশয় বিরক্তিকর, এবং রচনার পারিপাট্যের বিশেষ হানিজনক। এখনকার প্রবন্ধে ইংরাজি, সংস্কৃত, ফরাশি, জার্মান কটেশন বড় বেশি দেখিতে পাই। যে ভাষা আপনি জানেন না, পরের গ্রন্থের সাহায্যে সে ভাষা হইতে কদাচ উদ্ধৃত করিবেন না।

মূল ব্যাধি বিদ্যাপ্রকাশ চেষ্টা, উপসর্গ কোটেশন হউক। দেখা যাচ্ছে যে ব্যাধি ও উপসর্গ বঙ্কিমচন্দ্রের সময়েই দেখা দিয়েছিল, এখন লেখকের সংখ্যাবৃদ্ধিতে ব্যাধি মহামারীর আকার ধারণ করেছে।

পাঠককে অজ্ঞ ও অপ্রতিভ প্রতিপন্ন করা কোন কোন লেখকের লেখনীধারণের একমাত্র কার্য বলে মনে হয়। পণ্ডিত ব্যক্তি অপরকে অপণ্ডিত প্রমাণ করতে প্রয়াস পায় না। মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ তিনজনেই পণ্ডিত ছিলেন (প্রতিভাবান তো ছিলেনই) কোটেশন কণ্টক থেকে তাঁদের রচনা বিশেষভাবে মুক্ত। রামেন্দ্রসুন্দর প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন, অনেক দুরূহ বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করেছেন, কিন্তু তাঁর রচনায় কোটেশন কয়টা? বিদ্যার অভাবেই লেখক কোটেশনমুখী হয়ে ওঠে, সে কোটেশনও আবার লেখকের অজ্ঞাত ভাষা থেকে। পাঠকসমাজের ওপরে অবজ্ঞাই এই পণ্ডিতম্মন্যতার কারণ। এখন পাঠকসমাজ যে অনুপাতে বেড়েছে, সেই অনুপাতে বাড়ে নি রুচিমান ও উচ্চশিক্ষাসম্পন্ন পাঠক, ফলে এই রকম চাতুরী সম্ভব হচ্ছে। যোগ্য পাঠক যোগ্য লেখক সৃষ্টির একটি উপায়। সাক্ষরতা ও শিক্ষা এক বস্তু নয়। নূতন নূতন যোজনার তাগিদে সাক্ষরের সংখ্যা বাড়তে পারে, শিক্ষিতের সংখ্যা বৃদ্ধি সময় সাপেক্ষ। নূতন সাক্ষর পাঠককে ফাঁকি দেওয়া সহজ সত্য, কিন্তু অন্যদিকে আবার নূতন সাক্ষর পাঠক টেনে নামিয়ে আনে লেখককে সাহিত্যের উচ্চ আদর্শ থেকে। এই প্রক্রিয়াটি আজ চলছে পৃথিবীব্যাপী। উচ্চমার্গের সাহিত্য সৃষ্টির যুগ পৃথিবী থেকে বুঝি চিরকালের জন্যই চলে গেল। মেকলের উক্তি অপ্রত্যাশিতভাবে সত্য হতে চলেছে।

৮॥ অলঙ্কার প্রয়োগ বা রসিকতার জন্য চেষ্টিত হইবেন না। স্থানে স্থানে অলঙ্কার বা ব্যঙ্গের প্রয়োজন হয় বটে; লেখকের ভাণ্ডারে এ সামগ্রী থাকিলে, প্রয়োজনমতে আপনিই আসিয়া পৌছিবে, ভাণ্ডারে না থাকিলে মাথা কুটিলেও আসিবে না। অসময়ে বা শূন্য ভাণ্ডারে অলঙ্কার প্রয়োগের বা রসিকতার চেষ্টার মত কদর্য আর কিছুই নাই।

৯॥ যেস্থানে অলঙ্কার বা ব্যঙ্গ সুন্দর বলিয়া মনে হইবে, সেই স্থানটি কাটিয়া দিবে, এটি প্রাচীন বিধি। আমি সে কথা

বলি না। কিন্তু আমার পরামর্শ এই যে, সে স্থানটি বন্ধুবর্গকে পুনঃপুনঃ পড়িয়া শুনাইবে। যদি ভাল না হইয়া থাকে, তবে দুই চারি বার পড়িলে লেখকের নিজেরই আর উহা ভাল লাগিবে না—বন্ধুবর্গের নিকট পড়িতে লজ্জা করিবে। তখন উহা কাটিয়া দিবে।

অলঙ্কারের প্রয়োগ কাব্যে অধিক, ব্যঙ্গের প্রয়োগ গদ্যে। এ-ই সাধারণ বিধি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গদ্য সম্বন্ধে এ নিয়ম খাটে না। অলঙ্কার তাঁর গদ্যের সহজাত ঐশ্বর্য (কাব্যের তো বটেই)। রবীন্দ্রনাথের গদ্য রচনার প্রভাবে অলঙ্কারের প্রয়োগ বেড়ে গিয়েছে পরবর্তী কালে; আর অনেক সময়েই তা মুদ্রাদোষের সীমানায় গিয়ে ঠেকেছে। অলঙ্কারাত্মক বাক্য প্রয়োগ রবীন্দ্রনাথের চিন্তার বৈশিষ্ট্য, অপরের পক্ষে তা অনুকরণ মাত্র। এইরূপ অনুকরণের ফল পরবর্তী গদ্যের পক্ষে একটি বিড়ম্বনা। প্রয়োজন স্থলে অলঙ্কার প্রয়োগের আদর্শ রামেন্দ্রসুন্দরের গদ্য, আবার প্রয়োজন স্থলে ব্যঙ্গের প্রয়োগের আদর্শ প্রমথ চৌধুরীর আদর্শ—দুজনেই রবীন্দ্র সমকালীন। তাঁদের গদ্যের কাঠামোর উপরে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব নিঃসন্দেহে আছে কিন্তু স্বাভাবিক ক্ষমতা ও গদ্যধর্ম সম্বন্ধে তত্ত্বদর্শিতার ফলে তাঁরা বিড়ম্বনা বাঁচিয়ে যেতে সমর্থ হয়েছেন। পরবর্তী অনেক লেখকের সে সামর্থ্য নেই, আর সামর্থ্য যে নেই সে বিষয়েও তাঁরা সচেতন নন। বন্ধু-বর্গকে পড়ে শোনাবার পরামর্শ নিষ্ফল কারণ একটি অনুকরণের আব্‌হাওয়ায় বর্ধিত হওয়ার ফলে সকলেরই মাথা একই কুপ্রভাবের ক্ষুরে মুণ্ডিত। আধুনিক বাংলা গদ্যরীতি অলঙ্কারাত্মক অনুকরণে কূপে নিমজ্জিত প্রায়। বঙ্কিমচন্দ্রের পরবর্তী সূত্র যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করছে ঐ সুগভীর কূপের মধ্যে তা পৌঁছতে অক্ষম।

১০॥ সকল অলঙ্কারের শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার সরলতা। যিনি সোজা কথায় আপনার মনের ভাব সহজে পাঠককে বুঝাইতে

পারেন, তিনিই-শ্রেষ্ঠ লেখক। কেননা, লেখার উদ্দেশ্য পাঠককে বুঝান।

তৃতীয় ও চতুর্থ সূত্রের মতই এ সূত্রটির গুরুত্ব। পূর্বোক্ত সূত্র দুটিতে যেমন বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য নীতির সার, এ সূত্রটিতে তেমনি তাঁর সাহিত্য রীতির সার। লেখার উদ্দেশ্য পাঠককে বুঝানো এই পরম সত্যটি অনেক লেখক ভুলে গিয়েছেন, তাঁহাদের রচনা পড়লে মনে হয় লেখার উদ্দেশ্য পাঠককে না বুঝানো। অকারণে দুরূহ সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগ, অপ্রয়োজনে ইংরাজি শব্দ প্রয়োগ (অন্য বিদেশী ভাষার শব্দও বটে) এবং দুরন্বয় এঁদের লেখার বৈশিষ্ট্য। ঠিক এই পন্থাটি ছাড়া তাঁদের ভাব নাকি প্রকাশ পায় না। এই প্রচণ্ড ব্যস্ততার যুগে কার এমন শিরঃপীড়া যে ঐ গোলকধাঁধার রহস্যভেদ করতে যাবে। কিন্তু না, পাঠক আছে, হতে পারে তাদের সংখ্যা আঙুলে গণনীয়, মিষ্টান্ন-প্রত্যাশী ইতরে জনাঃ নাই বুঝল—এই হচ্ছে তাঁদের যুক্তি। অপঠিত মহিমাই নাকি তাঁদের রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য। এখানেও রূপান্তরে রবীন্দ্র-গদ্যের প্রভাবের প্রতিক্রিয়া। কুতুবমিনারের পাশে উৎকট অর্ধসমাপ্ত ও দর্শকবিহীন মহিমায় মণ্ডিত আলাই মিনার যাঁরা দেখেছেন তাঁরা এই গদ্যরীতির প্রকৃত রূপ বুঝতে পারবেন। উভয় স্থলেই অক্ষমতার .ঙ্গে অহম্মন্যতার অপদার্থ মিশ্রণ।

'সকল অলঙ্কারের শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার সরলতা।' এই নীতির সমর্থনে বিদ্যাসাগর থেকে পরশুরাম পর্যন্ত সমস্ত শ্রেষ্ঠ বাঙালী গদ্য লেখকের রচনা উদ্ধৃত করতে পারা যায়। রবীন্দ্রনাথের গদ্য অলঙ্কারাত্মক ও অন্দরের স্বকীয়তায় মণ্ডিত হলেও সরল, একবার পড়লেই ভাবটি পাঠকের মনে গিয়ে পৌঁছয়। কিন্তু হলে কি হয়, আলাই মিনার যে এর উচ্চকণ্ঠ (অর্ধভগ্ন) প্রতিবাদ। এ এক রকম গ্রাম্যতা। বিশ্বমানবতার দোহাই পাড়তে পাড়তে নূতন গ্রাম্যতার অনুসরণ সত্যই উপভোগ্য। তবে সান্ত্বনার বিষয় এই যে প্রসাদগুণ বর্জিত, অসরল গদ্য কখনো স্থায়ী আসন লাভ করে না।

১১॥ কাহারও অনুকরণ করিও না। অনুকরণে দোষগুলি অনুকৃত হয়, গুণগুলি হয় না। অমুক ইংরাজি বা সংস্কৃত বা বাংলা লেখক এইরূপ লিখিয়াছেন, আমিও এরূপ লিখিব, এ কথা কদাপি মনে স্থান দিও না।

অনেক বাঙালী সমালোচকের মতে সাহিত্যের High treason রবীন্দ্রনাথ বা বঙ্কিমচন্দ্রের অনুকরণ। কারো রচনায় রবীন্দ্ররীতির ধ্বনি বা বঙ্কিমীরীতির প্রতিধ্বনি শ্রুত হওয়ামাত্র 'শির লাও' গর্জন করে ওঠেন তাঁরা। তাঁরা নিতান্ত প্রতিক্রিয়াশীল না হলে বুঝতে পারতেন যে ক্রম-বিবর্তনের নীতি সাহিত্যক্ষেত্রেও সক্রিয়। এই নীতির নিয়মেই পূর্ববর্তী শক্তিমান লেখকদের রীতি পরবর্তীদের মধ্যে প্রথমে ধ্বনিরূপে, তার পরে প্রতিধ্বনিরূপে দেখা দিতে দিতে অবশেষে এক সময়ে মিলিয়ে যায়। কিন্তু পরবর্তী লেখকের যদি স্বকীয়তা থাকে তবে ঐ ধ্বনি ও প্রতিধ্বনির সঙ্গেই তা ক্রমে স্পষ্ট ও স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্যরীতির ধ্বনি রবীন্দ্রনাথের বৌঠাকুরাণীর হাটে অত্যন্ত সুস্পষ্ট যদিচ তা কালক্রমে চোখের বালি ও নৌকা-ডুবিতে ক্ষীণ প্রতিধ্বনিতে পর্যবসিত। কিন্তু সেই সঙ্গেই দেখা দিয়েছে রবীন্দ্রনাথের গদ্যরীতির মৌলিকতা। এই স্বাভাবিক বিবর্তনকে অস্বীকার করার অর্থ সাহিত্যের ধারার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াশীল আচরণ। শক্তিহীন বা স্বল্পশক্তি লেখকেরাই এরূপ আচরণ ক'রে থাকেন। এখানেও দেখি রবীন্দ্রপ্রভাবের আর এক রূপান্তর। রবীন্দ্রনাথকে অর্থাৎ বাংলা সাহিত্যের বিবর্তনকে অস্বীকার করবার সঙ্কল্পে তাঁরা দুরন্বয়ের, দুর্বোধ্যতার ও সর্বপ্রকার দুরূহতার নাগপাশে নিজেদের পিষ্ট করতে প্রস্তুত। কিন্তু তাই বলে তাঁরা অনুকরণ করেন না এমন মনে করলে ভুল হবে। রবীন্দ্রনাথ বা বঙ্কিমচন্দ্রের অনুকরণ সহজেই ধরা পড়ে। তাই তাঁরা স্বল্পখ্যাত ইংরাজি লেখকদের বা স্বল্পতরখ্যাত ফরাসী বা জার্মান লেখকদের পক্ষপুটে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ধরা পড়বার আশঙ্কা কম, বিশেষ, "বিদেশী রাজার ছেলে লজ্জা কি বা তারে।"

১২॥ যে কথার প্রমাণ দিতে পারিবে না, তাহা লিখিও না। প্রমাণগুলি প্রযুক্ত করা সকল সময়ে প্রয়োজন হয় না, কিন্তু হাতে থাকা চাই।

দর্শন, ইতিহাস ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই এ সূত্রটির প্রযোজ্যতা অধিক, তবে সাহিত্য-ক্ষেত্রে যে একেবারে নেই তা নয়। প্রবন্ধ-লেখক, সমালোচক ও জীবনীকারগণের এ সূত্রটি ভুললে চলবে না। ধূম দেখলে বহ্নি অনুমান করা অসঙ্গত নয় কিন্তু ঐ গিরিশিখরে ওটা কি, ধূম না কুয়াশা আগে ঠিক ক'রে নিয়ে তবে অনুমান করা আবশ্যক। প্রমাণহীন সদম্ভ ঘোষণায় সত্যের পিলে চমকে উঠলেও মিথ্যা কখনো সত্য হয় না। এখানেও সেই অহম্মন্যতার আর এক লীলা।

এই হল গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র বিরচিত বারোটি সূত্র। রচনাকালে সূত্রগুলির যেমন প্রযোজ্যতা ছিল আজও তেমনি আছে, বরঞ্চ ৩য়, ৪র্থ, ৬ষ্ঠ, ১০ম ও ১১শ সূত্রের প্রয়োজন ও প্রযোজ্যতা বেড়েছে। সেদিনকার লেখক সূত্রগুলিকে কি দৃষ্টিতে দেখেছিল জানি না, তবে আজকার একজন লেখক কি দৃষ্টিতে দেখে তাই বিবৃত করলাম। সর্বশেষে বঙ্কিমচন্দ্র যে আশা পোষণ ক'রে সূত্রগুলি সমাপ্ত করেছিলেন তা এখানে উদ্ধৃত ক'রে এই ভাষ্যের পরিসমাপ্তি করলাম।

"বাঙ্গালা সাহিত্য, বাঙালীর ভরসা। এই নিয়মগুলি বাঙ্গালা লেখকদিগের দ্বারা রক্ষিত হইলে, বাংলা সাহিত্যের উন্নতি বেগে হইতে থাকিবে।"

পরশুরামের রসরচনা

পুরাকালে পরশুরাম এসেছিলেন মানুষ মারতে, আমাদের কালে পরশুরামের সেরকম কোন মারাত্মক উদ্দেশ্য ছিল না। তিনি মানুষকে হাসিয়ে গিয়েছেন। এই হাসির প্রকৃতি কি তা না-হয় পরে বিচার করা যাবে, তবে আপাততঃ নির্বিচারে বলা যায় যে পরশুরাম হাসির গল্প লিখে গিয়েছেন,—সে সব গল্পে অন্য উপাদান থাকলেও, হাসিটাই মূল উপাদান।` হাসির গল্পলেখক মাত্রেই হাসিখুশি থাকবে, আমুদে হবে এরকম ধারণা অনেকের আছে, কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যে হাসির রচনা যারা লিখে গিয়েছেন তাঁরা সকলেই গম্ভীর প্রকৃতির লোক। ত্রৈলোক্যনাথ, প্রভাতকুমার, পরশুরাম সকলেরই প্রকৃতি গম্ভীর। প্রাচীনদের মধ্যে মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র গম্ভীর প্রকৃতির ছিলেন বলেই বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয়, কারণ তাঁদের ছু'জনেরই ছুঃখের জীবন। এত ছুঃখের মধ্যে এত হাসিকে কেমন করে তাঁরা রক্ষা করেছেন সে এক বিস্ময়। শমীবৃক্ষ আপন অভ্যন্তরে অগ্নিকে কিভাবে রক্ষা করে? ব্যতিক্রম বোধ করি দীনবন্ধু। দীনবন্ধু আমোদপ্রিয় মজলিসী ব্যক্তি ছিলেন। আবার তিনিও ব্যতিক্রম কিনা সন্দেহ করবার কারণ আছে, যেহেতু খুব সম্ভব একই সঙ্গে ছুটি বিপরীত ব্যক্তিত্বকে অন্তরে তিনি পোষণ করতেন। একজন সামাজিক ব্যক্তি, অপরজন সাহিত্যিক। তবু না হয় স্বীকার করা গেল তিনি ব্যতিক্রম।

প্রকৃত হাস্যরসের মধ্যে একটা গাম্ভীর্য আছে, প্রকৃত হাস্যরস আর যাই হোক তরল নয়। কালিদাস যে কৈলাস পর্বতকে ত্র্যম্বকের অট্টহাসির সঙ্গে তুলনা করেছেন সে এই জন্যে। প্রকৃত হাস্যরস করুণার রূপান্তর বলেই তা গহন গম্ভীর। এ কথা সবাই বোঝে না বলেই হাসির গল্পের লেখককে দেখতে গিয়ে আমুদে লোককে

প্রত্যাশা করে। পরশুরামকে দেখতে গিয়ে অনেকেরই সন্দেহ হয়েছে এ কেমন ধারা হলো, ইনি যে গম্ভীর রাশভারী লোক।

অনুরূপা দেবীর এইরকম আশাভঙ্গ হয়েছিল। "আমার বিশ্বাস ছিল 'পরশুরাম', আমার পরম স্নেহাস্পদ 'বিশু'র স্বামী, তাঁর লেখার মতই খুব হাসিখুশিতে ভরা অত্যন্ত সামাজিক, চালাক, চটপটে একটি আমুদে লোক হবেন। কিন্তু ওঁকে দেখে মনে মনে ভাবলাম—ইনি কি করে ওই সব অপূর্ব হাস্যরসের আধার হলেন? এ যেন 'সরষার মধ্যে ত্যাল'। মজঃফরপুর থাকতে আমার একান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু, আমার স্বামীর সহপাঠী সাবজজ ব্রজেন ঘোষের স্ত্রী পঙ্কজিনী ঘোষের মারফত তাঁর ছোট বোন (কনিষ্ঠা নয়) বিশুর সঙ্গে পরিচয় ঘটেছিল, তার পত্রে। তার স্বামীর কথা, তাঁর আঁকা বিশুরই চিত্র (অসুখের পূর্বে, তৎপরে ইত্যাদি) ও নানা সরস মন্তব্য দেখেশুনে ওই রকম ধারণাটাই বোধ হয় পাকা হয়ে গেছলো। যা হোক, পরে সে বিষয়ে সামঞ্জস্য করবার সুযোগও যথেষ্ট রূপেই আমি পেয়েছিলাম। তাঁর বেঙ্গল কেমিকেলের গৃহে, পরে বহু-বহুবার তাঁর নিজগৃহেও যাতায়াত করে তাঁর লেখার মতই তাঁর গভীর সৌজন্যপূর্ণ গাম্ভীর্যময় সুমিষ্ট ব্যবহারে তাঁর অন্তরের কোন্ গভীরে যে তার অন্তঃসলিল সহজাত হাস্যরস প্রবাহিত ছিল তার সম্যক সন্ধান লাভ করেছি। আর দেখেছি তাঁর ধ্যানমগ্ন শোকগম্ভীর সে রূপটুকু। বাস্তবিক একাধারে এমন শান্তসমাহিত এবং স্নিগ্ধসরস চরিত্র সংসারে বড় কম দেখা যায়।" (কথাসাহিত্য: রাজশেখর বসু সংবর্ধনা সংখ্যা: শ্রাবণ, ১৩৬০)।

কবিশেখর কালিদাস রায় মহাশয়ও আমাদের মন্তব্যের সমর্থক। "রাজশেখরবাবু রাশি রাশি পুস্তক রচনা করেন নাই, মাসিক পত্রিকায় ক্বচিৎ কখনও তাঁর লেখা দেখা যায়। জীবিকার জন্য তিনি লেখেন নাই, বাণীকে বানরী করিয়া সভায় সভায় তিনি নাচান নাই, সাহিত্যকে পণ্য করিয়া তিনি গ্রন্থবণিক সাজেন নাই, দেশের

সভা-সমিতি, সমাজের নানা অনুষ্ঠানের নিমন্ত্রণ-সভা সাহিত্যিক বৈঠক, গোষ্ঠী, মজলিস কোথাও তাঁহাকে দেখা যায় নাই। এই ভাবে তিনি সাহিত্যিক আভিজাত্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চলিয়াছেন।

তাঁহাকে 'রাজশেখর দাদা' বলিয়া কেহ আহ্বান করিতে সাহসী হন নাই। প্রগল্‌ভতা, চাপল্য বা ধৃষ্টতা দূর হইতে তাঁহাকে নমস্কার করিয়া চলিয়া যায়। তিনি কাহারও স্তব প্রশস্তি গান করেন নাই, ভূমিকা, পরিচায়িকা, প্রশংসাপত্র ইত্যাদির পুটে প্রসাদ বিতরণ করেন নাই, অযোগ্যকে মিথ্যা স্তোকবাক্যে আশ্বস্ত করেন নাই, আচার্য সাজিয়া সহস্রের প্রথাগত প্রণিপাত ও মুদ্রিত অর্ঘ্য গ্রহণ করেন নাই।

তাঁহার জীবনে যেমন একটা বিবিক্ততা ও বিচ্ছিত্তি দেখা যায়— রচনাতেও তেমনি আত্মনিগূহন ও প্রথম শ্রেণীর আর্টিস্টের পক্ষে যে **detachment ও impersonality** স্বাভাবিক তাহাই লক্ষিত হয়। রাজশেখরবাবু নিজে না হাসিয়া হাসান, নিজে না কাঁদিয়া কাঁদান, নিজে অন্তরালে থাকিয়া ঐন্দ্রজালিক মায়া বিস্তার করেন—এ বিষয়ে তিনি বিধাতারই মন্ত্রশিষ্য।" (কথাসাহিত্য : রাজশেখর বসু সংবর্ধনা সংখ্যা : শ্রাবণ, ১৩৬০)।

এই মন্তব্যের আর একজন সাক্ষী বর্তমান লেখক। সে ১৯৩৪ সালের কথা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পরিভাষা কমিটি গঠন করেছে, অবৈতনিক সম্পাদক অধ্যাপক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য, বেতনভুক্‌ সহকারী সম্পাদক বর্তমান লেখক, সভাপতি রাজশেখর বসু। প্রথম দিনের অধিবেশনে আগ্রহভরে সভাপতির অপেক্ষায় আছি, আগে কখনও তাঁকে দেখি নি। নির্দিষ্ট সময়ে সৌম্যমূর্তি প্রৌঢ় ভদ্রলোক প্রবেশ করলেন, গায়ে সাদা খদ্দরের গলাবন্ধ কোট, পরনে খদ্দরের ধুতি (এ পোশাক ছাড়া অন্য পোশাকে তাঁকে কখনও দেখেছি বলে মনে পড়ে না), হাতে কাগজের ফাইল, গম্ভীর অথচ প্রসন্ন মুখ। সে প্রসন্নতা কতকটা স্বভাবের, কতকটা প্রতিভার। ঐ প্রসন্নতাটুকু না

থাকলে তাঁকে যে কোন বড় একটা অফিসের অভিজ্ঞ বড়বাবু বলে মনে হওয়া অসম্ভব নয়। ক্রমে টেবিলের চারধারের চেয়ারগুলি পূর্ণ হয়ে উঠল, সকলেই গুণী জ্ঞানী ব্যক্তি, অধিকাংশই নামজাদা অধ্যাপক। বিজ্ঞানের নানা শাখার পরিভাষা সংকলিত হচ্ছে, নান শাখায় অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ আছেন, সভাপতির সব শাখাতেই সমান অধিকার। বাঙালীর সভার কাজ চালানো সহজ নহে, কাজের কথাকে ছাপিযে ওঠে অকাজের কথা। অকাজের কথায় সভাপতি যোগ দেন না, চুপ করে শোনেন, কিছুক্ষণ পরে কথার মোড় ঘুরিয়ে কাজের কথায় নিয়ে এসে ফেলেন। কোন একটা বিষয়ে কতজনে কতরকম মন্তব্য করছেন সভাপতি নীরব শ্রোতা, সকলের সব মন্তব্য শেষ হলে ছুটি একটি ক্ষুদ্র কথায়—শিখা জ্বেলে দিলেন তিনি। সমস্ত পরিষ্কার হয়ে গেল। এই সভা দীর্ঘকাল চলেছিল। দীর্ঘকাল তাঁকে টেবিলের অন্য প্রান্ত থেকে দেখবার সুযোগ পেয়েছি। কখনও কখনও সভার অধিবেশন বসেছে তাঁর সুকিয়া স্ট্রীটের ভাড়া বাড়িতে। বস্তুতঃ সভা চালাতে এমন যোগ্য সভাপতি আমার চোখে পড়ে নি। সভাপতির মধ্যে কোনদিন গ'ড্ডলিকা'র লেখককে দেখতে পাই নি, বড় জোর দেখতে পেয়েছি বেঙ্গল কেমিকেলের অভিজ্ঞ ম্যানেজারকে। ব্যক্তিত্বের শক্তিতে তিনি রাজশেখর বসু। পরশুরামকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কোঠায় রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছেন। এই স্বাতন্ত্র্যের ভাব অপর একজন ব্যক্তিও লক্ষ্য করেছেন। "যখন তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছে সেই সময় একদিন আমায Bengal Chemical-এর আপিসে—যে আপিসের তিনি সে সময় Manager ছিলেন—কার্যবশতঃ দেখা করতে যেতে হয়েছিল। কাজের কথা হয়ে যাবার পর আমি—যেমন আমাদের বেশীর ভাগ লোকেরই অভ্যাস—তাঁকে ছু-একটা বাড়ির খবরের কথা জিজ্ঞেস করেছিলুম। কিছুমাত্র দ্বিধা না করে তিনি তখনই বলে দিলেন—ও সব কথা ত আপিসের নয়—আফিসের সময় নষ্ট না করে বাড়িতে জিজ্ঞেস করবেন—এই বলে

তিনি নিজের কাজে মন দিলেন। তখন আমার বয়স অনেক কম ছিল, তাঁর কাছ থেকে এই শিক্ষা তখন পেয়েছিলুম যে, আপিস আপিসই, বাড়ি নয়—কর্তব্যের সময় কর্তব্য করে যাওয়াই সঙ্গত; অন্য কাজে বা কথায় সময় নষ্ট না করাই উচিত। (মেজদা—শ্রীসুহৃৎচন্দ্র মিত্র। কথাসাহিত্য: রাজশেখর বসু সংবর্ধনা সংখ্যা: শ্রাবণ, ১৩৬০)।

কয়েক বৎসর পরে কাজ শেষ হয়ে গেলে, পরিভাষা কমিটি উঠে গেল, পরিভাষা কমিটির সিদ্ধান্তগুলি এখন 'চলন্তিকা' অভিধানের পরিশিষ্টে স্থান পেয়েছে। তখন তিনি বকুলবাগান রোডে বাড়ি তৈরী করে উঠে গিয়েছেন। সে বাড়িতে অনেকবার গিয়েছি, কখনও দরকারে অধিকাংশ সময়েই অদরকারে। যেতেই প্রথম প্রশ্ন করেছেন, চা-না কফি? তাঁর সমাদরের মধ্যে আড়ম্বর ছিল না, তবে সহৃদয়তার কখনও অভাব দেখি নি। সেখানেও দেখেছি দুটি একটি কথায় আলোচনার জট ছাড়াতে তাঁর স্বাভাবিক নিপুণতা। আমরা হয়তো অনেক কথা বলবার মুহূর্তে তার মধ্যে থেকে আলগোছে আসল কথাটি তুলে নিলেন। এও তাঁর শিক্ষা ও স্বভাবের ফল। তাঁর বাড়িটিও তাঁর গায়ে খদ্দরের কোটের মত অনাড়ম্বর প্রশস্ত, বিলাসিতা নেই অথচ সম্পূর্ণ বাসোপযোগী। আর একটা লক্ষ্য করবার জিনিস তাঁর গায়ের কোটটি, সেটা প্রথমেই চোখে পড়েছিল পরিভাষা কমিটির অধিবেশনে। নিপুণ জাদুকর যেমন পোশাকের নানা অন্ধিসন্ধি থেকে বিচিত্র বস্তু টেনে বের করেন, তেমনি বের করতেন তিনি কোটের পকেট থেকে। অনেকগুলি পকেট, কোনোটা চশমার খাপ রাখবার, কোনোটা ফাউন্টেন পেন রাখবার, কোনোটা থেকে বা বের হতো পেন্সিল কাটা ছুরি ও রবার, প্রায় তাঁর 'অটমেটিক শ্রীদুর্গাগ্রাফ' আর কি! মোটের উপরে রাজশেখর বসু সজ্জন, অমায়িক, গম্ভীর প্রকৃতির ব্যক্তি, প্রকৃত হাস্যরসিকের যেমন হওয়া উচিত তার চেয়ে কম বা বেশী নন। এ পর্যন্ত যা জানা

গেল, তাতে আর দশজন হাস্যরসিক সাহিত্যিকের সঙ্গে তাঁর মিল আছে। এবারে অমিলটা কোথায় দেখা যাক। মিলে-অমিলে মিলিয়ে চেহারাটা স্পষ্ট হয়ে উঠবে আশা করা যায়।

॥ ২ ॥

কোনো লেখকই আকাশের শূন্যতায় জন্মগ্রহণ করে না, তারা ছোট বড় মাঝারি যে দরেরই লেখক হোক না কেন। লেখকের সামাজিক পরিবেশ, দেশ ও কালের প্রভাব, পারিবারিক প্রবণতা প্রভৃতি লেখককে অজ্ঞাতে নিয়ন্ত্রিত করে, এখানে লেখক মানে তার শক্তির বিশেষ রূপটি। এখন কোন লেখককে সম্যকভাবে বুঝতে হলে এই সমস্তর সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে কিংবা এই সমস্তর মানচিত্রের উপরে যথাস্থানে তাকে প্রতিষ্ঠিত ক'রে বুঝতে হবে। 'কবিকে পাবে না কবির জীবনচরিতে', একথা সর্বাংশে গ্রাহ্য নহে ; জীবনচরিত যদি যথার্থ হয় তবে অবশ্যই কবিকে তাতে পাওয়া যাবে। আরও একটু সূক্ষ্মভাবে বিচার করলে বলতে হবে যে লেখকের শৈশব বা বড়জোর বাল্যকালের কয়েক বছর তাকে গঠন ক'রে তোলে। 'Child is the father of the man' এ আদৌ কবির অত্যুক্তি নয়। আরব্য-উপন্যাসে দেখা গিয়েছে যে, সিন্ধবাদ এক বৃদ্ধকে কাঁধে নিয়ে চলতে বাধ্য হয়েছে, মানুষের বেলায় ঠিক তার উল্টো। প্রত্যেক মানুষ তার শৈশবকে কাঁধে নিয়ে আমৃত্যু চলছে। লেখকের পক্ষে একথা আরও সত্য, কেননা লেখক যে জীবনরহস্যের সন্ধানী তার চাবিকাঠি ঐ শিশুটার হাতে।

রবীন্দ্রনাথের 'শ্যামের গণ্ডি' তেতলায় বসে দুপুরের আকাশে চিলের ডাক শ্রবণ, পেনেটির বাগানে প্রথম গঙ্গাদর্শন প্রভৃতি আদৌ অকিঞ্চিৎকর ঘটনা নয়। পারিবারিক বিগ্রহের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের ভক্তি, কিংবা সাগরদাঁড়ি গ্রামে নৈসর্গিক দৃশ্যাবলী মধুসূদনের মনে

যে সূক্ষ্ম প্রভাব বিস্তার করেছিল, তার ক্রিয়া শেষপর্যন্ত সক্রিয় ছিল। মানুষ দশ বারো বছর বয়স পর্যন্ত যা গ্রহণ করে তাই তার যথার্থ পুঁজি, তারপরে অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সঙ্গে নূতন সঞ্চয় যতই হোক, পুঁজিতে যতই মুনাফা দেখানো যাক না কেন, মূলধনের পরিমাণ বাড়ে না। এ সত্য রাজশেখর বসু সম্বন্ধে ষোলআনা প্রযোজ্য। কবিকে জানতে হলে তার জীবনের ভিতর দিয়ে জানতে হবে, কাজেই রাজশেখর বসুর সাহিত্য-বিচারের আগে তাঁর জীবন-বিচার আবশ্যক।

রাজশেখরবাবু নিজের খ্যাতি সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন, স্মৃতিকথা জীবনচরিত বা কোনরকম খসড়া লিখবার কথা ভাবেন নি। অধিকাংশ লেখক খ্যাতির প্রদীপের শিখাটিকে নিজেই উস্কে দেয়, কেউ বা প্রত্যক্ষে কেউ বা গোপনে, রাজশেখরবাবু কিছুই করেন নি। তবে সৌভাগ্যবশতঃ তাঁর স্বজন ও অনুরাগীগণ কিছু করেছেন বটে। এখানে আমরা সেই সব রচনার সুযোগ গ্রহণ করলাম। উদ্ধৃতিগুলি কিছু দীর্ঘ হওয়া সত্ত্বেও ভীত হই নি, কারণ গ্রন্থাবলীর সঙ্গে জীবনের বিস্তৃত পরিচয় সংযুক্ত থাকা নিতান্ত স্বাভাবিক।

প্রথম উদ্ধৃতিতে রাজশেখর বসুর বাল্যকালের কিছু বিবরণ পাওয়া যাবে।

“দারভাঙ্গা ঘুরে এসে একবার চন্দ্রশেখর (পিতা) বললেন, ‘ফটিকের নাম ঠিক হয়ে গেছে।’ মহারাজ (লক্ষ্মীশ্বর সিং, শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ) জিজ্ঞাসা করলেন, ‘তোমার দ্বিতীয় ছেলের নামও একটা শেখর হবে নাকি ? কি শেখর হবে ?’ আমি বললাম, ‘ইওর হাইনেস, যখন তাকে আশীর্বাদ করছেন, তখন আপনিই তার শিরোমাল্য,— আমি আপনার সামনে তার নামকরণ করলাম রাজশেখর।’ দারভাঙ্গার রাজা যার শিরে আছেন,—রাজা মহেন্দ্রপালের সভাকবি থেকে এ নাম দেওয়া হয় নি।

মা যখন তার হাতে খেল্‌না দিতেন, টিনের এঞ্জিন, রবারের বাঁশি,

স্প্রিং-এর লাট্টু, এক ঘণ্টার মধ্যেই রাজশেখর লোহা, পাথর ও হাতুড়ি দিয়া ভেঙে দেখ্‌তো ভেতরে কি আছে,—কেন বাজে ?—কেন ঘোরে ?

আবার যখন কলকাতা থেকে স্প্রিং-এর নূতন এঞ্জিন আসতো, মা রাজশেখরের হাতে দেবার সময় বলতেন. দেখিস্ যেন ভাঙিস না। অমনি চার বছরের ছেলের মুখ অভিমানে গম্ভীর হয়ে গেল,—খেলনা নেবে না! তারপর মা বললেন, 'এই নে যা খুশি কর!' তখন নিয়ে খানিকক্ষণ চালিয়ে রাজশেখর এনজিনটার মুণ্ডপাত করতো।

রাজশেখর আরো বড় হলে কলকাতা থেকে একটা আড়াই টাকা দিয়ে এনজিন কিনে এনেছে। তাতে ইসপিরিট দিয়ে চালাবার জন্য আমাদিগকে সব ডাকলো। সোঁ সোঁ হিস্ হিস্ করচে ষ্টীম কিন্তু এনজিন চলছে না। সায়েনটিফিক মেকানিক্যাল ব্রেন বিপদ ঘটবে বুঝে নিলে,—চিৎকার করে বললে, 'দাদা পালাও!' সকলে পালিয়ে অন্য ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলাম। দড়াম করে বিকট আওয়াজে আড়াই টাকার বয়লার ফাটলো। সকলেই চিন্তিত,—কর্ড মেলের বয়লার ফাটে যদি ?

রাজশেখরের বয়স যখন চার তখন সে ফুলস্টপ দিতে শিখলো। তুজন লোক একটা বড় কাগজ ধরে দাঁড়িয়ে থাকতো আর পায়জামা চায়না কোট পরা রাজশেখর একটি পেনসিল নিয়ে ছুটে এসে কাগজটা ফুটো করে পেনসিল ভেঙে দিতো। এই তার হাতেখড়ি। পকেটে অটোমেটিক পেনসিল, হাতে লোহার স্ট্র্যাপ, কখনও বা কাঠের 'সোঁটা'।

যখন দারভাঙ্গায় এলাম তার বয়স তখন সাত আন্দাজ। আমি লুকিয়ে বাবার বাক্স থকে 'বেগম' সিগারেট চুরি করে খাই। রাজশেখর যখন আর একটু বড় হলো বললাম, 'ওরে ফটিক, একটা সিগারেট টান দিকি, এতে ভারি মজা!' রাজশেখর একটু টেনে ফেলে দিলে।

বুড়ো বয়সে যখন দিল্লীতে অপারেশন হল বেচারী যন্ত্রণায় ছটফট করচে। ডাক্তার সন্তোষকুমার সেন পেশেণ্টকে অন্যমনস্ক করবার জন্যে বললেন, 'সিগারেট খান একটা।' পেশেণ্ট বললে, 'খাই না।' 'কখনও খান নি?' রাজশেখর উত্তর দিল, 'আমার দাদা একবার লুকিয়ে খাইয়েছিল ছেলেবেলায়।' ডাঃ সেন বললেন, '**You ought to have continued it!**' এবং পেশেণ্ট ও ডাক্তার হেসে উঠলেন। যাঁরা বলেন, রাজশেখর হাসে না, তাঁরা দেখবেন রোগ-যন্ত্রণাতেও কি রকম মজা করবার ঝোক। আট বছর বয়সে মাছ মাংস ঘৃণায় ত্যাগ করলো। লোকে বলল, রাজশেখর বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হবে। ইঁদুর কলে পড়লে ছেড়ে দিত, মারতো না।" (রাজশেখরের ছেলেবেলা : শশিশেখর বসু : শারদীয় যুগান্তর)।

দ্বিতীয় উদ্ধৃতিতে বাল্যকালের বিবরণ কিছু থাকলেও বেশি ক'রে আছে কলকাতায় তাঁর কলেজ জীবনের কথা এবং চাকুরী জীবনের প্রারম্ভের বিবরণ।

"১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই মার্চ মঙ্গলবার বর্ধমান জেলায় শক্তিগড়ের সন্নিকটস্থ বামুনপাড়া গ্রামে তাঁর জন্ম হয়। বামুনপাড়া হচ্ছে রাজশেখরের মামার বাড়ি। আর পৈতৃক নিবাস নদীয়া জেলায় কৃষ্ণ-নগরের নিকটবর্তী উলা বীরনগর।

চন্দ্রশেখর বসুর চার পুত্র : শশিশেখর, রাজশেখর, কৃষ্ণশেখর, গিরীন্দ্রশেখর। চন্দ্রশেখররা মহিমনগর সমাজভুক্ত বড়ানিবাসী কনিষ্ঠ ধবু বসুর সন্তান। চন্দ্রশেখরের বৃদ্ধপ্রপিতামহ রামসন্তোষ বসু পলাশী যুদ্ধের পঞ্চাশ বর্ষ পূর্বে উলার মুস্তোফী বাটীতে বিবাহ করেন।

রাজশেখরের পিতা চন্দ্রশেখর সামান্য অবস্থায় জীবনসংগ্রাম শুরু করেন। তবে তাঁর যোগ্যতার গুণে দ্রুত উন্নতির মধ্য দিয়া আত্ম-প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হন। তিনি যখন যশোহর জেলায় সামান্য একজন ডাক বিভাগের কর্মচারী, সেই সময়ে নীলকর সাহেবদের অত্যাচার

সম্পর্কে অনুসন্ধান ক'রে কলকাতায় যে রিপোর্ট দাখিল করেছিলেন, তারই ওপর ভিত্তি ক'রে কলকাতায় ইণ্ডিগো কমিশনের তদন্ত কাজ চলে।

চন্দ্রশেখর সাহিত্য এবং দর্শনশাস্ত্রে বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের তত্ত্ববোধিনী সভার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যোগাযোগ বজায় রাখতেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেনও। তাঁর রচিত বেদান্তপ্রবেশ, বেদান্তদর্শন, সৃষ্টি, অধিকার-তত্ত্ব, প্রলয়তত্ত্ব প্রভৃতি গ্রন্থ সেকালে খ্যাতিলাভ করেছিল।

পরবর্তীকালে চন্দ্রশেখর দ্বারভাঙ্গার মহারাজার ম্যানেজার পদে বহাল হয়ে দীর্ঘকাল বাংলার বাইরে অতিবাহিত করেন। রাজশেখরের বাল্যকাল পিতার সঙ্গে বাংলার বাইরেই কেটেছে। প্রথম সাত বৎসর তিনি মুঙ্গের জেলার খড়্গপুরে কাটান। তারপর ১৮৮৮ থেকে ১৮৯৫ পর্যন্ত দ্বারভাঙ্গার রাজ স্কুলে পড়ে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। দ্বারভাঙ্গার স্কুলে রাজশেখরই তখন একমাত্র বাঙালী ছাত্র ছিলেন। বাল্যকাল থেকেই তাঁর পিতার নিয়মনিষ্ঠা প্রভৃতি সদ্‌গুণের দ্বারা রাজশেখর এবং তাঁর ভ্রাতৃবর্গ প্রভাবান্বিত হন। চন্দ্রশেখর নিজে ছেলেদের হস্তলিপি, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন তার দিকে নজর রাখতেন। পরে বড় হয়েও তাঁরা বাল্যকালের ভিত্তিপত্তনকে অগ্রাহ্য করেন নি। ব্যক্তিজীবনের ক্ষেত্রেও তাঁরা সেই ধারা বহন ক'রে চলেছেন। বাংলাদেশের বেমক্কা চরিত্রের সঙ্গে এদিক দিয়ে তাঁরা আশ্চর্য ব্যতিক্রম।

১৮৯৫-৯৭ খ্রীষ্টাব্দে রাজশেখর পাটনা কলেজে ফার্স্ট আর্টস পড়েন। এই সময়ে রাজেন্দ্রপ্রসাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহেন্দ্রপ্রসাদ তাঁর সহপাঠী ছিলেন। পাটনা কলেজে তাঁর সঙ্গে আরও জন-দশেক বাঙালী ছাত্র পড়তেন। সে মহলে সাহিত্য-আলোচনা হত, তবে তা তেমন দানা বেঁধে উঠতে পারে নি। বাঙালী মন তখনও হেম-

মধু-বঙ্কিমের প্রভাব-প্রতিপত্তির আওতায় চলেছিল। রবীন্দ্রনাথের কবিখ্যাতি হয়েছে, তবে সে রকম প্রকট হয় নি।

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে রাজশেখর পাটনার পর্ব চুকিয়ে কলকাতায় বি. এ. পড়বার জন্যে এলেন, প্রেসিডেন্সী কলেজের বিজ্ঞান শাখায় ভর্তি হলেন। এই বছরই তাঁর বিবাহ হয়। তাঁর পত্নী মৃণালিনী ছিলেন শ্যামাচরণ দে'র পৌত্রী রাজশেখর ও মৃণালিনীর সন্তান বলতে একমাত্র কন্যা প্রতিমা।

প্রেসিডেন্সী কলেজে রাজশেখর যখন পড়েন সে সময় শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষও পড়তেন, তবে হেমেন্দ্রবাবু আর্টসের ছাত্র ছিলেন। রাজশেখরের সতীর্থদের মধ্যে শরৎচন্দ্র দত্ত পরবর্তীকালে জার্মেনী থেকে বিশেষ শিক্ষা লাভ ক'রে দেশে ফিরে এ্যাডেয়ার ডাট্ নামে বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। এ ছাড়া আর্ট প্রেসের নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এবং নরেন্দ্রনাথ শেঠও তাঁর সহপাঠীদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর কাছে রাজশেখর সামান্য কিছুদিন বি এ-তে পড়েছেন। অনেকের ধারণা আছে যে, তিনি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের ছাত্র, এ ধারণা ভুল। অবশ্য পরবর্তী জীবনে প্রফুল্লচন্দ্রের সাহচর্যে রাজশেখর উপকৃত হয়েছিলেন, তবে সেটা কর্মজীবনে, ছাত্রজীবনে নয়।

১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কেমিস্ট্রি এবং ফিজিক্সে দ্বিতীয় শ্রেণীর অনার্স নিয়ে বি. এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এর একবছর পরে অর্থাৎ ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে রসায়নশাস্ত্রে প্রথম স্থান অধিকার ক'রে রাজশেখর এম এ পরীক্ষায় সগৌরবে উত্তীর্ণ হলেন।

পাটনা এবং কলকাতায় থাকবার সময়েও দ্বারভাঙ্গার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ অব্যাহত ছিল।

এম এ পাস করার দু'বছর পরে তিনি আইন অধ্যয়ন সমাপ্ত ক'রে বি. এল. পরীক্ষাটিও পাস ক'রে ফেললেন। এরপর স্বভাবতই

হাইকোর্টে আইন ব্যবসায়ের উদ্যোগ করবার কথা। কিন্তু মাত্র তিনদিনেই আদালতে পসার জমাবার উদ্যমে জলাঞ্জলি দিয়ে বসলেন। আইন ব্যবসায়ীর খোলস চাপকানগুলি বিলিয়ে দিয়ে দায়মুক্ত হয়ে তিনি স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন।

রাজশেখর প্রকৃতিগতভাবেই সৎ এবং ভদ্র। শুধু একথা বললেও সম্পূর্ণ বলা হয় না। তিনি সংযত শান্ত এবং অন্তর্মুখী মানুষ। তাঁকে দিয়ে গবেষণাদির চিন্তাপ্রধান কাজই ভাল হতে পারে, এ কথা তিনি নিজেও বেশ বুঝেছিলেন।

১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল এবং রাজশেখর বেঙ্গল কেমিকেল ওয়ার্কস-এ রাসায়নিকের পদে বহাল হলেন। তখন সারকুলার রোডে বেঙ্গল কেমিকেলের কার্যালয় ছিল। সারকুলার রোড থেকে কার্যালয় স্থানান্তরিত হয়ে নয় বৎসর অ্যালবার্ট বিল্ডিংস-এ ছিল। বর্তমান বেঙ্গল কেমিকেলের আপিস চিত্তরঞ্জন এভেন্যুতে অবস্থিত। প্রথমে রাজশেখর কিছুকাল থাকেন বেচু চাটুজ্যে স্ট্রীটের ভাড়া-বাড়িতে, তারপর পার্শীবাগানের পৈতৃক গৃহে অবস্থান করেন। কাজে ব্হাল হওয়ার এক বছরের মধ্যেই তিনি উক্ত প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজার হলেন। এবং ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বেঙ্গল কেমিকেলের সর্বময় কর্তৃত্বের ভার গ্রহণ করলেন। সেই থেকে ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই স্বদেশী প্রতিষ্ঠানটির প্রভূত উন্নতিসাধন ক'রে অবসর গ্রহণ করেন। অবশ্য এখনও পরোক্ষভাবে বেঙ্গল কেমিকেল তাঁর কাছে উপদেশ পরামর্শ গ্রহণ ক'রে থাকেন।" (গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য : কথাসাহিত্য : রাজশেখর বসু সংবর্ধনা সংখ্যা : শ্রাবণ, ১৩৬০)

এই দুটি অংশ পড়লে শৈশব, বাল্য ও প্রথম যৌবনের একটা খসড়া পাওয়া যাবে। আপাততঃ এতেই আমাদের সন্তুষ্ট থাকতে হবে, কারণ এর বেশী তথ্য পাই নি, আর আমার বিচারে তার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। কারণ এই বয়সের মধ্যেই তাঁর

ভাবী রচনার গাঁথুনি পাকা হয়ে গিয়েছে। তবে আর একটা পরিচয় এখানে উদ্ধার ক'রে দিচ্ছি। চোদ্দ নম্বর পার্শীবাগান বসু ভ্রাতৃগণের পৈতৃক বাসভবন। এই বাড়িটি ও 'এখানে যে নিয়মিত আড্ডা বসতো নামান্তরে পরশুরামের রচনায় তা অমরত্ব লাভ করেছে।

"১৪ নম্বর পার্শীবাগানে একটি বিরাট আড্ডা বসিত। পরশুরামের গল্পে ইহা ১৪ নম্বর হাবসীবাগান বলিয়া পরিচিত। ১৪ নম্বর ছিল বসু ভ্রাতৃগণের পৈতৃক বাসভবন। চারি ভ্রাতার মধ্যে রাজশেখর বসু মধ্যম, আমরা মেজদা বলিতাম; ডক্টর গিরীন্দ্রশেখর বসু কনিষ্ঠ। সে আজ ত্রিশ বৎসরের কথা তাঁহাদের সহিত প্রথম আলাপ। প্রতিদিনই মজলিস বসিত, জমজমাট হইত রবিবার, বৈঠকখানা গমগম করিত, সেদিন সকলের ছুটি। সেই বৈঠকে কত ডাক্তার, কত অধ্যাপক, কত বৈজ্ঞানিক, কত সাহিত্যিক, কত শিল্পী, কত ঐতিহাসিক উপস্থিত থাকিতেন তার ইয়ত্তা নাই। তার নামকরণ করা হইয়াছিল 'উৎকেন্দ্র সমিতি'। প্রথমে একটা ইংরেজী নামই ছিল, বাংলা নামটি দেন রাজশেখরবাবু। সেই মজলিসে চা, দাবা ও তাসের সঙ্গে চলিত মনস্তত্ত্ব, বিজ্ঞান, শিল্প, কাব্য, পুরাণ, ইতিহাস এবং সাহিত্যের আলোচনা। প্রতি রবিবার বন্ধুবর ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আমি একসঙ্গে দুপুরবেলা সেই মজলিসে উপস্থিত হইতাম। আড্ডাধারী ছিলেন প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী চিরকুমার যতীন্দ্রকুমার সেন। তিনি প্রতিদিন দুপুরে উপস্থিত হইয়া সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরিতেন। তাঁহার হাতে তৈয়ারী চা আড্ডার একান্ত উপভোগ্য বস্তু ছিল। এ ভার আর্টিষ্ট স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং এ দায়িত্ব কাহারও উপর ছাড়িয়া দিয়া তাঁহার তৃপ্তি ছিল না।

এই বৈঠকে জলধরদা নিত্য আসিতেন। শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, ডাক্তার সত্য রায়, অধ্যাপক মন্মথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু, ডক্টর সুহৃৎচন্দ্র মিত্র, অধ্যাপক হরিপদ মাইতি,

ডক্টর দ্বিজেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি নিয়মিতভাবে উপস্থিত থাকিতেন। আচার্য যদুনাথ সরকার, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডক্টর বিরজাশঙ্কর গুহ, শিল্পী পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, শিল্পী পুলিনচন্দ্র কুণ্ডু কখনও কখনও আসিতেন। পাটনার অধ্যাপক রঙীন হালদার ছুটি পাইলেই পার্শীবাগানে সমুপস্থিত হইতেন। ক্যাপ্টেন সত্য রায়ের পিতা আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় কলিকাতায় আসিলেই এখানে আসিতেন। আরও অনেকে থাকিতেন যাঁহাদের সহিত সাহিত্য বা অধ্যাপনার কোন সম্পর্ক ছিল না, কিন্তু তাঁহারা গল্প এবং কথাবার্তায় আসর সরগরম করিয়া রাখিতেন। জলধরদা অধিকাংশ সময় নীরব থাকিতেন, তিনি কানে কম শুনিতেন। শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির কানে না যায় এমন সব কথার আলাপ যখনই জমিয়া উঠিত তখনই দাদা বলিয়া উঠিতেন, 'অ্যা, কি বলছ ভাই ?' মজাদার কথা কদাচিৎ তাঁহার কান এড়াইয়া যাইত।

একদল তাস লইয়া বসিত। ক্যাপ্টেন সত্য রায় ও আমি মাঝে মাঝে দাবা লইয়া বসিতাম' গিরীন্দ্রবাবু কখনও কখনও তাহাতে যোগ দিতেন। কিন্তু ব্রজেন্দ্রনাথ কখনও খেলায় আমল দিতেন না। এই দাবা খেলার মধ্য দিয়াই শরৎচ—র সঙ্গে প্রথম ঘনিষ্ঠতা জন্মে, কিন্তু সে এখানে নয়, রবিবাসরের এক বার্ষিক উদ্যান সম্মেলনে, 'তুলসীমঞ্চে'।

বড়-দা শ্রীশশিশেখর বসু বড় মজার গল্প করিতে পারিতেন। তিনি ইংরেজী-লিখিয়ে, ইংরেজী কা—জ তাঁহার রসরচনা বাহির হইত। এই বৃদ্ধ বয়সে তিনি বাংলা লিখিতে শুরু করিয়াছেন। রবিবাসরীয় 'যুগান্তরে' এখন প্রায়ই তাঁহার সাক্ষাৎ মেলে। সেজ-দা শ্রীকৃষ্ণশেখর বসু উলা বীরনগরের উন্নতিতে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। পল্লী-উন্নয়নের কথা হইলে তিনি মশগুল হইয়া পড়িতেন। শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় চমৎকার'মজলিসী গল্প করিতে পারিতেন।"

(উৎকেন্দ্র সমিতি—শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা। কথাসাহিত্য : রাজশেখর বসু সংবর্ধনা সংখ্যা : শ্রাবণ, ১৩৬০)।

আর একটি ছোট উদ্ধৃতি দিয়ে এই প্রসঙ্গটা শেষ করবো ইচ্ছে আছে। যতদূর জানি রাজশেখরবাবু খুব পত্রালাপী লোক ছিলেন না। তাঁর যে সব পত্র পাওয়া যায় সেগুলি সংক্ষিপ্ত অথচ তাঁকে বোঝবার পক্ষে অত্যাবশ্যক। এই রকম একখানি পত্র উদ্ধৃত করবার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না।

"হাস্যরসিক শ্রীরাজশেখর বসুকে দেখিয়াছি, আবার শোকপ্রাপ্ত শ্রীরাজশেখর বসুকেও দেখিয়াছি।

পত্নীবিয়োগে সমবেদনা জানাইয়া শ্রীনিকেতন হইতে তাঁহাকে যে পত্র লিখি তদুত্তরে এই পত্রখানি পাই।

৭২, বকুলবাগান রোড, কলিকাতা

২।১২।৪২

সুহৃদ্‌বরেষু

চারুবাবু, আপনার প্রেরিত লেখা ভাল লাগল। মন বলছে, নিদারুণ দুঃখ, চারিদিকে অসংখ্য চিহ্ন ছড়ানো, তার মধ্যে বাস করে স্থির থাকা যায় না। বুদ্ধি বলছে, শুধু কয়েক বছর আগে পিছে। যদি এর উলটোটা ঘটত তবে তাঁর মানসিক শারীরিক সাংসারিক সামাজিক দুঃখ ঢের বেশী হত। পুরুষের বাহ্য পরিবর্তন হয় না, খাওয়া পরা পূর্ববৎ চলে, কিন্তু মেয়েদের বেলায় মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা পড়ে।

নিরন্তর শোকাতুর আর একজনকে দেখলে নিজের শোক দ্বিগুণ হয়। গতবারে আমার সেই অবস্থা হয়েছিল। এবারে শোক উস্‌কে দেবার লোক নেই, আমার স্বভাবও কতকটা অসাড়, সেজন্যে মনে হয় এই অন্তিম বয়সেও সামলাতে পারব।

আশা করি আপনার সঙ্গে আবার শীঘ্র দেখা হবে এবং তার আগে খবর পাব।

ভবদীয়

রাজশেখর বসু

তিনি লিখিতেছেন,—আমার স্বভাবও কতকটা অসাড়। কিন্তু তা ঠিক নয়।

গীতায় আছে,--

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে॥

যাহার চিত্ত দুঃখপ্রাপ্ত হইয়াও উদ্বিগ্ন হয় না ও বিষয়সুখে নিস্পৃহ এবং যাঁহার রাগ ভয় ও ক্রোধ নিবৃত্ত হইয়াছে, সেই মননশীল পুরুষ স্থিতপ্রজ্ঞ।

অনেক দিন অনেক বার নিকট হইতে তাঁহাকে দেখিয়াছি। তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ। স্থিতপ্রজ্ঞ মহাপুরুষ রাজশেখরকে আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করি।" (স্থিতপ্রজ্ঞ শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য। কথাসাহিত্য : রাজশেখর বসু সংবর্ধনা সংখ্যা : শ্রাবণ, ১৩৬০)।

পূর্বোক্ত উদ্ধৃতিগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়লে রাজশেখর বসু সম্বন্ধে কয়েকটি মূল তথ্য জানতে পাওয়া যাবে, যেগুলির পদে পদে প্রয়োজন হবে তার সাহিত্য ও চরিত্র বিচারের সময়ে। (১) তাঁর বৈজ্ঞানিক কৌতূহল ও বিজ্ঞান শিক্ষা, এই বিজ্ঞান শিক্ষার মধ্যে আইন পাস করাকেও ধরতে হবে, (২) বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে কৃতী প্রধান ব্যক্তি রূপে দীর্ঘকাল অবস্থিতি, (৩) সংসার সম্বন্ধে আগ্রহশীল হওয়া সত্ত্বেও নির্লিপ্ত উদাসীন ভাব। পার্শীবাগানে আড্ডায় কখনও যোগ দেওয়ার সৌভাগ্য আমার হয় নি, তদসত্ত্বেও অনায়াসে অনুমান করতে পারি যে, তিনি সেই আড্ডার মধ্যমণি হওয়া সত্ত্বেও সবচেয়ে বাগ্‌যত ছিলেন, মাঝে মাঝে একটি দুটি হাসির বিস্ফোরণ ঘটিয়ে আবার নিস্তব্ধ হয়ে যেতেন। তিনি হাসাতেন, তবে হাসতেন কদাচিৎ। 'অন্যে কথা কবে তুমি রবে নিরুত্তর' (৪) চারুবাবুকে লিখিত পত্রখণ্ডে যে স্থিতপ্রজ্ঞ প্রশান্ত ভাব প্রকাশিত, তাতে মিলিত একাধারে গীতার ও বিজ্ঞানের শিক্ষা। গীতোক্ত আদর্শ পুরুষ বস্তুতঃ বৈজ্ঞানিক।

তিনি দুই-ই ছিলেন। এখন এই বিশ্লেষণলব্ধ সিদ্ধান্তগুলি সম্বল করে তাঁর সাহিত্য বিচারে অগ্রসর হবো আর আশা করি দেখতে পাবো যে, বিচারের মূল উপাদান আয়ত্তের মধ্যে এসে পড়ছে।

॥ ৩ ॥

রাজশেখর বসুর গ্রন্থাবলী তার দুটি নামে পরিচিত, রাজশেখর বসু ও পরশুরাম। এই দুই নামের স্বাতন্ত্র্য তিনি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বজায় রেখেছেন, এমন আর কোন লেখক রাখতে পেরেছেন কিনা সন্দেহ। দুটি এমন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব। একই ব্যক্তির দুটি ভিন্ন ব্যক্তিত্ব আলাদা কোঠায় রাখা যে খুব কঠিন এ কথা সহজেই বুঝতে পারা যাবে। তাঁর পক্ষে এ কাজ কিভাবে সম্ভব হয়েছিল একজন লেখক তা প্রকাশ করেছেন, "যখন তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছে সেই সময়ে একদিন আমায় Bengal Chemical-এর আপিসে—যে আপিসের তিনি সে সময়ে Manager ছিলেন—কার্যবশতঃ দেখা করতে যেতে হয়েছিল। কাজের কথা হয়ে যাবার পর আমি—যেমন আমাদের বেশীর ভাগ লোকেরই অভ্যাস—তাঁকে দু-একটা বাড়ির খবরের কথা জিজ্ঞেস করেছিলুম। কিছুমাত্র দ্বিধা না করে তিনি তখনই বলে দিলেন—ওসব কথা ত আপিসের নয়—আপিসের সময় নষ্ট না করে বাড়িতে জিজ্ঞেস করবেন, এই বলে তিনি নিজের কাজে মন দিলেন। তখন আমার বয়স অনেক কম ছিল, তাঁর কাছ থেকে এই শিক্ষা তখন পেয়েছিলুম যে, আপিস আপিসই, বাড়ি নয়,—কর্তব্যের সময় কর্তব্য করে যাওয়াই সঙ্গত; অন্য কাজে বা কথায় সময় নষ্ট না করাই উচিত।" (মেজদা—শ্রীসুহৃদচন্দ্র মিত্র: কথাসাহিত্য : রাজশেখর বসু সংবর্ধনা সংখ্যা : শ্রাবণ ১৩৬০)।

রাজশেখর বসু নামে পরিচিত গ্রন্থাবলীতে মনীষার পরিচয়, অবশ্য শিল্পীর পরিকল্পনা গৌণভাবে আছে। আর পরশুরামের

ছদ্মনামে পরিচিত জনবল্লভ গল্পের বইগুলি শিল্পীর রচনা যদিচ গৌণভাবে মনীষার দেখা পাওয়া যাবে।

আমরা প্রথমে পরশুরাম রচিত গ্রন্থাবলীর বিশদ আলোচনা করবো, পরে রাজশেখর বসু রচিত গ্রন্থাবলীর আলোচনা সারলেই হবে।

রাজশেখরবাবু জনসমাজে হাসির গল্পের লেখক বলে পরিচিত, আরো স্বরূপে বলতে গেলে ব্যঙ্গরসিক বলা যেতে পারে। মোটের উপরে একথা স্বীকার্য যে, তাঁর গল্পের প্রধান উপাদান হাসি। কাজেই হাসির প্রকৃতি সম্বন্ধে ধারণা ক'রে নেওয়া আবশ্যক।

সূর্যালোককে বিশ্লিষ্ট ক'রে ফেললে সাতটি রং পাওয়া যায়, যার এক প্রান্তে লাল, অন্য প্রান্তে বেগনী, মাঝখানে অন্য রং। শুভ্র হাসিকেও যদি বিশ্লেষণ করা যায় অনেক জাতের হাসি পাওয়া যাবে, যার এক প্রান্তে প্রচ্ছন্ন তিরস্কার, অন্য প্রান্তে প্রচ্ছন্ন অশ্রু; ওরই মধ্যে এক জায়গায় নিছক কৌতুকহাস্যও আছে। আমরা যখন কোন লেখককে হাসির গল্পের লেখক বলি, তখন বিচার করা আবশ্যক এই হাসির বর্ণালীর মধ্যেই কোনটি তাঁর রচনার প্রধান উপাদান। এমন হওয়া অসম্ভব নয় যে একাধিক উপাদানই তাঁর রচনায় থাকতে পারে। বিশুদ্ধভাবে একটি মাত্র উ াদানকে অবলম্বন ক'রে রচিত এমন গল্প খুব বিরল। বিশেষতঃ আধুনিক মন মিশ্ররীতির পক্ষপাতী, ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় একাধিক উপাদান মিলিত হয়ে যায় তার রচনায়। শেক্সপীয়ারের 'ফলস্টাফ' এই রকম একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তার গঠনে কৌতুকহাসি থেকে আরম্ভ ক .র প্রায় সবগুলির উপাদান ব্যবহৃত হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত ফলস্টাফের বিদায়ে (Rejection of Falstaff) প্রচ্ছন্ন অশ্রু প্রায় অপ্রচ্ছন্নভাবে ধরা দিয়েছে। বাংলা সাহিত্যেও এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয়। দীনবন্ধুর নিমে দত্তর চরিত্র শেষ দিকে গিয়ে প্রচ্ছন্ন অশ্রু উদগত হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের বৈকুণ্ঠ চরিত্রেও হাসির অন্যান্য উপাদানের সঙ্গে প্রচ্ছন্ন অশ্রুর রেশ আছে।

কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্ত চরিত্র এ বিষয়ে বোধ করি প্রকৃষ্টতম উদাহরণ। হাসির স্ফটিক-শিলায় কমলাকান্ত চরিত্র গঠিত, তা থেকে শতমুখে হাসি বিচ্ছুরিত হতে থাকে, কিন্তু যেমনি একটু ব্যথার তাপ লাগে, অমনি স্ফটিক অশ্রুতে বিগলিত হয়ে পড়ে। পূর্বোক্ত লেখক-গণের কেউ অমিশ্র হাসির কারবার করেন নি। বাংলা সাহিত্যে অমিশ্র হাসির একমাত্র কারবারী বোধ করি অমৃতলাল বসু। তাঁর হাসি প্রায় সময়েই প্রচ্ছন্ন তিরস্কার। এখন বিচার্য পরশুরামের স্থান হাসির বর্ণালীর মধ্যে কোন দিকে, প্রচ্ছন্ন তিরস্কারের দিকে না প্রচ্ছন্ন অশ্রুর দিকে। এই কথাটি বোঝাবার উদ্দেশ্যে আর একজন প্রধান হাসির গল্পের লেখকের নাম করা দরকার, তিনি ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়। দুজনেই হাসির গল্পের লেখক বলে পরিচিত, কিন্তু হাসির বর্ণালীর মধ্যে তাঁদের স্থান একত্র নয়। ত্রৈলোক্যনাথ আছেন প্রচ্ছন্ন অশ্রুর দিক ঘেঁষে আর পরশুরাম আছেন প্রচ্ছন্ন তিরস্কারের দিকে ঘেঁষে। ত্রৈলোক্যনাথের হাসি প্রধানতঃ প্রচ্ছন্ন অশ্রু ঘেঁষা হলেও তাতে অন্য উপাদান আছে, পরশুরামে মিশ্রণ নেই এমন বলি না, তবে অপেক্ষাকৃত কম। মোটের উপর দাঁড়ালো এই যে, এঁদের একজন আছেন বর্ণালীর লালের দিকে, আর একজন বেগনীর দিকে। একজনের আবেদন পাঠকের হৃদয়ে, আর একজনের আবেদন পাঠকের বুদ্ধিতে।

ম্যাথু আর্নল্ড-এর একটি সুভাষিত আছে "Literature is Criticism of life"—এই উক্তিটি নিয়ে গত একশ বছর তর্ক-বিতর্কের আর অন্ত নাই। কাজেই সে তর্কের মধ্যে প্রবেশ করা বাহুল্য। নিছক কৌতুকহাস্য বাদ দিলে দেখা যাবে যে, হাসি যে জাতেরই হোক না কেন তা Social Criticism ছাড়া আর কিছুই নয়। তবে এই Criticism বা সমালোচনার প্রকার ভেদ আছে। কোন লেখক সমালোচক হিসাবে তিরস্কার করেন কেউ বা অশ্রুপাত করেন, দুজনের পন্থা ভিন্ন হলেও উদ্দেশ্য এক।

সমাজ সংস্কার হাসির (নিছক কৌতুকহাস্য ছাড়াও) উদ্দেশ্য বলেই হাস্যরসিককে একটা মাপকাঠি ব্যবহার করতে হয়। সে মাপকাঠি Ethical হতে পারে, Intellectual হতে পারে, Social হতে পারে বা অন্য কোন রকমের হতে পারে। একটা Norm বা আদর্শ লেখকের মনের মধ্যে থাকে, সমাজের যেখানে সেই আদর্শের চ্যুতি ঘটছে সেখানে তিনি মাপকাঠিখানি বের ক'রে এগিয়ে আসেন। এখানে বিশুদ্ধ কমেডির সঙ্গে Satire বা ব্যঙ্গের তফাত। বিশুদ্ধ আনন্দ দান ছাড়া কমেডির আর কোন উদ্দেশ্য নেই, অন্য সর্বপ্রকার হাসি উদ্দেশ্যমূলক। কমেডি লেখক আনন্দ দান করেন, ব্যঙ্গরসিক বিচার করেন; কমেডি লেখক উৎসববাজ, ব্যঙ্গরসিক বিচারক। বিচারের ভুলভ্রান্তি হতে পার, এক আদালতের রায় অন্য আদালতে উল্টে যেতে পারে, এক যুগের নজির অন্য যুগ না মানতে পারে এমন উদাহরণ সাহিত্যের ইতিহাসে প্রচুর। বিশুদ্ধ আনন্দের মার নেই, বিশুদ্ধ বিচার বলে কিছু আছে কিনা সন্দেহ, একথা স্বীকার না ক'রে পারা যায় না যে ব্যঙ্গলেখকের স্থান অত্যুচ্চ সাহিত্যে সর্বোচ্চ-শ্রেণীতে কখনো নির্দিষ্ট হয় না। সকলেই তার গুরুত্ব স্বীকার ক'রে, তবু বিশুদ্ধ আনন্দদাতার সঙ্গে সমান আসন দিতে রাজী হয় না। বিচারকের স্থান আদালতে, আনন্দদাতার স্থান অন্তঃপুরে।

নাটকে এই সমালোচনার কাজটি বিদূষক ক'রে থাকে, নীচু আসনে বসেও রাজার দোষ দেখাতে সে কুণ্ঠিত হয় না, কিন্তু নাটকের চূড়ান্ত পর্বে বিদূষককে কদাচিৎ দেখতে পাওয়া যায় তার কারণ আর কিছুই নয়, বিদূষণার সীমা অন্তঃপুরের ও অন্ত্যঅঙ্কের বাইরে। এই সীমা সম্বন্ধে অবহিত হওয়া সত্ত্বেও ব্যঙ্গরসিক স্বকর্তব্য সাধনে যে নিরস্ত হয় না, তার কারণ বিশেষ আদর্শের প্রেরণা তাকে চালিত করে। মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ। যে প্রলাপবাদিনী কবিতা তার কানে কানে আনন্দ মন্ত্র উচ্চারণ করে, যে আনন্দ মন্ত্রে বৈষয়িক সার্থকতা কিছুমাত্র নেই, সেই কবিতাকে মানুষ সর্বোচ্চ আসন দিয়ে

নিচে বসিয়ে রাখে ব্যঙ্গরসিককে, যার দৃষ্টি সদাজাগ্রত না থাকলে সমাজস্থিতি অসম্ভব হয়ে পড়ে। ওরই মধ্যে যে ব্যঙ্গরসিক প্রচ্ছন্ন অশ্রুকে উপাদান রূপে গ্রহণ করে তার প্রতি মানুষের মন কিছু সদয় বটে, কিন্তু প্রচ্ছন্ন তিরস্কারককে সে মনে ভয় করলেও হৃদয়ের মধ্যে স্থান দেয় না। পরশুরাম ও ত্রৈলোক্যনাথ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা প্রসঙ্গে ব্যাপারটি আরেকবার বোঝাতে চেষ্টা করবো। এখন এইটুকুই যথেষ্ট যে পরশুরামের হাসি প্রধানতঃ তিরস্কার ঘেঁষা, যার আবেদন মানুষের বুদ্ধিতে। কিন্তু তিনি শুধুই হাসির গল্প লিখেছেন এ কথা সত্য নয়। তাঁর রচনার মধ্যে এমন অনেক গল্প আছে যা ঠিক হাসির গল্প নয়। অন্য নামের অভাবে তাদের সামাজিক গল্প বলতে হয়। যথা—কৃষ্ণকলি, চিঠি বাজি, দীনেশের ভাগ্য, যশোমতী, ভূষণ পাল, ভবতোষ ঠাকুর ইত্যাদি।

এ সব গল্পে হাসি যে নেই তা নয়, তবে হাসিটা তার প্রধান উপাদান নয়। একবার হাস্যরসিক বলে নাম রটে গেলে, তার নিতান্ত সাধারণ কথাতেও হেসে ওঠা পাঠক কর্তব্য মনে করে। শুনেছি প্রসিদ্ধ কমিক অভিনেতা চিত্তরঞ্জন গোস্বামী একটি সভায় ব্রহ্মচর্য সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে উঠে প্রথম বাক্যটাও শেষ করতে পারেন নি, ঘনঘন হাসি ও করতালিতে শ্রোতারা নিজেদের রসবোধের পরিচয় দিয়েছিল।

পরশুরামের এমন কতকগুলি গল্প আছে যা গভীর মনীষা-প্রসূত। মনুষ্য জাতির ভবিষ্যৎ, সমাজের অবস্থা, মৃত্যুর রহস্য, পৃথিবীব্যাপী লোভ-অশান্তির পরিণাম প্রভৃতি সম্বন্ধে দুঃসাহসিক চিন্তার পরিচয় বহন করে এই সব গল্প। পরোক্ষভাবেও হাসির সঙ্গে সংস্রব নাই। কিন্তু যেহেতু পরশুরামের রচনা, কাজেই পাঠকের পক্ষে হাসা একপ্রকার জাতীয় কর্তব্য। যথা—গামানুষ জাতির কথা, অটলবাবুর অন্তিম চিন্তা, ভীম গীতা, মাঙ্গলিক, কাশীনাথের জন্মান্তর, সত্যসন্ধ বিনায়ক, নির্মোক নৃত্য, কর্দম মেখলা প্রভৃতি।

এই সব গল্পগুলির প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণের কারণ আর কিছুই নয়, পরশুরাম প্রধানতঃ ব্যঙ্গ গল্পের লেখক হলেও কেবলই ব্যঙ্গ গল্প তিনি লেখেন নি, এমন অনেক গল্প লিখেছেন যা মানুষের ভূত-ভবিষ্যৎ ও বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচায়ক। তিনি যদি অন্য ব্যঙ্গরচনা নাও লিখতেন তবে হয়তো এত জনপ্রিয় হতেন না, কিন্তু একথাও তেমনি সত্য যে এই গল্পগুলি বাংলা সাহিত্যের আসরে তাঁকে স্থায়ী আসন দান করতো। ব্যঙ্গ রচনার দ্বারা পাঠকের মনে নিজের যে Image তিনি তৈরী ক'রে তুলেছেন সেই Image-এর আড়ালেই তাঁর অনেক কীর্তি ঢাকা পড়ে গিয়েছে।

॥ ৪ ॥

শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড গল্পটি প্রকাশিত হওয়া মাত্র (১৯২২) বাঙালী পাঠকের কান ও চোখ সজাগ হয়ে উঠ্‌ল, এ আবার কে এলো? Curtain Raiser হিসাবে গল্পটি অতুলনীয়। এই গল্পেই আসর মাত। তারপরে পাঠকের ঔৎসুক্য আর ঘুমিয়ে পড়বার অবকাশ পায় নি। চিকিৎসা-সংকট মহাবিদ্যা, লম্বকর্ণ ও ভুশণ্ডির মাঠে একত্র গ্রন্থাকারে গড্ডলিকা। পরে প্রকাশিত হ'ল কজ্জলী গ্রন্থ, অর্থাৎ বিরিঞ্চিবাবা, জাবালি, দক্ষিণরায়, স্বয়ম্বরা, কচি-সংসদ ও উলট-পুরাণের সমষ্টি। বাংলা সাহিত্যের আকাশে প্রথমে যা একটি ক্ষুদ্র নক্ষত্ররূপে দেখা দিয়েছিল, কালক্রমে তা উজ্জ্বল বৃহৎ নির্নিমেষ গ্রহের রূপ ধারণ ক'রে সৌর পরিবারের পরিধি বাড়িয়ে দিল। পরে আরও সাতখানি গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, তবে একথা বললে বোধ করি অন্যায় হবে না যে অদ্যাবধি প্রথম বই দু-খানাই সবচেয়ে জনপ্রিয়। এই জনপ্রিয়তার কারণ কি?

বিয়াল্লিশ বৎসর বয়সে সাহিত্যিকরূপে রাজশেখর বসুর আত্মপ্রকাশ, যে বয়সে নাকি অধিকাংশ লেখকের আদিপর্ব শেষ হয়ে গিয়ে মধ্যপর্বে প্রবেশ ঘটে। বিয়াল্লিশের আগে পর্যন্ত তাঁর কোন

সাহিত্যিক পরিচয় পাঠকের সম্মুখে ছিল না, হঠাৎ তিনি পাকা লেখা নিয়ে আবির্ভূত হলেন। পাঠক একেবারে চমকে গেল, কিন্তু সে চমক পীড়াদায়ক নয়, সুখদায়ক। তিনি ধীরে-সুস্থে পাঠককে তৈরী ক'রে নিয়ে পরিণত রচনায় উপনীত হন নি, পাঠককে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করিয়ে রাখেন নি। পাঠকের সেই কৃতজ্ঞতা তাঁর জনপ্রিয়তাকে বর্ধিত করেছে।

কোন কোন লেখক, তার মধ্যে অতিশয় শক্তিমান লেখক আছেন, ধীরে ধীরে পাঠকের সম্মুখে আবির্ভূত হতে থাকেন। এই ধীরতায় পাঠকের চক্ষু অভ্যস্ত হয়ে আসে। রবীন্দ্রনাথ অতি অপরিণত রচনা নিয়ে প্রথম দেখা দিয়েছিলেন, তারপরে শতাব্দীর না হোক দশকের প্রহরে প্রহরে পরিণতির মধ্য গগনে উত্তীর্ণ হন। অপরপক্ষে বঙ্কিমচন্দ্র দুর্গেশনন্দিনী দিয়ে এবং মধুসূদন মেঘনাদ বধ কাব্য দিয়ে পাঠক সমাজকে চমক দিয়েছেন। এই তিন মহারথীর সঙ্গে তুলনা না ক'রেও বলা যায় যে, রাজশেখর বসু অতর্কিতে চমক দিয়ে পাঠকের মনকে অধিকার ক'রে নিলেন। মনে রাখতে হবে যে শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড প্রকাশের সময় তাঁর বয়স দুর্গেশনন্দিনী ও মেঘনাদ বধ কাব্য প্রকাশকালে লেখকদের চেয়ে অনেক বেশি ছিল।

এখন চমক যতই বিস্ময়কর হোক ক্রমে তার দ্যুতি ম্লান হয়ে আসে। পরশুরামের ক্ষেত্রে তা হয় নি, তার কারণ পাঠকের চমককে নিত্য নূতন উদাহরণ যোগাতে সক্ষম হয়েছিলেন, গড্ডলিকা ও কজ্জলীর এগারটি গল্পে। অবশ্য একথা স্বীকার না ক'রে উপায় নেই যে, পরবর্তী সাতখানি গ্রন্থে চমকের দ্যুতি অনেকটা ম্লান হয়ে এসেছে। একটি কারণ, পাঠকের চোখ অভ্যস্ত হয়ে এসেছে। অন্য কারণ আছে তার আলোচনা যথাস্থানে। এবার পূর্বসূত্র টেনে জনপ্রিয়তার দ্বিতীয় কারণ আলোচনা করা যেতে পারে।

অনেকের ধারণা যে গল্পে বর্ণিত নরনারীর নূতনত্বে পাঠক বিস্ময় হয়ে গিয়েছিল। প্রকৃত ব্যাপার ঠিক উল্টো। এসব নরনারী অত্যন্ত

পুরাতন বলেই তারা আকর্ষণ করেছে পাঠকের চিত্ত। পুরাতন তবে অতি পরিচয়ের ধুলো জমে জমে সে-সব আচ্ছন্ন হয়ে নাস্তিবৎ বিরাজ করছিল। পরশুরামের হাসির দমকা হাওয়ায় সে ধুলো সরে যেতেই প্রত্যক্ষ হয়ে উঠল। বিস্মিত পাঠক বলে উঠল বাঃ বাঃ, এসব তো সামনেই ছিল অথচ দেখতে পাই নি। ভোরবেলা দরজা খুলতেই বৃহৎ একটা গাছ দেখতে পেলে পাঠকে অবশ্যই চমকিত হয়, কিন্তু পরমুহূর্তের বিস্ময়কে চাপা দেয় বিরক্তি, তখন সে কুড়ুলের সন্ধান করে। না, পরশুরামের প্রথম রচনা দরজার সম্মুখের বনস্পতি নয়, দিগন্তের গিরিমালা। শীতের কুয়াশায়, গ্রীষ্মের ধুলোয় আর বর্ষার মেঘে আচ্ছন্ন ছিল, আজ হঠাৎ শরৎকালের বৃষ্টি-ধৌত নির্মল আকাশে তার উজ্জ্বল প্রকাশ দেখে মনটি প্রসন্ন হয়ে উঠল, বাঃ ঠিক জায়গায় ঠিক জিনিসটি আছে দেখছি। পূর্বসংস্কারহীন নূতন প্রথমটা চমকে দিলেও তার পরিণাম বিরক্তিতে আর যে নূতন পূর্বসংস্কারের সূত্র ধরে অতি পরিচয়ের পর্দা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে প্রকাশ পায়, সে কখন পুরাতন হয় না ; কারণ পুরাতনত্বেই তার যথার্থ পরিচয়। সূর্যোদয়ে প্রত্যাশিত বিস্ময়, জাহুব রর আমগাছে অপ্রত্যাশিত বিস্ময়, প্রথম বারের পরে দ্বিতীয় বারে বিরক্তিকর।

এরা সবাই পুরাতন অত্যন্ত প্রত্যাশিত। শ্যামানন্দ ব্রহ্মচারী, গণ্ডেরিরাম বাটপাড়িয়া, নন্দবাবু, তারিণী কবিরাজ, কেদার চাটুজ্যে, লাটুবাবু, নাদু মল্লিক—এরা কি আজকের! এদের কেউ কেউ মুরারি শীলের সঙ্গে ভাগে ব্যবসা করছে, ভাড়ুদত্তের সঙ্গে বাজার তোলা আদায় করছে, আবার ঠক চাচার সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলছে, দুনিয়া বুরা মুই সাচা হয়ে কি করবো? ডমুরধারা আসরে কেদার চাটুজ্যে গল্পের শিকল বোনে নি এবং শ্রীমৎ শ্যামানন্দ ব্রহ্মচারী যে নরেদচাঁদের ব্যবসার পার্টনার ছিল না এমন কথা হলপ ক'রে বলবে। এরা সবাই অতিপরিচয়ের আড়ালে প্রচ্ছন্ন ছিল বলেই চিনতে পারা যায় নি।

॥ ৫ ॥

আমেরিকার ভূভাগ গোড়া থেকেই ছিল, কলম্বাস তাকেই আবিষ্কার করলো। পূর্বোক্ত মহাপুরুষগণ গোড়া থেকেই ছিল, পরশুরাম সন্ধানীরূপে তাদের আবিষ্কর্তা। প্রতিভা দুইভাবে কাজ করে, আবিষ্কার ও সৃষ্টি, নূতন জগতে উদ্ঘাটন ও নূতন জগতের নির্মাণ কলম্বাস ও বিশ্বামিত্র। এ দুই গুণের কোন একটাকে একচেটিয়া মনে করলে ভুল হবে। অল্পবিস্তর সব প্রতিভাবান্ লেখকেই পাওয়া যাবে। আয়েষা সৃষ্টি, বিদ্যাদিগ্‌গজ আবিষ্কার; গোরা সৃষ্টি, পানুবাবু আবিষ্কার। তবে এ পর্যন্ত বলতে পারা যায় যে স্যাটায়রিস্টে, ব্যঙ্গ প্রতিভার সৃষ্টির তুলনায় আবিষ্কারের ভাগ বেশি। সুইফটের লিলিপুটকে যতই অভিনব মনে হোক, আসলে সে মানুষকে উল্টো দূরবীনের দৃষ্টিতে আবিষ্কার। পরশুরামে আবিষ্কারের ভাগটাই সুপ্রচুর, তবে সৃষ্টিকার্যও আছে। জাবালি চরিত্র মহৎ সৃষ্টি, কৃষ্ণকলি (কালিন্দী) ও চিরঞ্জীবও সৃষ্টিকার্য। তাহলে দাঁড়ালো এই যে, পাঠকের বিস্ময়ের দ্বিতীয় কারণ হিসাবে সে মোটেই বিস্মিত হয় নি, অন্ততঃ নূতন দেখে বিস্মিত হয় নি। প্রত্যাশিত পুরাতনকে স্পষ্টভাবে দেখতে পেয়ে আনন্দিত হয়েছিল। তৃতীয় কারণ পরশুরামের ভাষা।

এমন পরিচ্ছন্ন, বাহুল্য বর্জিত, সুপ্রযুক্ত ভাষা বড় দেখা যায় না। পাঠক-সমাজ যখন সবুজপত্রী ভাষাকে প্রগতির চরম লক্ষণ বলে ধরে নিয়েছিল, ভেবেছিল সাধু ভাষার আয়ু শেষ হয়ে গিয়েছে, নূতন কোন সম্ভাবনা আর তার মধ্যে নেই, তখন গড্ডলিকা কজ্জলীর ভাষা দেখে সকলে চমকে গেল। রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরীর ভাষারীতিকে এড়িয়ে সাধুভাষার এই পদক্ষেপ সত্যই বিস্ময়জনক। বস্তুতঃ পড়বার সময়ে খেয়াল থাকে না এ ভাষা সাধু কি কথ্য, পরে হিসাবে দেখা যায় সাধু ভাষা।

প্রমথ চৌধুরীর ভাষা পাঠককে প্রতি নিঃশ্বাসে তার ধর্ম স্মরণ করিয়ে দেয়, নিজের কৌশলকে লুকোবার কৌশলটা তার অনায়ত্ত। রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনের ভাষাতেও এই ত্রুটি। গড্ডলিকা ও কজ্জলীর ভাষারীতি সাধু, তবে জটাজূটধারী ভেকধারী সাধু নয়, এমন সাধু যে সাধুত্ব গোপন রাখতে সমর্থ। সবসুদ্ধ মিলে ভাষাটি ভারী তৃপ্তিদায়ক, ভাবের স্বাভাবিক বাহন।

এখানে একটি বিষয় স্মরণ করিয়ে দেওয়া আবশ্যক। হাস্যরস রচনার ভাষা সাধু হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাতে ভাষার গাম্ভীর্যে আর ভাবের লঘুতায় যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়, তা হাসির পরিবেশ রচনার সাহায্য করে। কথ্য ভাষার চটুলতা আর হাসির চটুলতায় মিলে যায়, মুহুর্মুহু পাঠকের মনকে দ্বন্দ্বের চকমকি স্ফুরণে আলোকিত ও চমকিত করতে পারে না। বিষয়টির বিস্তার অনাবশ্যক, কতকগুলি উদাহরণ দিলেই চলবে। বঙ্কিমচন্দ্রের লোকরহস্য ও কমলাকান্ত, রবীন্দ্রনাথের ব্যঙ্গ-কৌতুক, ত্রৈলোক্যনাথ, ইন্দ্রনাথ, প্রভাতকুমার প্রভৃতির উল্লেখ যথেষ্ট। অনেকে আক্ষেপ করেন বাংলা সাহিত্যে আজকাল যথেষ্ট হাস্যরসের রচনা লিখিত হচ্ছে না। তার অনেক কারণের মধ্যে একটি প্রধান, হাসির রচনা আজ ভ্রষ্টবাহন। সিদ্ধিদাতা গণেশ চটুল মূষিক বাহনে চলাফেরা করতে পারেন, তবে তাঁকে নিয়ে হাসাহাসি করবে এমন কার সাধ্য! যে শুঁড়ের বহর! গভীর গম্ভীর ভাব কথ্যভাষায় আত্মপ্রকাশ করতে সমর্থ হলেও, কথ্যভাষায় হাস্যরস! নৈব নৈব চ। এই একটি কারণ যেজন্য পরশুরামের শেষ ছয়খানি গল্পগ্রন্থ কিছু পরিমাণে ম্লান। সেগুলির বাহন কথ্যভাষা। সাধুভাষা ও পয়ার ছন্দের আয়ু বঙ্গভারতীর আয়ুর সঙ্গে মিলিয়ে গণনীয়। নূতন নূতন গুণীর হাতে অভাবিত রূপ যুগে যুগে তারা দেখা দেবে।

॥ ৬ ॥

হাসির গল্প লিখবার বিপদ এই যে, পাঠকে হেসেই সব কর্তব্য শোধ ক'রে দেয়, আদৌ তলিয়ে দেখতে চায় না। হাসির গল্পে আর এমন কি থাকবে, ভাবটা এই রকম। কেমন করে জানবে যে হাসির গল্পে না থাকতে পারে এমন বস্তু নাই। ভাষার জাতুর কথাই ধরা যাক। হাস্যরস একান্তভাবে সামাজিক ব্যাপার। হাসিতে সামাজিক মনের প্রকাশ, অশ্রুতে প্রকাশ ব্যক্তিমনের। স্বভাবতই হাস্যাত্মক রচনায় নিসর্গ বর্ণনার স্থান সংকীর্ণ। যখন তা অপরিহার্য হয়ে'ওঠে, নূতন খাত খনন ক'রে নিতে হয়। গঙ্গা প্রব্যহিত স্বাভাবিক খাতে, গঙ্গার খাল কৃত্রিম খাতে যা নাকি সামাজিক চেষ্টার ও সামাজিক প্রয়োজনের ফল।

লম্বকর্ণ গল্পে কালবৈশাখীর এবং ভুশণ্ডির মাঠে অপরাহ্নের বর্ণনা তুটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কালবৈশাখীর ও অপরাহ্নের স্বভাব বর্ণনার সঙ্গে সুনিপুণভাবে মিশে গিয়েছে ব্যঙ্গ রসিকের স্বভাব। আবার রুচি-সংসদ গল্পে তুটি বর্ণনা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। একটি শরৎ আবির্ভাবের, আর একটি রেলগাড়িতে যাত্রার সুখের।

শরতের প্রথমপদক্ষেপের নিখুঁত স্বাভাবিক বর্ণনা, তারপরেই সামাজিক মন সক্রিয় হয়ে উঠেছে। "টাকায় এক গণ্ডা রোগারোগা ফুলকপির বাচ্চা বিকাইতেছে। পটোল চড়িতেছে, আলু নামিতেছে।" আবার রেলগাড়িতে যাত্রার বর্ণনার মধ্যেও কেমন অনায়াসে নিসর্গের স্বভাব ও সামাজিক স্বভাব গঙ্গাযমুনায় মিশে গিয়েছে। "কয়লার ধোঁয়ার গন্ধ, চুরুটের গন্ধ, হঠাৎ জানলা দিয়ে এক ঝলক উগ্রমধুর ছাতিম ফুলের গন্ধ। তারপর সন্ধ্যা—পশ্চিম আকাশে ওই বড় তারাটা গাড়ির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলিয়াছে। ওদিকের বেঞ্চে স্থূলোদর লালাজী এর মধ্যে নাক ডাকাইতেছেন। মাথার উপরে ফিরিঙ্গীটা

বোতল হইতে কি খাইতেছে। এদিকের বেঞ্চে দুই কম্বল পাতা তার উপর আরও দুই কম্বল, তার মধ্যে আমি, আমার মধ্যে ভর-পেট ভাল-ভাল খাদ্যসামগ্রী, তাছাড়া বেতের বাক্সে আরও অনেক আছে। শাড়ীর অঙ্গে অঙ্গে লোহালক্কড়ে চাকার ঠোক্করে জিঞ্জির ডাণ্ডার ঝঞ্জনায় মৃদঙ্গ-মন্দিরা বাজিতেছে—আমি চিৎপাৎ হইয়া তাণ্ডব নাচিতেছি। হমীন্ অস্ত্, ওআ হমীন অস্ত!" শেষোক্ত বাক্যে দ্রুত ধাবমান গাড়ির চলার ছন্দ কেমন সুকৌশলে অথচ কেমন অনায়াসে ধরা হয়েছে। উড়ন্ত পাখিকে ফাঁদ পেতে ধরবার চেয়েও এ যে কঠিন। সাহিত্যে সবচেয়ে দুসাধ্য ব্যঙ্গের সঙ্গে প্রকৃতিকে মেলানো, আর ব্যঙ্গের সঙ্গে প্রেমকে মেশানো। উপরে উদ্ধৃত সবগুলি বর্ণনায় প্রথম দুঃসাধ্যকে সম্ভব ক'রে তোলা হয়েছে। আর দ্বিতীয় দুসাধ্য দুসাধ্য হয়ে ওঠবার উদাহরণ পরে দেওয়া যাবে। মোট কথা এই যে এহেন নিসর্গ বর্ণনা বঙ্গ-সাহিত্যে আর কোথাও পাওয়া যাবে না, না গল্পগুচ্ছে না কপালকুণ্ডলায়। এ পরশুরামের নিজস্ব। আর ভাষায় এই ছন্দ, গতি ও ভঙ্গী অন্যত্র বিরল, পরশুরামের শেষের বইগুলোতেও নেই। সেগুলির আপেক্ষিক অপ্রিয়তার এ যে একটা কারণ তা আগেই বলেছি। এখানে অপ্রাসঙ্গিক হলেও বলতে বাধা নেই যে, রামায়ণ মহাভারতের অনুবাদে সাধুভাষা ব্যবহার করলে তাদের মর্যাদা রক্ষিত হতো।

॥ ৭ ॥

গড্ডলিকা ও কজ্জলীর আর একটি ঐশ্বর্য ছবিগুলি। কথার সঙ্গে ছবিগুলি গানের সঙ্গে সঙ্গত নয়। সঙ্গত বন্ধ হলেও গানের মাধুর্য কমে না। ছবিগুলিকে বলা চলে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণের নিমিত্ত নিচে লালকালি দিয়ে দাগ টেনে দেওয়া, কিংবা সঙ্গীর উত্তরীয় প্রান্ত টেনে দৃশ্য বিশেষের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ। ওগুলো আছে বলে

পাঠক একটু অতিরিক্ত সচেতন হয়ে ওঠে, ওগুলো না থাকলে অনবহিত পাঠক সেগুলো হয়তো অতিক্রম করে যেতো। শেষের ছয়খানি গ্রন্থের আপেক্ষিক ম্লানতার কারণে নিচে দাগটানার কিংবা উত্তরীয় প্রান্তে টান দেওয়ার অভাব। তৃতীয় গ্রন্থ হনুমানের স্বপ্নের কোন কোন গল্পে যথা হনুমানের স্বপ্ন ও প্রেমচক্রে ছবির গুণে অপকর্ষ লক্ষ্য করবার মতো। খুব সম্ভব চিত্রকর নিজের ক্ষমতার ক্ষীণতা সম্বন্ধে সচেতন হয়েছেন বলেই শেষের বইগুলি অলঙ্করিত করতে ক্ষান্ত হয়েছেন। তার ফল গল্পগুলির আবেদন মন্দ হয়ে এসেছে। তবে প্রথম বই দু'খানিতে লেখায় রেখায় এমন মিলে গিয়েছে যে, এক এক সময়ে সন্দেহ হয়, গল্প অনুসারে ছবি আঁকা না ছবি অনুসারে গল্প লেখা।

পরশুরামের গল্পের আর একটি বিশেষ লক্ষণ পড়বার সময়ে পাঠকে ভারী একটি আরাম ও স্বস্তি বোধ করে। বর্তমান জীবনের তাড়াহুড়া, ব্যস্ততা, গেল গেল ভাব এদের মধ্যে নাই। বর্তমান ব্যস্তসমস্ত জীবনে নিত্য বিড়ম্বিত পাঠক এখানে পদার্পণ ক'রে ভারী আঁরাম বোধ করে। উদাহরণ স্বরূপ কেদার চাটুজ্যে গল্পমালার উল্লেখ করা যেতে পারে। বংশলোচনবাবু গৃহকর্তা হলেও গল্পকর্তা কেদার চাটুজ্যে। বংশলোচনবাবুর বাড়ির আড্ডাটি ১৪ নম্বর পার্শী-বাগান লেনের আড্ডার প্রতিচ্ছবি বলে মনে হয়।

"চাটুজ্যে মশায় পাঁজি দেখিয়া বলিলেন, রাত্রি ন'টা সাতান্ন মিনিট গতে অম্বুবাচী নিবৃত্তি। তার আগে এই বৃষ্টি থামবে না। এখন তো সবে সন্ধ্যা। বিনোদ উকিল বলিলেন—তাই তো বাসায় ফেরা যায় কি করে? গৃহস্বামী বংশলোচনবাবু বলিলেন, বৃষ্টি থামলে সে চিন্তা ক'রো। আপাততঃ এখানেই খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা হোক। উদো বলে আয় তো বাড়ীর ভেতরে। চাটুজ্যে বলিলেন, মসুর ডালের খিচুড়ি আর ইলিশ মাছ ভাজা।"

এই চিত্র যুদ্ধপূর্ব সত্যযুগের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে পাঠকের

চিত্তে একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস প্রশ্বসিত ক'রে তোলে। রেশন-কার্ড নাই, কান্‌ট্রোল নাই, ইলিশ মাছ চালান বন্ধ হওয়ার আশঙ্কা নাই ; যত রাতেই বাড়িতে ফেরো না কেন, ট্রাম বাস পাওয়া যাবে ; নাই ধর্মঘট, নাই ছিনতাইয়ের আশঙ্কা। কয় বছর আগেকারই বা কথা। কিন্তু সত্যযুগ তো লৌকিক বছর গণনার হিসাবের উপরে নির্ভর করে না। প্রত্যেক যুগ বিগত যুগের মধ্যে অচরিতার্থ আশার মরীচিকা দেখে—সেই তো সত্যযুগ। জাবালি পত্নী "হিন্দ্রলিনী তাঁর বাবার কাছে শুনিয়াছিলেন, সত্যযুগে এক কপর্দকে সাত কলস খাঁটি হৈয়ঙ্গবীন মিলিত, কিন্তু এই দগ্ধ ত্রেতাযুগে তিন কলস মাত্র পাওয়া যায়, তাও ভঁযসা।" আজকের সকলের মধ্যেই একজন হিন্দ্রলিনীর বাস। আবার আগামী যুগ বর্তমানকালের দিকে তাকিয়ে, ধর্মঘট, ঘেরাও, কন্‌ট্রোল, রেশন, ছিনতাই-শঙ্কিত যুগকে সত্য বলে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলবে। পাঠকে কেদার চাটুজ্যে গল্পমালা পড়বার সময়ে দীর্ঘনিঃশ্বাসেব চিরন্তন বাসা সত্যযুগে প্রবেশ করবার সুযোগ পায়। এই গল্পগুলির রসের নিত্যতার কারণ বংশলোচন-বাবুর বাড়ির আড্ডা ও আড্ডাধারীগণ নিত্যকালের অধিবাসী, যে নিত্যকাল লৌকিক হিসাবের ঊর্ধ্বে। সতত বিক্ষুব্ধ সংসার-সমুদ্রের মাঝখানে এই শান্তিময় দ্বীপটিতে পদার্পণ করবামাত্র এখানকার নাগরিক অধিকার লাভ করা যায়। কিছু মাত্র দায়িত্ব নাই, বসে বসে কেদার চাটুজ্যের গল্প শোনো, (বাধা দিলে ব্রাহ্মণ চটে যায় এমন কাজটি করো না, নগেন ও উদয়েব পরস্পরকে আক্রমণ কৌশল লক্ষ্য করো, পারো তো বিনোদ উকীলের কোল থেকে তাকিয়াটা টেনে নাও, আর সম্ভব হলে বংশলোচনবাবুর অনবধানতার সুযোগে পাশে থেকে Happy though Married বইখানা আল্‌-গোছে টেনে নিয়ে ব্যক্তিগত সমস্যার সমাধান প্রচেষ্টা করো। রাত যতই হোক মসুর ডালের খিচুড়ি ও ইলিশ মাছ ভাজার আসরে যথাসময়ে ডাক পড়বে। সচ্ছল গৃহস্থ বংশলোচনবাবুর বাড়িতে

সর্বদা ছ'চারজন অতিরিক্তের জন্য চাল নেওয়া হয়ে থাকে। বিশেষ প্রয়োজনও আছে, কেননা, ১৪ নম্বর পার্শীবাগান লেনের আড্ডাধারীরা ক্রমে ক্রমে ওখানে গিয়ে সমবেত হচ্ছেন, এতদিনে বোধ হয় সকলেই খণ্ডকালের সীমা পেরিয়ে নিত্যকালের আসরে গিয়ে জুটেছেন।

॥ ৮ ॥

পরশুরামের জনপ্রিয়তার শ্রেষ্ঠ কারণ তার গল্পগুলির বাহনের বিশেষ প্রকৃতি। এই বিশেষ প্রকৃতিকে সাধারণভাবে হাস্যরস বলা চলে, কিন্তু আগে মনে করিয়ে দিয়েছি যে হাস্যরসের বর্ণালী বা বর্ণচ্ছটায় নানা রঙ, এক প্রান্তে অনতিপ্রচ্ছন্ন অশ্রু, আর এক প্রান্তে অনতিপ্রচ্ছন্ন তিরস্কার, মাঝখানে আছে বিশুদ্ধ কৌতুকহাস্য ও অন্য জাতের হাসি। আরও বলেছি যে, পরশুরামের হাসি অনতিপ্রচ্ছন্ন তিরস্কার-ঘেঁষা। সেই সঙ্গেই বলেছি যে আধুনিক মন রসের জাত বাঁচিয়ে চলতে অভ্যস্ত নয়, বিভিন্ন রস, এক্ষেত্রে বিভিন্ন জাতের হাসি মিশে গিয়ে মিশ্ররসের এবং মিশ্রজাতের হাসি সৃষ্টি করে। পরশুরামে বিশুদ্ধ কৌতুক হাস্য আছে, যেমন গুপী সাহেব ও উপেক্ষিতা, জটাধর বক্শী পর্যায়কেও এই শ্রেণীতে ধরা উচিত। অনতিপ্রচ্ছন্ন তিরস্কারের হাসিই অধিকাংশ গল্পে। অনতিপ্রচ্ছন্ন অশ্রু বড় চোখে পড়ে না। হাসতে হাসতে কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ ক'রে তোলে কমলাকান্তের দপ্তরে ও বৈকুণ্ঠের খাতায়। সে হাসির বোধ করি একেবারেই অভাব পরশুরামে। বের্গসঁ যাকে ইন্টেলেকচুয়াল লাফটার বলেছেন, পরশুরামের হাসি তা-ই। তবে তাঁর হাসির একটা প্রধান লক্ষ্য এই যে, ব্যক্তি বিশেষের বা গোষ্ঠী বিশেষের গায়ে এসে লাগে না। এ হাসি ভূতের ঢিলের মতো সম্মুখে এসে প'ড়ে সচকিত ও সতর্ক ক'রে দেয়, গায়ে লেগে ব্যথা দেয় না। অর্থাৎ

হাসির উদ্দেশ্য সাধিত হয় অথচ উদ্দিষ্ট ব্যক্তি পীড়িত হয় না। সেই জন্যে সকলেরই কাছে এর নিত্য সমাদর। অপরপক্ষে অমৃতলাল ও ইন্দ্রনাথের হাসি ব্যক্তিবিশেষ ও গোষ্ঠী বিশেষের পক্ষে পীড়াদায়ক। স্ত্রীশিক্ষা, ইংরেজীশিক্ষা, রাজনৈতিক আন্দোলন, ব্রাহ্মসমাজ এবং অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তিবিশেষ এই হাসির লক্ষ্য। পরশুরামের হাসির লক্ষ্য। Idea Ideology. কোন কোন বৃত্তি, ব্যবসায়, সাহিত্য ও ধর্মের ব্যভিচার ইত্যাদি। এ হাসির একটা মস্ত সুবিধা এই যে, প্রত্যেকেই মনে করে সে ছাড়া আর সকলে তার লক্ষ্য, কাজেই অসঙ্কোচে হাসতে তার বাধে না। গণ্ডেরিরাম বাটপাড়িয়া, পেন্সনপ্রাপ্ত রায় সাহেব তিনকড়িবাবু, শ্যামানন্দ ব্রহ্মচারী বিরিঞ্চিবাবা বকু বাবু, শিহরণ সেন অ্যাণ্ড কোং সকলেই প্রাণ ভরে হাসে, হাঃ হাঃ হাঃ—অমুক লোকটাকে খুব ঠুকেছে দেখছি, বেড়ে হয়েছে। শেক্সপীয়র নাটককে প্রকৃতির দর্পণ বলেছেন। পরশুরামের দর্পণখানা কিছু বাঁকা, দর্শক নিজের বিকৃত ছায়া দেখে বুঝতে না পেরে ভাবে অপরের ছায়া, পেট ভরে হেসে নেয়। সামান্য অতিরঞ্জনের আমদানি ক'রে পরশুরাম এই কাজটি সুসিদ্ধ করেছেন।

হাস্যরস সৃষ্টির একটি চিরাচরিত পন্থা অপ্রত্যাশিতের অতর্কিত সমাবেশ। সকলকেই অল্পবিস্তর এ পন্থা অনুসরণ করতে হয়েছে। এ গুণটিতে পরশুরাম প্রতিদ্বন্দ্বী-রহিত।

সত্যব্রতর উক্তি. "সাণ্ডেল মশায় বলছেন ধর্মজীবনের মধুরতা, আমি ভাবছি আরসোলা।"

শূর্পণখা বিরহ দুঃখ বর্ণনা করছে এমন সময়ে ভাইঝি পুষ্কলা জিজ্ঞাসা ক'রে বসে, "পিসি, তুমি ঋষি খেয়েছ?"

"নিরুপমা বলিল—শাক নয়, ঘাস সেদ্ধ হচ্ছে। ওঁর কত রকম খেয়াল হয় জানেন তো।

নিবারণ। সেদ্ধ হচ্ছে? কেন ননীর বুঝি কাঁচা ঘাস আর হজম হয় না।

"দি অটোম্যাটিক শ্রীদুর্গাগ্রাফ", "ঠোঁটের সিঁদুর অক্ষয় হোক", "শিবুর তিন জন্মের তিন স্ত্রী এবং নৃত্যকালির তিন জন্মের স্বামী", "তাঁহারা (নাস্তিকরা) মরিলে অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন প্রভৃতি গ্যাসে পরিণত হন", "লালিমা পাল (পুং)", "তবে এইটুকু আশার কথা, এখানে (দার্জিলিঙ পাহাড়ে) মাঝে মাঝে ধস নামে।" সার আশুতোষ এক ভলুম এন্‌সাইক্লোপিডিয়া লইয়া তাড়া করিলেন, প্রভৃতি। এমন উদাহরণ শত শত উদ্ধার করা যেতে পারে। এই ধরনের অপ্রত্যাশিতের অতর্কিত সমাবেশকে এক ধরনের এপিগ্রাম বলা যেতে পারে, প্রভেদের মধ্যে এই যে সাধারণ এপিগ্রাম ভাবময়, এগুলি চিত্রময়। এই সব এপিগ্রামের স্ফুলিঙ্গবর্ষণ যেমন মনোহর, তেমনি অত্যাবশ্যক। এরাই পাঠকের মনকে সর্বদা সজাগ ক'রে রেখে দেয়, তার চোখের সম্মুখে পথ দৃশ্যমান ও সুগম হয়ে ওঠে।

॥ ৯ ॥

পরশুরামের রচনাগুলির প্রকৃতি সম্বন্ধে সাধারণভাবে বক্তব্য শেষ ক'রে এবারে গ্রন্থ হিসাবে তাদের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যেতে পারে। কিন্তু তার আগে বইগুলোর আপেক্ষিক গুরুত্বের কারণ সম্বন্ধে আরও কিছু বলা আবশ্যক।

গড্ডলিকা কজ্জলী অধিকাংশ পাঠকের বিবেচনায় পরশুরামের শ্রেষ্ঠ কীর্তি একথা সম্পূর্ণ সত্য হোক বা না হোক এই বিবেচনার কিছু হেতু আছে। প্রথম দু'খানির সঙ্গে শেষের সাতখানি একটি প্রধান পার্থক্য, (অন্য পার্থক্য আগেই দেখানো হয়েছে) প্রথম দু'খানিতে দেখানো হয়েছে জীবনচিত্র, শেষের কয়খানিতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে জীবনতত্ত্ব। প্রথম দু'খানি ছবি, শেষের গুলি ভাষ্য। তবে ছবি ও ভাষ্য, আগে যাকে বলেছি চিত্র ও তত্ত্ব সম্পূর্ণ অন্য নিরপেক্ষ নয়। অনেক সময়ে একটার মধ্যে আর একটা এসে পড়েছে। তবে

ব্যতিক্রম বাদ দিয়ে বিচার করলে পার্থক্য মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড ও বিরিঞ্চিবাবা আর তৃতীয়দ্যূতসভা, রামরাজ্য বা গামানুষ জাতির কথা, একজাতের গল্প নয়। প্রথম দুটোতে লেখক ছবি এঁকেই সন্তুষ্ট, শেষেরগুলোতে ছবির সঙ্গে মন্তব্য জুড়ে দিয়েছেন কিংবা বলা উচিত মন্তব্যের সঙ্গে কখনো কখনো জুড়ে দিয়েছেন ছবি। ফানুষ ও ঘুড়িতে এই রকম প্রভেদ। ফানুষ হাত থেকে ছেড়ে দিয়ে বাজিকর সম্পূর্ণ দায়মুক্ত তারপরে ঐ বস্তুটা বাতাসের বেগ ও নিজের ভার অনুসারে চলতে থাকে। ঘুড়ি উড়নদার নিরপেক্ষ নয়, বাতাসের বেগ ও নিজের ভার যাই বলুক, যতই উঁচুতে সে উঠুক, ওর হাতের চরম টানটা পড়ছে উড়নদারের হাত থেকে। লোকটি ভাষ্যকার, ঘুড়ির গতিবিধি তার ভাষ্য। অন্যপক্ষে ফানুষ অনন্যনির্ভর স্বয়ংসম্পূর্ণ। পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে রচিত গল্প-গুলি জীবনতত্ত্বের বা জীবন ভাষ্যের শ্রেষ্ঠ আধার।

এখন পাঠক-সাধারণের কাছে তত্ত্বের চেয়ে চিত্রের আদর বেশি; তাকাইলে চিত্র দেখতে পাওয়া যায়, তত্ত্ব বুঝতে হলে বুদ্ধির আবশ্যক, সকলে সব সময়ে বুদ্ধি খাটাতে চায় না, বিশেষ গল্প উপন্যাসে, সে গল্প উপন্যাস আবার যদি হাস্য রসাত্মক হয়। কিন্তু বুঝমান পাঠকের কাছে শেষের বইগুলোর আদর কম হওয়ার কথা নয়; লেখকের প্রতিভার সঙ্গে মনীষাকে লাভ করাকে তারা উপরি পাওনা বলে গণ্য করে। শেষের বইগুলির গল্পে সমাজ, সাহিত্য, ধর্ম, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, যুদ্ধ, শান্তি, প্রেম, নরনারীর সম্বন্ধ প্রভৃতি গুরুতর বিষয় সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন আর সেই মন্তব্যের সমর্থনে কখনো বিচিত্র নরনারী ও ঘটনাকে উপস্থিত করেছেন।

তবে উভয় পর্যায়েই ব্যতিক্রম আছে বলে আগে উল্লেখ করা হয়েছে। শেষের বইগুলির মধ্যে জটাধর বক্‌শী সিরিজ, দুই সিংহ, আনন্দীবাঈ, আতার পায়েস, পরশপাথর, সরলাক্ষ হোম, জয়হরির জেব্রা, লক্ষ্মীর বাহন, রাতারাতি, গুরুবিদায় প্রভৃতি জীবন

চিত্র-প্রধান গল্প। আবার দুয়ের মিশ্রণে অত্যুৎকৃষ্ট সৃষ্টি গগন চটি। এটি পরশুরামের অতি শ্রেষ্ঠ গল্পগুলির অন্তর্গত। একটি ক্ষুদ্র সরস কাহিনীর ফ্রেমের মধ্যে বর্তমান পৃথিবীর ধাপ্পা ও ভণ্ডামিকে সশ্রদ্ধ ক'রে দাঁড় করানো মুনশীয়ানার চরম, গল্পের কলমের পিছনে মনীষার প্রেরণা না থাকলে এমন সম্ভব হতো না।

প্রথম দু'খানির এগারটি গল্পের মধ্যে জাবালি নিঃসন্দেহে জীবনতত্ত্ব প্রধান। শুধু তাই নয় পরবর্তীকালে পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে যে-সব গল্প লিখেছেন জাবালি তাদের প্রথম। খুব সম্ভব রামায়ণ ও মহাভারত সম্বন্ধে আগ্রহ থেকেই তিনি পেয়েছেন পৌরাণিক কাহিনী পুরুষোচিত ছাঁচে ঢালাই করবার প্রেরণা। সে যাই হোক এই জাবালিতে আমাদের বিশেষ প্রয়োজন আছে, পরে সবিস্তারে বলবো। আপাততঃ অন্য গল্পগুলি সম্বন্ধে বিচার সেরে নেওয়া যেতে পারে।

এগারটি গল্পের জাবালি বাদ পড়লে থাকে দশটি। মহাবিদ্যা ও উলট-পুরাণ দৃষ্টির অভিনবত্বে, নরনারীর বৈচিত্র্যে এবং wit-এর খদ্যোতবর্ষণে চিত্তাকর্ষক হলেও, শক্ত গল্পের ফ্রেমের অভাবে অন্যগুলোর সমকক্ষ হতে পারে নি। ওর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি মনোহর, কিন্তু সমগ্র রূপটি নয়। লেখক যেন দেহের outline-টা আঁকতে ভুলে গিয়েছেন। অন্য আটটি গল্প বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ আটটি গল্প।

॥ ১০ ॥

গোড়াতে উল্লেখ করেছি যে রাজশেখর বসুর বিজ্ঞান শিক্ষা (আইনও তার মধ্যে পড়ে) এবং বৃহৎ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্ব গল্পগুলির উপাদান সংগ্রহে তাঁকে সাহায্য করেছে। সকল লেখককেই ক'রে থাকে। বঙ্কিমচন্দ্রের হাকিমী অভিজ্ঞতার পরিচয় তাঁর অনেক উপন্যাসে আছে। কৃষ্ণকান্তের উইল ও রজনী প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সংগীতবিদ্যার সম্বন্ধে ঘনিষ্ঠ ভাবের পরিচয় পাওয়া যাবে রবীন্দ্রনাথের

অনেক রচনায়। তাঁর অনেক Image অন্য অলঙ্কার সংগীত-বিজ্ঞানকে ভিত্তি ক'রে গড়ে উঠেছে। রাজশেখর বসুও কাজে লাগিয়েছেন তাঁর অর্জিত জ্ঞানকে। শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড গল্পের কাঠামো রচনা একমাত্র তাঁর পক্ষেই সম্ভব—ব্যবসায়ের অন্ধিসন্ধি, লিমিটেড কোম্পানীর আইনের রন্ধ্র সন্ধানে যাঁর জ্ঞান পাকা। আবার বিজ্ঞান-বিদ্যা তাঁর কাজে লেগেছে। কুমড়োর চামড়া কস্টিক পটাশ দিয়ে বয়েল করলে ভেজিটেবল শু হলেও হ'তে পারে এ ধারণা সকলের মাথায় আসবার কথা নয়। আবার বিরিঞ্চিবাবাতে প্রোফেসার ননীর বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার আইডিয়া কেবল তাঁরই মাথায় আসা সম্ভব, বিজ্ঞানের বিশেষ রসায়নের সাধারণ সূত্রগুলি যিনি অবহিত। প্রাণি-তত্ত্ব, অভিব্যক্তিবাদ প্রভৃতির মূল সূত্রগুলিকে তিনি প্রয়োগ করেছেন পরবর্তী অনেক গল্পে।

তারপরে ১৪ নম্বর পার্শীবাগান লেনের আড্ডাটিকে এবং আড্ডাধারীদের অনেককে তিনি নামান্তরে ও রূপান্তরে ব্যবহার করেছেন কেদার চাটুজ্যে গল্পমালায়।

রাজশেখরবাবু স্বীকার করেছেন যে তিনি বেশী লোকের সঙ্গে মেশেন নি, দেশভ্রমণ বেশি করেন নি। প্রতিভাবান লোকের পক্ষে এ প্রয়োজন সব সময়ে হয় না। বঙ্কিমচন্দ্র খুব মিশুক লোক ছিলেন না, দেশভ্রমণও বেশি করেন নি। তবে তাঁর উপন্যাসে এত বিচিত্র নরনারী এলো কোথা থেকে। তাদের অধিকাংশ স্বেচ্ছায় দেখা দিয়েছে আদালতে এসে। রাজশেখরবাবুর বেলায় বেঙ্গল কেমিক্যালের আপিসে। বাকিটুকু প্রতিভার রসায়ন। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বাঙালীর রসায়ন বিদ্যার সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন "মোদের নব্য রসায়ন শুধু গরমিলে মিলাইয়া।" গরমিলে মেলানোই যে হাস্যরস সৃষ্টির প্রধান উপায়। হাস্যরস ফকিরের আলখাল্লা, নানা রঙের কাপড়ের টুকরোয় তৈরি। বেঙ্গল স্কুল অব্ কেমিস্ট্রির নব্য-রাসায়নিক পরশুরাম সেই সেই নীতিতেই তাঁর হাসির গল্পগুলি সৃষ্টি করেছেন।

· এবারে জাবালি। জাবালি চরিত্রটি খুব জনপ্রিয় না হলেও (সেযুগেও জনপ্রিয় ছিলেন না) জাবালি গল্পটি অতি উৎকৃষ্ট। আর শুধু তাই নয় পরবর্তী অনেক উৎকৃষ্ট পৌরাণিক গল্পের অগ্রজ।

ব্রহ্মা জাবালিকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "হে স্বাবলম্বী মুক্তমতি যশোবিমুখ তপস্বী, তুমি আর দুর্গম অরণ্যে আত্মগোপন করিও না, লোকসমাজে তোমার মন্ত্র প্রচার কর। তোমার যে ভ্রান্তি আছে তাহা অপনীত হউক, অপরের ভ্রান্তিও তুমি অপনয়ন করো। তোমাকে কেহ বিনিষ্ট করিবে না, অপরেও যেন তোমার দ্বারা বিনষ্ট না হয়। হে মহাত্মন্, তুমি অমরত্ব লাভ করিয়া যুগে যুগে লোকে লোকে মানবমনকে সংস্কারের নাগপাশ হইতে মুক্ত করিতে থাকো।"

স্বাবলম্বী মুক্তমতি যশোবিমুখ সংস্কারের ছিন্নবন্ধন জাবালি মানব সমাজের বিরুদ্ধে একটা মূর্তিমান প্রচ্ছন্ন তিরস্কার। এর আগে অনেকবার বলেছি পরশুরামের হাস্যরসের বিশেষ প্রকৃতি প্রচ্ছন্ন তিরস্কার। পরশুরামের চোখে আদর্শপুরুষ জাবালি। অমরনাথে ও কমলাকান্তে মিলিয়ে নিলে, হয়তো বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যক্তিত্বকে খানিকটা পাওয়া যায়। তেমনি খুব সম্ভব পরশুরামের, ব্যক্তিত্বের খানিকটা পাওয়া যায় জাবালি চরিত্রে। পরশুরামের Symbolic Hero জাবালি। ত্রৈলোক্যনাথের সঙ্গে বারে বারে পরশুরামের তুলনা করেছি, আবার করা যেতে পারে।

ত্রৈলোক্যনাথের চোখে আদর্শপুরুষ মুক্তামালা গল্প পর্যায়ের সুবলচন্দ্র গড়গড়ি। গড়গড়ি সরলভাবে স্বীকার করেছে, (যেন অপরাধ স্বীকার) "ভালরূপ লেখা পড়া জানি না, শাস্ত্র জানি না, জানি কেবল এই যে সত্য ও পরোপকার, ইহাই ধর্ম।" ত্রৈলোক্য-নাথের জীবনেও এই ছিল নীতি ও প্রকৃতি। তার হাস্যরসের প্রচ্ছন্ন অশ্রুর জগতের Symbolic Hero, সুবলচন্দ্র গড়গড়ি। একজনে ঘনীভূত অশ্রু, অপরজনে ঘনীভূত তিরস্কার। এইভাবে দুইজনে হাসির বর্ণালীর দুই বিপরীত প্রান্ত।

॥ ১১ ॥

এবারে আর গ্রন্থ হিসাবে নয় বিভিন্ন পর্যায় হিসাবে গল্পগুলির আলোচনা করবো। অনেকগুলি পর্যায়ক্রম পরশুরামে আছে, তার মধ্যে পৌরাণিক, কেদার চাটুজ্যে, জটাধর পর্যায়গুলি উল্লেখযোগ্য হলেও পর্যায়রূপে তাদের তেমন গুরুত্ব নাই, অর্থাৎ এই সব গল্পে পর্যায়ের বিস্তার সঙ্কীর্ণ।

চিত্তাকর্ষকগুণ কেদার চাটুজ্যে ও জটাধর পর্যায়ে অধিক হলেও চিন্তাকর্ষকগুণ পৌরাণিক পর্যায়ে সবচেয়ে বেশি। সমাজ রাজনীতি ও ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে পরশুরামের চিন্তায় এগুলি বাহন। কত বিষয়ে যে তাঁর কল্পনা প্রসারিত হয়েছে, কত সমস্যা যে তাঁর চিন্তার পরিধির মধ্যে এসে পড়েছে গল্পগুলি সেই পরিচয় বহন করেছে।

অনেকের মুখে এমন কথা শোনা যায় যে, পরশুরামের হাতে পড়ে পৌরাণিক নরনারীর বা কাহিনীর অপকর্ষ সাধিত হয়েছে। একথা সত্য নয়, তবে পুরাণের সঙ্গে গল্পগুলির যে ভেদ ঘটে গিয়েছে তা অবশ্যই সত্য। এ ভেদ কালের ও লেখকের দৃষ্টির ভেদ। পুরাণ-গুলিতেও সমস্ত কাহিনী এক রূপ নয়, বিভিন্ন পুরাণে একই কাহিনীর রূপান্তর দেখতে পাওয়া যায়। সেও একই কারণে, কালের ও লেখকের দৃষ্টির ভেদ। কালের ও লেখকের দাবী অনুসারে পরশুরামের হাতে পুরাণের জন্মান্তর ঘটেছে বললে অন্যায় হয় না।

রামরাজ্য ও চিরঞ্জীবে পুরাণের সঙ্গে আধুনিক কালের মিশ্রণ। রামরাজ্য গল্পে মিডিয়াম-রূপে ভূতগ্রস্ত ভূতনাথ যে গভীর সামাজিক তত্ত্ব প্রকাশ করেছে তা কখনোই আধামূর্খ ভূতনাথের দ্বারা সম্ভব নয়। শেষপর্যন্ত পাঠকের মনে এই সন্দেহটুকু লেখক জাগিয়ে রেখেছেন, পাঠক ভাবতে থাকে তবে কি সত্যই সে ভূতাবিষ্ট হয়েছিল? ভূতনাথ কথিত তত্ত্বগুলিকে সে গ্রহণ করলেও ভূতনাথের

নিজস্ব বলে গ্রহণ করতে তার বাধে। এই কথাটুকু সৃষ্টি খুব মুনশীয়ানার কাজ।

চিরঞ্জীবেও তা-ই। চিরঞ্জীব কে? বিভীষণ ছাড়া আর কে হবে? অথচ স্পষ্ট ক'রে বলা হয় নি।

গুলবুলিস্তান আরব্য-উপন্যাসের উপসংহার, ভারতীয় পুরাণের রূপান্তর নয়, অন্য নামের অভাবে তাকে পৌরাণিক বলেই ধরা উচিত।

দশকরণের বানপ্রস্থে সুখের স্বরূপ বর্ণিত হয়েছে। রাজা দশকরণ নানা অবস্থার মধ্যে সুখের সন্ধান করেছেন, শেষ পর্যন্ত তিনি আবিষ্কার করলেন যে, পরের ঘর ছেয়ে দেওয়া ছাড়া আর কিছুতেই সুখ নাই, পরোপকারই যথার্থ সুখ। ব্যঙ্গরসিক কমলাকান্তেরও এই সিদ্ধান্ত। অপর দুইজন অতিশ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গরসিক বার্নার্ড শ ও ভলটেয়ার শেষ পর্যন্ত এই একই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। Candida বা Blackgirl in Search of God এই দুই অমর গ্রন্থে এই একই সিদ্ধান্ত। দশকরণ ঘরামী বৃত্তি ছেড়ে সিংহাসনে ফিরে যেতে অস্বীকৃত হয়েছেন।

তৃতীয়দ্যূতসভায় দেখানো হয়েছে, অধর্মের বিরুদ্ধে অধর্মাচরণ রাজনীতির চিরস্বীকৃত নীতি। এই নীতির প্রেরণাকেই শকুনির ভ্রাতা মতকুনি যুধিষ্ঠিরকে কপট দ্যূতের সাহায্য লইতে পরামর্শ দিয়েছেন।

ভীম গীতা গল্পে ভীম কৃষ্ণকে বলেছেন কাপুরুষতা ও ধর্মভীরুতা কোনটাই তার চরিত্রের লক্ষণ নয়; সে মধ্যপন্থী। কাজেই কৃষ্ণ তাঁর উচ্চ আদর্শ নিয়ে থাকুন, ভীম ক্ষত্রিয় বীরের কর্তব্য করবে। এই গল্পে চোক্কমল্ল আর তক্কমল্ল নামে কৃষ্ণের দুইজন সেবকের উল্লেখ আছে, তারা নিতান্ত সাধারণ ও দুর্বল ব্যক্তি। তাদের সিদ্ধান্ত এই যে, 'দুর্বলের একমাত্র উপায় জোটবাঁধা। বোলতার ঝাঁক বাঘ-সিংহীকেও জব্দ করতে পারে।' বর্তমান যুগ এই নীতি অবলম্বন ক'রে চলেছে।

ভরতের ঝুমঝুমি ভারত বিভাগ সম্বন্ধে ব্যঙ্গ মন্তব্য।

অগস্ত্যদ্বার রাজাদের জিগীষার মূঢ়তা সম্বন্ধে ব্যঙ্গ মন্তব্যে পরিপূর্ণ।

বালখিল্যগণের উৎপত্তি চিন্তাশীল মাত্রেরই প্রণিধানযোগ্য। লেখকের অভিমত এই যে, বালখিল্যগণের লীলা পৌরাণিক কালেই সীমাবদ্ধ নহে, যুগে যুগে সে লীলা পুনঃঅভিনয় হয়ে থাকে, বর্তমান যুগ সেই লীলার প্রশস্ত আসর।

তিন বিধাতা গল্পে পাপের উৎপত্তি ও তার প্রতিকার সম্বন্ধে চিত্তাকর্ষক বিবৃতি আছে। লেখকের বক্তব্য এই যে, বিধাতা পাপ-পুণ্যের অতীত, তাঁর চোখে সবই সমান, মানুষ ক্ষুদ্র বুদ্ধি বলেই পাপপুণ্যের ভেদ ক'রে আর উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। অসীমকালের অধীশ্বর বিধাতা নিরুদ্বিগ্ন। পাপ ও পুণ্য দুই-ই জীবনের অপরিহার্য লক্ষণ। কোন একটিকে বাদ দিয়ে জীবনকে কল্পনা করা চলে না।

গন্ধমাদন বৈঠকে দেখানো হয়েছে যে, ধর্মযুদ্ধ বলে কিছু সম্ভব নহে। যুদ্ধের আগে ধর্মের প্রেরণায় যেমনই নিয়ম বেঁধে দেওয়া হোক না কেন, যুদ্ধকালে তার ব্যভিচার ঘটবেই। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ থেকে আরম্ভ ক'রে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত সমস্তই এই ব্যভিচারের দৃষ্টান্তে পূর্ণ। হয় যুদ্ধ একেবারে বন্ধ করতে হবে, নয় যুদ্ধে'অধর্মকে স্বীকার ক'রে নিতে হবে।

নির্মোক নৃত্যে জীবনে একটি গভীর জিজ্ঞাসাকে ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা হয়েছে। প্রকৃত সৌন্দর্য রূপাশ্রয়ী নয়, তার স্থান আরও গভীরে। উর্বশীর পরাজয়ে এই সত্যটি দেখানো হয়েছে।

যযাতির জরা গল্পে দেখানো হয়েছে যে, তথাকথিত সন্ন্যাস বাসনার মূলচ্ছেদ করতে অক্ষম। বাসনা যখন রূপসী নারীরূপে উপস্থিত হয়, তখন সন্ন্যাসের সযত্ন-রচিত তাসের ঘর মুহূর্তে ভেঙে পড়ে।

ডম্বরু পণ্ডিত একজন মুখ্য আদর্শবাদী, তাই কোথাও সে প্রতিষ্ঠা-

লাভ করতে পারে নি। আদর্শবাদের সঙ্গে সাংসারিক কাণ্ডজ্ঞানের বিরোধ নেই এই কথাই বোধ করি লেখক বলতে চান।

এ ছাড়া আরও কতকগুলি গল্প এই পর্যায়ে পড়ে, বাহুল্যবোধে সেগুলির বিস্তারিত আলোচনা করা গেল না। আগেই বলেছি আবার বলতে ক্ষতি নেই, এই পর্যায়ের আদি ও শ্রেষ্ঠ গল্প জাবালি। শুধু তাই নয় মুক্তমতি সংস্কারমুক্ত জাবালি পরশুরামের Symbolic Hero.

আর একটি পর্যায় আছে যার প্রধান ব্যক্তি কেদার চাটুজ্যে। সে বক্তা ও প্রবক্তা দুই-ই। এই পর্যায়ে লম্বকর্ণ, গুরুবিদায়, রাতারাতি, স্বয়ংবরা, দক্ষিণরায় ও মহেশের মহাযাত্রা গল্পগুলির মধ্যে নিশ্চয় করে বলা কঠিন। শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্ট অভিযোগে আমরা কোনটিকেই ছাড়তে রাজী নই। ব্যঙ্গ-সমাজচিত্র হিসাবে এই পর্যায়টিকে শ্রেষ্ঠ কীর্তি বললে অন্যায় হয় না। প্রত্যেকটি চরিত্র নিখুঁতভাবে, নখদর্পণে বিম্বিত। ঘটনাগুলি চিত্তাকর্ষক এবং সর্বোপরি কেদার চাটুজ্যের গল্প-ব্যাখান, কি তার তুলনা দেব জানি না। এই বললেই বোধ করি যথেষ্ট হবে যে, একমাত্র কেদার চাটুজ্যেতেই তা সম্ভব। এই গল্পের একটি প্রধান পাত্র লম্বকর্ণকে ভুলি নাই, বংশলোচনবাবুর অনেক অন্ন সে ধ্বংস করেছে এবং গুরুবিদায় গল্পে নিজের কীর্তি দ্বারা সমস্ত অন্ন-ঋণ শোধ ক'রে দিয়েছে।

জটাধর বক্‌শী সিরিজের তিনটি গল্প। জটাধর বক্‌শী ভণ্ড ও জোচ্চোর কিন্তু হলে কি হয়, তার নব নব উন্মেষশালিনী বুদ্ধি ও সপ্রতিভ ভাব তার উপরেই কাউকে রাগ করতে দেয় না। চাঙ্গায়নি সুধা সমূল্যে বিতরণ ক'রে যখন সে সকার্য সিদ্ধি করছে, তখনও তার উপরে রাগ করা অসম্ভব। যখন স্পষ্ট বুঝতে পারছি যে সে পকেট মারছে, তখনও মনে হয় যা করছে করুক কেবল আর কিছুক্ষণ কথা বলুক, তার কথাবার্তাতেই চাঙ্গায়নি সুধার উন্মাদক শক্তি বিদ্যমান। ডিকেন্স যে সব প্রতিভাবান জোচ্চোর সৃষ্টি করেছেন, তাদের সঙ্গে বেশ মিলত জটাধর বক্‌শীর।

মাঙ্গলিক ও গামানুষ জাতির কথা গল্প দুটিতে চরিত্রগুলি ঠিক মানুষ নয়। মঙ্গলগ্রহ থেকে আগত ব্যক্তি মাঙ্গলিক তার চোখে পৃথিবীর সমস্তই অদ্ভুত, অসংলগ্ন ও অযৌক্তিক। গামানুষ জাতির কথা পাত্রগুলি মানুষ নয়, মানুষ বহুকাল আগে পৃথিবী থেকে লোপ পেয়েছে, এরা গোড়ায় ছিল ইঁদুর, এখন আণবিক রশ্মির প্রভাবে একপ্রকার, অন্য শব্দের অভাবে মনুষ্যত্ব ছাড়া আর কি বলব, মনুষ্যত্ব লাভ করেছে। এদেরই বিচিত্র ইতিহাস এই গল্পে।

বিশুদ্ধ আদর্শবাদের প্রতি, যে আদর্শবাদ শতকরা একশো ভাগ খাঁটি, পরশুরামের অনুকম্পা মিশ্রিত হাস্যের ভাব আছে। সত্যসন্ধ বিনায়ক, ভবতোষ ঠাকুর, নিধিরামের নির্বন্ধ, অক্রুর সংবাদ, অটলবাবুর অন্তিমচিন্তা ও সিদ্ধিনাথের প্রলাপ প্রভৃতি এই পর্যায়ে পড়ে। সত্যসন্ধ বিনায়ক, ভবতোষ ঠাকুর ও নিধিরাম অবিমিশ্র সৎ প্রকৃতির লোক, খাঁটি আদর্শবাদী। কাজেই তাদের পরিণাম দুঃখের। আদর্শবাদ ও পাগলামি যে কোন কোন সময়ে অভিন্ন বলে প্রতীয়মান হয়, অক্রুর সংবাদ তার একটি উদাহরণ। আবার অনেক সময়ে আদর্শবাদে মানুষকে যে ৈ রাজ্যের মধ্যে নিয়ে যায়, অটলবাবুর অন্তিমচিন্তা তার একটি উদাহরণ। মোটকথা এই যে, আদর্শবাদকে পরশুরাম অশ্রদ্ধা করেন না কিন্তু সেই আদর্শবাদ যখন একান্ত হয়ে ওঠে কাণ্ডজ্ঞানকে বর্জন করে, তখন তাকে ব্যঙ্গের উপকরণরূপে গ্রহণ করতেও তিনি কুণ্ঠিত হন না। আদর্শবাদের সঙ্গে কাণ্ডজ্ঞান মিশ্রিত হলে তবেই তা কার্যক্ষম হয়ে ওঠে। বোধ করি এই তাঁর সুচিন্তিত অভিমত।

॥ ১২ ॥

ব্যঙ্গ-লেখকের কলমের সঙ্গে প্রেমের বড় আড়াআড়ি, দুয়ে মেলে না, কিংবা মিলতে গেলেও তীক্ষ্ণ কলমের ঠোকরে প্রেমে বিকৃতি ঘটে যায়। সুইফট্, বার্নার্ড শ ও ভলটেয়ার মহা প্রতিভাবান ব্যক্তি হওয়া

সত্ত্বেও মধুর রসের কাহিনী লিখতে পারেন নি। এমন কেন হয় সহজেই অনুমেয়। ব্যঙ্গের চোখ স্বভাবতই জীবনের অপূর্ণতার দিকে নিবদ্ধ আর প্রেমে যেমন জীবনের পূর্ণতার পরিচয় এমন আর কিসে? ও দুয়ে ধর্মের মূলগত প্রভেদ। অন্যপক্ষে লিরিক কবি, প্রেম যাদের প্রধান উপজীব্য তাদের হাতে ব্যঙ্গের কলমের গতি বড় স্বচ্ছ নয়। শেলী, ওয়ার্ডস্বার্থ, রবীন্দ্রনাথ উদাহরণ। ব্যতিক্রম বায়রন ও হায়নে। কীটস্ সম্বন্ধে নিশ্চয় ক'রে কিছু বলা যায় না, কাব্যের কোন ক্ষেত্রে তার যে প্রবেশ অনধিকার ছিল এমন মনে হয় না।

পরশুরামের ব্যঙ্গদৃষ্টি ব্যঙ্গের স্বাভাবিক উপাদানের দিকে নিবদ্ধ হলেও, সৌভাগ্যবশতঃ কখনো কখনো প্রেমের দিকে আকৃষ্ট হয়েছে। তার রচিত প্রেমের গল্প সংখ্যায় সামান্য কয়টি, তার উপরে আবার তাতে প্রেমের উন্মাদনা নেই, এমন কি প্রথম নজরে অনেক সময়ে সেগুলি যে প্রেমের গল্প তা খেয়াল হয় না। তবু সেগুলি প্রেমের গল্প ছাড়া আর কিছু নয়, আর এই স্বল্প সংখ্যকের কয়েকটি পরশুরামের শ্রেষ্ঠ কীর্তির অন্তর্গত। আনন্দীবাঈ, যশোমতী, রটন্তী-কুমার, চিঠি বাজি, জয়হরির জেব্রা, নীলতারা প্রভৃতি এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। গল্পগুলিতে প্রেমের প্রকৃতি আবার এক রকম নয়।

আনন্দীবাঈ গল্পে প্রেম দাম্পত্য সম্বন্ধের মধ্যে সার্থকতা লাভ করেছে।

যশোমতীতে কিশোর-কিশোরীর প্রণয় দীর্ঘ কাল-সমুদ্র ডুব সাঁতারে পার হয়ে যখন আবার মুখোমুখী হল তখন পাত্র বৃদ্ধ ও পাত্রী বৃদ্ধা ও পিতামহী। তারা একদিন প্রেমকে দেখেছিল পূর্বাচলের তীর থেকে আজ দেখালো অস্তাচলের তীরে এসে, মাঝখানে দীর্ঘ-কালের বিচ্ছেদ। তাদের চোখে অস্তাচলের দৃশ্যও কম মনোরম নয়, কেননা তা পলে পলে পুরাতন হয়ে যাওয়ার দুর্ভাগ্য এড়াতে সমর্থ রয়েছে। প্রেমের উত্তাল সমুদ্র এখন তুষারে শুভ্র ও শান্ত, তাই বলে তার সৌন্দর্য অল্প নয়।

রটন্তীকুমারে ধনী পাত্রের সঙ্গে দরিদ্র পাত্রীর কোর্টশিপ বড় নিপুণভাবে, বড় সুকুমারভাবে, বড় আত্মসম্মান রক্ষা ক'রে অঙ্কিত হয়েছে।

চিঠিবাজিতে পাত্রপাত্রী পরস্পরকে পরীক্ষা ক'রে নিয়েছে। এ প্রেম একটু Intellectual, তাই বলে Emotion-এ কমতি পড়ে নি। দু'জনের বাসরের সংলাপটুকু পড়লেই আর সন্দেহ থাকে না।

নীলতারাতে পথভ্রান্ত প্রেম শেষ পর্যন্ত স্বস্থানে এসে মিলিত হয়েছে।

জয়হরির জেব্রা প্রায় Taming of the Shrew। অদৃষ্টের আঘাতে বেতসী খঞ্জিনী হয়েছে। ঐটুকুর প্রয়োজন ছিল খঞ্জ জয়হরির অর্ধাঙ্গিনী হওয়ার জন্যে।

গল্পগুলি প্রেমের নিঃসন্দেহ, তবে সে-সব গল্পে যে মামুলী উপাদান ও মনস্তত্ত্বের প্যাঁচ থাকে তা একেবারেই নেই, মানব স্বভাবের সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতি আছে। এগুলিও পরশুরামের দক্ষিণ হস্তের রচনা, তবে মননের রেখা গভীর নয়, রঙটাও হাল্কা।

॥ ১৩ ॥

আর কয়েকটি গল্প আছে যাদের কোন বিশেষ পর্যায়ে ফেলা যায় না, তবু তাদের মধ্যে যেন মিল খুঁজে পাওয়া যায়। ভূষণ পাল ও দাঁড়কাগ গল্প দুটিতে প্রচ্ছন্ন অশ্রুর আভাস বিদ্যমান। পরশুরামে প্রচ্ছন্ন অশ্রু বিরল বলেই গল্প দুটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্যামা নামান্তরে তমিস্রা নামান্তরে দাঁড়কাগ বা কৌয়াদিদি নিজের রূপহীনতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন। এ বিষয়ে কোন মেয়ে সচেতন অর্থাৎ নিঃসন্দেহ হলে তার মন বিশ্বসংসারের বিরুদ্ধে বিদ্বিষ্ট হতে বাধ্য, চরাচরের ষড়যন্ত্রেই এমনটি হয়েছে বলে তার নিশ্চিত বিশ্বাস। কৌয়াদিদি কিন্তু ঐ বিশ্বাসের ফাঁদে পা দেয় নি, বিদ্বেষকে নিজের বিরুদ্ধে আরোপ

ক'রে নিজেকে নিয়ে সে ঠাট্টা করতে পারে। এ কাজ যে পারে তাকে আহত করা কঠিন। কৌয়াদিদি অশ্রুকে জমিয়ে আইসক্রীমে পরিণত করেছে, তার উপরে হাসির সূর্যকিরণ পড়ে বড় মনোহর দেখাচ্ছে।

ভূষণ পাল এমনি আর একটি প্রচ্ছন্ন অশ্রু (অনতিপ্রচ্ছন্ন) কাহিনী। খুনী আসামী ফাঁসির বলি। এমন লোকের মধ্যেও যে মহত্ত্ব থাকতে পারে এখানে সেটাই অত্যন্ত সহজে দেখানো হয়েছে। অপটু লেখকের হাতে পড়লে চোখের জলের ঢেউ বয়ে যেতো, এখানে গোটা দুই চাপা দীর্ঘনিশ্বাস মাত্র শ্রুত হয়েছে।

কৃষ্ণকলি গল্পে প্রচ্ছন্ন বা প্রকাশ্য কোন প্রকার অশ্রু থাকবার কথা নয়, তবু প্রচ্ছন্ন অশ্রুর তালিকায় গল্পটির নাম লিখতে ইচ্ছা করে। গল্পটি শিউলি ফুলের মতো সুকুমার ও স্পর্শকাতর, এর মধ্যে কোথায় যে গল্প বুদ্ধি বুঝতে অক্ষম। শিউলি ফুলে যদি শিশিরের আভাস থাকে, তবে এ গল্পটিতেও অশ্রুর আভাস আছে।

॥ ১৪ ॥

সাহিত্য ও সাহিত্যিক সম্বন্ধে অনেক গূঢ়ার্থ ব্যঙ্গ মন্তব্য পরশুরামের বিভিন্ন গল্পে ছড়ানো আছে সত্য, কিন্তু সরাসরি বিষয়টি নিয়ে লিখিত গল্পের সংখ্যা বেশি নয়। দুই সিংহ, রামধনের বৈরাগ্য, বটেশ্বরের অবদান ও দ্বান্দ্বিক কবিতা গল্প কয়টিকে সাহিত্য ও সাহিত্যিক বিষয় বলা যেতে পারে।

দুই সিংহ সাহিত্যিকের আত্মম্ভরিতায় হাস্যকর। রামধনের বৈরাগ্য এক শ্রেণীর সাহিত্যিকের মনোভাব সম্বন্ধে এবং বটেশ্বরের অবদান এক শ্রেণীর পাঠকের উপরে সাহিত্যের প্রভাব সম্বন্ধে ব্যঙ্গচিত্র। দ্বান্দ্বিক কবিতা এক শ্রেণীর সাহিত্যিকের পরিণাম সম্বন্ধীয় সরস বিবরণ।

১৯২২-এ প্রথম গল্প প্রকাশের পর থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত

পরশুরামের যে গল্পধারা প্রকাশিত হয়েছে, তাদের মধ্যে বাঙালীর সামাজিক পরিবর্তন সুষ্ঠুভাবে প্রতিফলিত। গড্ডলিকা ও কজ্জলীর গল্পগুলিতে চল্লিশ, পঞ্চাশ বছর আগেকার সামাজিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের চিত্র। তারপরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, সামাজিক অশান্তি, দুর্ভিক্ষ, দেশ-বিভাগ, স্বাধীনতালাভ ও তৎপরবর্তী অশান্ত অবস্থা রামরাজ্য, শোনা কথা, বালখিল্যগণের উৎপত্তি, গগন চটি, মাৎস্য ন্যায়, ভীম গীতা প্রভৃতি গল্পে চিত্রিত। কালান্তরে অবস্থার ব্যঙ্গ রসিকের দৃষ্টি এড়ায় নি।

পর্যায়ক্রমে আলোচিত গল্পগুলির বাইরে এমন অনেকগুলি গল্প আছে যা পরশুরামের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির মধ্যে। লক্ষ্মীর বাহন, পরশপাথর বরনারীবরণ, বদন চৌধুরীর শোকসভা, চিকিৎসা-সঙ্কট, ভুশণ্ডির মাঠে, কচি-সংসদ, বিরিঞ্চি-বাবা, কাশীনাথের জন্মান্তর প্রভৃতি ব্যঙ্গরসের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

॥ ১৫ ॥

এবারে উপসংহার। আমাদের যা বক্তব্য প্রবন্ধ মধ্যে নানা প্রসঙ্গে তা কথিত হয়েছে। উপসংহারে সেই সব পুরোনো কথা দু-একটা স্মরণ করিয়ে দেওয়া যেতে পারে। প্রধান কথাটা এই যে, ব্যঙ্গরচনার ক্ষেত্রে পরশুরামের একমাত্র দোসর ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়। রচনার পরিমাণ, শ্রেণীভেদ ও বৈচিত্র্যে ত্রৈলোক্যনাথ বোধ করি পরশুরামের উপর। আবার রচনার সূক্ষ্মতায়, ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণতায়, বুদ্ধির অনুশীলনে পরশুরামের শ্রেষ্ঠতা। কঙ্কাবতীর মত উপন্যাস পরশুরাম লেখেন নি। কঙ্কাবতী উপন্যাস-খানিকে অবলম্বন করলে ত্রৈলোক্যনাথের মোটামুটি পরিচয় পাওয়া যায়। পরশুরামের ক্ষেত্রে সেরকম কোন অবলম্বন নেই, অন্ততঃ কুড়ি-পঁচিশটি গল্পকে গ্রহণ না করলে তাঁর মোটামুটি পরিচয় লাভ সম্ভব নহে। গল্পলেখকের পক্ষ এ এক মস্ত অসুবিধে। দুজনেই

উচ্চ-পটীয়ান স্রষ্টা, তবে দুয়ে প্রভেদ আছে। ত্রৈলোক্যনাথের ব্যঙ্গ প্রচ্ছন্ন অশ্রু ঘেঁষা, পরশুরামের প্রচ্ছন্ন তিরস্কার ঘেঁষা, ব্যতিক্রম দুই ক্ষেত্রেই আছে। ত্রৈলোক্যনাথের গল্পগুলির উদ্ভব ও পরিবেশ গ্রামাঞ্চল, পরশুরামের কলকাতা শহর। এ ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম আছে। উদ্ভব ও পরিবেশের ভেদে দুজনের গল্পে বিষয়, মনোভাবে ও টেকনিকে ভেদ ঘটেছে। পরশুরামের অসুবিধে এই বাংলা-দেশের গ্রামাঞ্চলকে তিনি জানেন না বললেই হয়। না জানুন তাতে ক্ষতি নেই, কলকাতা শহরের অনেক পথঘাটও বিভিন্ন অঞ্চলকে সাহিত্যে তিনি স্থায়ীভাবে চিত্রিত করে গিয়েছেন, সেই সব চিত্রে পাঠক বাস্তবের অতিরিক্ত কিছু পায়, ফলে কলকাতা শহর ব্যঙ্গের তির্যক-ছটায় কিছু পরিমাণে সত্যতর হয়ে ওঠে। আজ একশো বছরের উপরে বাঙালী সাহিত্যিকগণ কলকাতা শহরকে সাহিত্যের মানচিত্রে স্থায়িত্ব দেবার চেষ্টা করছেন, দুর্ভাগ্যের বিষয় প্রধান সাহিত্যিকত্রয় মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে তেমন কোন মন দেন নি। তাঁদের রচনায় বাংলাদেশের পল্লীঅঞ্চলে সত্যতর হয়ে উঠেছে। ডিকেন্স লণ্ডন শহরের জন্য যা করেছেন, কলকাতা শহরের জন্যে এখনও কেউ তা করেন নি। কলকাতা শহরের ডিকেন্স এখনও ভবিতব্যের গর্ভে। পরশুরামের রচনায় কিঞ্চিৎ পরিমাণে এ চেষ্টা আছে। তিনি প্রতিভায়, পরিচয়ে ও স্বভাবে Urban বা নাগরিক। সেই জন্য তাঁর রচনা ত্রৈলোক্যনাথের চেয়ে অনেক বেশী মার্জিত, অনুশীলিত ও ভব্যতাযুক্ত। অন্যপক্ষে সৃষ্টির প্রাণশক্তির প্রাচুর্য ত্রৈলোক্যনাথে বেশী। তবে দুজনকে প্রতিদ্বন্দ্বী মনে না করে পরিপূরক মনে করাই অধিকতর সংগত। তাঁদের রচনাকে সামগ্রিকভাবে গ্রহণ করলে বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চল ও নগরপ্রধান কলকাতা শহরকে যেন একত্রে পাওয়া যায়। এ একটা মস্ত সৌভাগ্য। সুবল গড়গড়ি ও জাবালি যতই ভিন্নস্তরের ব্যক্তি হোক এক জায়গায় দুজনের মিল আছে। একজন হৃদয় দিয়ে, অপরজন

বুদ্ধি দিয়ে সংসারকে বুঝতে চেষ্টা করেছেন, কেউই স্থিতাবস্থাকে স্বীকার করে নেন নি। এদের দুজনকে ব্যঙ্গ রসিকদ্বয় Symbolic Hero বলেছে, ত্রৈলোক্যনাথ ও পরশুরামের প্রতিনিধি হিসাবে তাদের পাঠকের সম্মুখে এনে দিয়ে আমাদের বক্তব্য সমাপ্ত করলাম।

॥ ১৮ ॥

রাজশেখর বসু স্বনামে অনেকগুলি বই লিখেছেন। তার মধ্যে প্রধান চলন্তিকা অভিধান এবং রামায়ণ ও মহাভারতের সংক্ষিপ্ত সারানুবাদ।

সুখের বিষয় বাংলা ভাষায় অতিকায় অভিধানের অভাব নেই, তৎসত্ত্বেও চলন্তিকা অপরিহার্য। প্রথম কারণ, এর আয়তন বিভীষিকা-ব্যঞ্জক নহে, যে সব শব্দ সাহিত্যে ও সংলাপে নিত্য চলে চলন্তিকা তারই সংযোগ। দ্বিতীয় কারণ, বাংলাভাষা, বানান ও বানানচিহ্নে অরাজকতার মধ্যে একটি নিয়ম প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা আছে। তৃতীয় কারণ, পরিশিষ্টে প্রদত্ত বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক বিষয়ে পরিভাষা সংকলন। প্রধানতঃ এই তিনটি কারণে সাহিত্য-ব্যবসায়ীদের পক্ষে অর্থাৎ সাহিত্যিক, সাংবাদিক, শিক্ষক, অধ্যাপক ছাত্র এবং প্রুফ-রীডারদের পক্ষে চলন্তিকা অপরিহার্য সঙ্গী। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস, সুবলচন্দ্র মিত্র, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির অভিধানের স্থান আলমারীতে, চলন্তিকার স্থান লেখার টেবিলের উপরে। অভিধানের পক্ষে এর চেয়ে প্রশংসার কথা আর কি হতে পারে জানি না। শুধু এই বইখানা লিখলেই রাজশেখর বসু বাংলা ভাষায় স্মরণীয় হয়ে থাকতেন।

কোন বৃহৎগ্রন্থের সংক্ষেপণ একপ্রকার নিষ্ঠুর কার্য। সে গ্রন্থ আবার যদি মহৎ হয়, তবে এই নিষ্ঠুরতা প্রত্যবায়ের পর্যায়ে পৌঁছতে পারে, কিন্তু রাজশেখর বসু প্রত্যবায়গ্রস্ত হন নি তার কারণ রামায়ণ মহাভারত তথা প্রাচীন শাস্ত্রের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা। এই

শ্রদ্ধার প্রেরণাতেই তিনি রামায়ণ মহাভারতকে নবকলেবর দান করেছেন। মহাভারতের তুলনায় রামায়ণ ক্ষুদ্রকায় গ্রন্থ, কাজেই এখানে কার্যটি দুষ্কর হয় নি। মূল কাহিনীকে সহজ বাহ্য আকারে তিনি লিপিবদ্ধ করতে সমর্থ হয়েছেন। মহাভারতের ক্ষেত্রে তাঁর চেষ্টা তর্কাতীত নয়।

কাহিনী, উপকাহিনী, উপদেশ ও অনুশাসনে গঠিত মূল মহাভারতে লক্ষাধিক শ্লোক। এ হেন তিমিঙ্গিল মহাগ্রন্থকে আটশ পৃষ্ঠার মধ্যে আনয়ন অসম্ভব বলেই মনে করতাম, যদি না রাজশেখর বসু হাতে কলমে তা সম্পন্ন করতেন। তার এ কাজ তর্কাতীত না হতে পারে, তবে আদৌ যে সম্ভব হয়েছে তাই বিস্ময়কর। যাই হোক এই দুই অবশ্যপাঠ্য গ্রন্থকে সহজায়ত্ত করে দিয়ে তিনি বাঙালীর মহৎ উপকার সাধন করেছেন। রামায়ণ, মহাভারত ও ইলিয়ডের মত ক্লাসিক গ্রন্থকে মূলভাষায় পাঠ করার প্রয়োজন সব সময়ে হয় না, সকলের পক্ষে তো কখনই হয় না, এদের মহত্ত্ব এমন আন্তরিক যে ভাষান্তর পাঠ করলেও তার স্বাদ লাভ করতে পারে পাঠকে। এই ভাবেই এই সব কাব্য চিরকাল পরিজ্ঞাত হয়ে আসছে। রাজশেখর বসু প্রদত্ত নবকলেবর সেই পরিজ্ঞপ্তির বিস্তারসাধন করে বাঙালী পাঠকের সম্মুখে আর একটা নূতন পথ খুলে দিয়েছে।

কবিশেখর কালিদাস রায়

কবিশেখর কালিদাস রায়ের শ্রেষ্ঠ-কবিতা প্রকাশিত হল। আগে প্রকাশিত আহরণ, আহরণী, সন্ধ্যামণি ও বর্তমান গ্রন্থকে একত্রে কবিশেখরের কাব্য-সংগ্রহ রূপ গ্রহণ করলে অন্যায় হবে না। সামান্য কিছু সংখ্যক কবিতা বাদ পড়লে বুঝতে হবে যে কবি সেগুলো সংগ্রহযোগ্য মনে করেন না। প্রবীণ কবিদের অনেকেই শ্রেষ্ঠ-কবিতা প্রকাশ করেছেন। সে-সব নির্বাচনমূলক, কবির পছন্দ-মত নির্বাচিত কবিতার সমষ্টি। কবিশেখরের শ্রেষ্ঠ-কবিতা অন্য রীতিতে সঙ্কলিত। ১৯২০ সালের আগে লিখিত কবিতা যেমন আছে তেমনি আছে একেবারে আধুনিক কালে লিখিত। এর সুবিধা এই যে গত পঞ্চাশ বছরের কবিতার পরিচয় অল্প আয়তনের মধ্যে পাওয়া যাবে। কিন্তু ঠিক কোন্ সময়ে কোন্ কবিতাটি লিখিত তার উল্লেখ না থাকায় পাঠকের সঙ্গে কালানুক্রমিকতা অনুসরণ সব সময়ে সম্ভব নয়। সংগ্রহ গ্রন্থে কবিতা বিন্যাসের দুটি নিয়ম সম্ভব, কালানুক্রমিক বা বিষয়ানুক্রমিক, তবে সব ক্ষেত্রেই কবিতা রচনার সময়ের উল্লেখ থাকা আবশ্যক। আশা করি পরবর্তী সংস্করণে এই ত্রুটি সংশোধিত হয়ে, হয় কালানুক্রমে নয় বিষয়ানুক্রমে কবিতাগুলি বিন্যস্ত হবে।

॥ ২ ॥

কবিশেখর পঞ্চাশ বছরের উপর কাবতা লিখছেন। তাঁর অনেক কবিতা চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর পাঠক-সমাজের সম্মুখে আছে এবং আদরণীয় হয়েই আছে। বর্তমান দ্রুত পরিবর্তনের যুগে এ কম সৌভাগ্যের বিষয় নয়। ধরে নিলে অন্যায় হবে না যে এই সব কবিতা বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করেছে।

কিন্তু কবিশেখরের সম্বন্ধে আমাদের অনুযোগ এই যে স্থায়িত্বলাভের একটি সহজ পন্থা তিনি বেছে নিয়েছিলেন। গত ত্রিশ বছরের মধ্যে বিদ্যালয়ে পাঠ্য এমন একখানি বাংলা পুস্তক প্রকাশিত হয় নি যাতে তাঁর এক বা একাধিক কবিতা নেই। এর ফল হয়েছে যে অনেক ক্ষেত্রেই তিনি পাঠ্যপুস্তকের কবিরূপে পরিচিত। পাঠ্যপুস্তকে কবিতার স্থানলাভ যে অগৌরবের এমন বলি না, কিন্তু যখন সেটাই প্রধান পরিচয় হয়ে দাঁড়ায় তখন চূড়ান্ত বিচারে কবিখ্যাতির অন্তরায় ঘটে। পাঠ্যপুস্তকের উপরে নির্ভর না করে যদি কিছুকাল অপেক্ষা করতেন তবে যে-আসন আজ লাভ করেছেন তার চেয়ে নীচুতে তাঁর আসন নির্দিষ্ট হত না নিশ্চয়। রবীন্দ্রনাথের কবিতা যখন পাঠ্যপুস্তকে সঙ্কলনযোগ্য বিবেচিত হত না, তখনই রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে পাঠক সমাজে সক্রিয় আগ্রহ ছিল, অনেক সময়ে সে আগ্রহ আস্তিন গুটানো হাতাহাতিতে প্রকাশ পেয়েছে। পরবর্তীকাল তাঁকে এমন সর্বতোভাবে স্বীকার করে নিয়েছে, জল ও হাওয়ার মত জীবনধারণের নিত্য উপাদানে তিনি পরিণত হয়েছেন যে সেটা অনেক সময় আগ্রহের অভাব বলেই মনে হওয়া অসম্ভব নয়। তবে বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকে কিছু প্রভেদ আছে। বিদ্যালয়ের কিশোর মন বিনা বিচারে স্বীকার করে নেয় আর সেই সহজ স্বীকৃতির সংস্কার পরবর্তীকালে কবিকে গভীরভাবে গ্রহণের অন্তরায়ে পরিণত হয়। অথচ কবিশেখরের কবিতায় এমন ভাবের গভীরতা, চিন্তার গাঢ়তা ও হাসির তির্যকছটা আছে যে পরিণত মনের গ্রহণযোগ্য বিষয়। কবিশেখর সম্বন্ধে সাহিত্য সমাজ যদি যথেষ্ট সচেতন না হয়ে থাকে, তাঁকে যদি যথোচিত স্পৃহণীয় আসন না দিয়ে থাকে, তবে সে দায়িত্ব অনেক পরিমাণে স্বয়ং কবিকেই বহন করতে হবে। আমাদের অনুযোগের কারণ এই যে বিদ্যালয়ের মধ্যে দিয়ে সাহিত্য সমাজে প্রবেশ করবার সহজ পন্থা বেছে নিয়ে কবি নিজের প্রতি অবিচার করেছেন, সেই সঙ্গে বাংলা কাব্যের প্রতি।

কেননা, রবীন্দ্রনাথের জীবনকালে যে কয়জন major কবির উদ্ভব হয়েছে নিঃসন্দেহে কবিশেখর তাঁদের অন্যতম।

নব্য বাংলা সাহিত্যে great বা মহাকবি দুজন, মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ। অনেকেই major কবি, minor কবির সংখ্যা আরও বেশি। যখনি কোন কবিকে major কবি বলে স্বীকার করে নেওয়া হয় তখনি বুঝতে হবে যে তাঁর মধ্যে কিছু স্বকীয়তা আছে, সমকালীন মহাকবির দ্বারা প্রভাবিত হলেও তাঁর স্বকীয়তা আচ্ছন্ন হয়ে যায় নি। হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র মধুসূদন প্রভাবিত, তাই বলে তাঁদের স্বকীয়তা লোপ পায় নি, পথ কেটে নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। রবীন্দ্র সমকালীন কবিদের সকলেই রবীন্দ্র প্রভাবিত। অক্ষয় বড়াল, দেবেন্দ্র সেন, দ্বিজেন্দ্রলাল, সত্যেন্দ্র দত্ত, করুণানিধান, যতীন্দ্রমোহন, যতীন্দ্রনাথ, কুমুদরঞ্জন, মোহিতলাল, নজরুল ইসলাম—এমন আরও অনেক নাম করা যেতে পারে। কবিশেখরও রবীন্দ্র প্রভাবিত, তৎসত্ত্বেও তাঁর স্বকীয়তা স্পষ্ট। এই স্বকীয়তা কী এবং কোথায় দেখিয়ে দেওয়াই সমালোচকের কাজ, সকলকে একসাপটা রবীন্দ্রানুসারী বলে মৌন-ভাবে সমাধিস্থ করলে সহজ সমাধান হয় বটে কিন্তু সে তো মুর্দা-ফরাসের কাজ। কবিশেখর রবীন্দ্র-প্রভাবিত হয়েও যে রবীন্দ্রানুসারী নন, তাঁরও যে একটি অনতিদীর্ঘ কক্ষপথ আছে সেটাই দেখিয়ে দিতে চেষ্টা করব।

॥ ৩ ॥

মহাকবিরা Poetic diction তৈরি করে নেন, সেই শব্দসম্ভার তাঁদের প্রতিভার মৌলিকত্ব প্রকাশ করে। আবার অনেক সময়ে সেই Poetic diction সংস্কারে পরিণত হয়ে তাদের পথের বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এ যুগে মধুসূদন নব্য কাব্যের Poetic diction তৈরি করলেন, কিন্তু মেঘনাদবধ কাব্য ও বীরাঙ্গনার পরে যে নূতন কাব্য লিখতে পারলেন না তার কারণ তাঁর সদা-জাগ্রত সমালোচক মন

বুঝল যে তাঁর তৈরি Poetic diction অতিক্রম করে যাওয়ার উপায় তাঁর নেই, পরবর্তী কাব্য রচনা প্রচেষ্টা পূর্ববর্তী কাব্যের অনুকরণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ বিপুল Poetic diction তৈরি করেছেন, অনেক ক্ষেত্রে তারা দুর্লঙ্ঘ্য সংস্কারে পরিণত হয়েছিল। গদ্য কবিতা রচনা এই সংস্কার লঙ্ঘন প্রয়াস। আরোগ্য, রোগশয্যায়, জন্মদিনে প্রভৃতি একেবারে জীবন-শেষের কয়েকখানি কাব্যে পাঠকে যে অপ্রত্যাশিত নূতনত্বের স্বাদ পায় তার কারণ, নিজের রচিত ভাষা-সংস্কারকে লঙ্ঘন করতে সক্ষম হয়েছিলেন তিনি। রবীন্দ্রনাথের সমকালে দ্বিজেন্দ্রলাল, সত্যেন দত্ত ও নজরুল ইসলাম কিছু কিছু Poetic diction বা ভাষা সংস্কার তৈরি করেছেন। বাকি সকলেই প্রধানত রবীন্দ্রনাথের Poetic diction-কে গ্রহণ করেছেন (কখনো কখনো বৈষ্ণব কবিদের Poetic diction ব্যবহারের দৃষ্টান্ত দেখতে পাওয়া যায়। "আধুনিক কবিতা"র যদি কিছু মূল্য থাকে তবে তা রবীন্দ্রনাথ রচিত ভাষা সংস্কার লঙ্ঘন চেষ্টায়)। এখানেই প্রধানত রবীন্দ্রভাব। যুগধর্মোচিত রবীন্দ্রপ্রভাব সত্ত্বেও পূর্বোক্ত major কবিগণ স্বকীয় প্রভায় উজ্জ্বল। এ উজ্জ্বলতায় অবশ্যই রবিরশ্মির দিব্যপ্রভা নাই, কিন্তু গৃহদীপের স্নিগ্ধভাস্বরতা নিশ্চয় আছে। কোন কোন ক্ষেত্রে হয়তো তার চেয়েও বেশি আছে। রবীন্দ্রযুগের মাঝ-খানেই একবার দ্বিজেন্দ্রলাল মন্দ্র ও আষাঢ়ের বজ্রচকিত অট্টহাস্যে পাঠক সমাজকে চমকিয়ে দিয়ে চলে গেলেন। তার পরে নজরুল ইসলাম ধূমকেতুর প্রলয় ছন্দের আলোয় ও আলোড়নে আর একবার সচকিত করেছিলেন পাঠকসমাজকে। সত্যেন্দ্র দত্তর বিচিত্র ছন্দের ভুজঙ্গপ্রয়াতে এখনো চোখ ধাঁধিয়ে রেখেছে। এ সবই সত্য। কিন্তু বজ্র, বিদ্যুৎ ও ধূমকেতুর প্রচণ্ড ভাস্বরতা নেই বলেই গৃহদীপের মূল্য কিছু কম নয়। চোখ ধাঁধিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা নেই—হয়তো সেখানেই তার যথার্থ মূল্য।

॥ ৪ ॥

কবিশেখরের কবিতার বিস্তারিত আলোচনা করবার আগে তাঁর জীবনীর একটা খসড়া দেওয়া আবশ্যক। জীবনী আলোচনাতে সেইসব ঘটনার উপরেই জোর দেব বর্তমান লেখকের মতে তাঁর কবিধর্মগঠনে যার কিছু প্রাসঙ্গিকতা থাকা সম্ভব।

১৮৮৯ সালে জুলাই মাসে কবিশেখর জন্মগ্রহণ করেন, পিতার নাম যোগেন্দ্রনারায়ণ রায়। কবি" পিতৃনিবাস বৈষ্ণবতীর্থ শ্রীখণ্ডের নিকটবর্তী কড়ুই গ্রামে এ অঞ্চলে অনেক প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবকবির জন্মস্থান তবু পুত্রের নামকরণ হল কালিদাস। হয়তো পিতার সংস্কৃত কাব্যপ্রীতি এর কারণ। কারণ যাই হোক, সংস্কৃত কবিদের নামে সন্তানগণের নামকরণের রীতিটি আজো প্রচলিত আছে কবিশেখরের পরিবারে। পিতৃনিবাসের আবহাওয়া থেকে প্রাপ্ত বৈষ্ণব কবিদের প্রভাবের সঙ্গে মিলেছে পিতার নিকট থেকে পাওয়া সংস্কৃত-কাব্যের প্রতি প্রীতি। অন্তত, দুটো ধারাই পাশাপাশি বর্তমান তাঁর কাব্যে।

স্বগ্রামে মাইনর স্কুলের পাঠ সাঙ্গ করে বালককবি এলেন বহরমপুরে। এখানকার মিশনারী স্কুল ও কৃষ্ণনাথ কলেজে কাটে তাঁর বাকি শিক্ষাজীবন। কৃষ্ণনাথ কলেজ থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে বি-এ পাস ক'রে জীবিকার অর্জনে নিযুক্ত হলেন তিনি। কিন্তু তার আগে কিছুকাল কাশিমবাজার আশুতোষ চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন ক'রে গেলেন। কবিশেখরের রচনার সঙ্গে যাঁদের কিছু পারচয় আছে তাঁরাই জানেন যে তাঁর সংস্কৃত জ্ঞান গভীর ও ব্যাপক, সংস্কৃত অলঙ্কার ও ব্যাকরণেও তাঁর প্রবেশ অসামান্য। খুব সম্ভব চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন কালেই এই জ্ঞান অর্জিত হয়।

এবারে কবিশেখরকে যেতে হয় রংপুর জেলার উলিপুর গ্রামে উচ্চ

বিদ্যালয়ের শিক্ষকরূপে, সেখানেই তিনি পরে প্রধান শিক্ষকপদ গ্রহণ করেন। ১৯১৩ সাল থেকে ১৯২০ সাল কাটে সেখানে। কবিশেখরের কাব্যে বাংলার পল্লীর যে চিত্র ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের যে বর্ণনা পাওয়া যায় তার উন্মেষ বাল্যকালে স্বগ্রামে হয়ে থাকলেও এই সময়ে তার বিকাশ ঘটে মনে করলে অন্যায় হবে না। সাত বছর পরে উত্তরবঙ্গের পাট তুলে দিয়ে কবি চলে এলেন দক্ষিণ বঙ্গে, এগার বছর কাটান বড়িশা উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষকরূপে। অবশেষে কলিকাতার সর্বগ্রাসী আকর্ষণ তাঁকে টেনে নিয়ে এল শহরতলি থেকে খাস কলকাতা শহরে আর ১৯২১ থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত কাটল ভবানীপুরের মিত্র স্কুলে অন্যতম শিক্ষক পদে। এই সময়ে দক্ষিণ কলকাতায় 'সন্ধ্যার কুলায়' নামাঙ্কে স্বগৃহ নির্মাণ করে কবিশেখর স্থায়ীভাবে বাসিন্দা হন কলকাতা শহরে।

শিক্ষকতা করবার সময়ে কবি পাঠ্যপুস্তক রচনায় উদ্যোগী হন। খুব সম্ভব অর্থের বিচারে তাঁর উদ্যোগ সফল হয়েছে, কিন্তু গোড়াতে আমরা যে অনুযোগ তুলেছিলাম তার মূল এখানে। পাঠ্যপুস্তক রচনা করেই কবি ক্ষান্ত হন নি, নিজের কবিতাও সঙ্কলিত করে দিয়েছেন। এই সূত্রে বিদ্যালয় জগতে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ে শিক্ষক, কবিশিক্ষক ও উদ্যোগী পাঠ্যপুস্তক-সঙ্কলক বলে তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করেছে সত্য, কিন্তু কবি-জগতে যে আসনখানি তাঁর স্বাভাবিক অধিকারে প্রাপ্য, সেখানে কিঞ্চিৎ বিঘ্ন ঘটিয়েছে।

আসল প্রসঙ্গে প্রবেশের আগে কবিশেখরের অন্যান্য শ্রেণীর রচনা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ মন্তব্য করা আবশ্যক। সাহিত্য ও সাহিত্যের ইতিহাস সম্বন্ধে যে পাঁচ-ছয়খানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন তা আদৌ বিদ্যালয়ের 'পাঠ্যপুস্তক' বা কলেজের 'নোটবই' শ্রেণীর রচনা নয়। এ সব গ্রন্থে গবেষণা; পাণ্ডিত্য ও চিন্তার পরিচয় আছে। ইদানীং কবি রম্যরচনায় মনোনিবেশ করেছেন। চণক সংহিতা, রঙ্গচিত্র ও চালচিত্র নামে কবির তিনখানি রম্যরচনাগ্রন্থ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। এই সব রচনার

মূল কবিশেখরের কবিতায় আছে। হাস্যরস ও ব্যঙ্গরস, সামাজিক ও সাংসারিক অভিজ্ঞতার চিত্র অনেক এঁকেছেন তিনি কবিতায়—সেই হাস্য ও ব্যঙ্গ, সেই ভূয়োদর্শন ঘনীভূত হয়ে সৃষ্টি করেছে এই সব রম্যচিত্রগুলোকে। বেশ বুঝতে পারা যায় উচ্চশ্রেণীর গল্পলিখিয়ের কলম ছিল তাঁর হাতে, প্রথম জীবনে তিনি তার ব্যবহার করেন নি, হয়তো নিজেই সচেতন ছিলেন না, তবু দেখা যাচ্ছে যে সে কলমে মরচে পড়ে নি। কেনই বা পড়বে, বাণীর রাজহংসের পাখনা তো স্টীলের নিব নয়। এই রচনাগুলোর সঙ্গে কবির এক শ্রেণীর কবিতার গভীর আত্মীয়তা অনুভব করি বলেই এত কথা বলতে হল। বয়সে প্রবীণ এবং আসনে প্রতিষ্ঠিত কবিশেখরের পরবর্তী কালের জীবন নানা সূত্রে সুপরিজ্ঞাত; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রদেশ কংগ্রেস কর্তৃক তিনি সম্মানিত; সন্ধ্যার কুলায় গুণগ্রাহীদের যাতায়াতে মুখরিত; বললে অত্যুক্তি হয় না যে সাধনার সিদ্ধিরূপে কবিশেখর ব্যক্তির সীমা অতিক্রম করে এখন একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত। তাঁর সুদীর্ঘ ও শান্তিময় জীবন কামনা ক'রে এবারে আসল প্রসঙ্গে প্রবেশ করব।

॥ ॥

বাল্যকালে দেখতাম গাঁয়ের ছেলেরা আমাদের বাড়িতে এসে ঘুড়ি তৈরি করবার জন্য 'বঙ্গবাসী' কাগজ চাইতো। তখনকার দিনে 'বঙ্গবাসী' ছিল সমধিক প্রচারিত সংবাদপত্র। তাই তাদের কাছে সংবাদপত্র মাত্রই ছিল 'বঙ্গবাসী'। এযুগে রবীন্দ্রকবিতা সমধিক প্রচারিত তাই এক শ্রেণীর সমালোচকের চোখে সব কবিতাই রবীন্দ্রকবিতা অর্থাৎ কি না রবীন্দ্রানুসারী কবিতা। এ সেই গ্রাম্য বালকের দৃষ্টি।

রবীন্দ্র-কাব্যের প্রভাব দ্বিজেন্দ্রলাল ও অক্ষয় বড়ালের কোন কোন কবিতায় আছে তবু তাঁরা নিশ্চয় রবীন্দ্রানুসারী নন। এযুগের

সমস্ত কবির কাব্যেই অল্প বিস্তর রবীন্দ্র-প্রভাব আছে, এমনকি "রবীন্দ্র-বিরোধী" কবিগণের কাব্যেও আছে, তাই বলে তাঁরা সকলেই যে রবীন্দ্রানুসারী এমন নয়। সাহিত্য সমালোচনায় বাঁধাবুলি বড় সহজে চলে। পাঠকে লেখকের গায়ে একটা লেবেল আঁটা দেখতে চায়, তাতে তাদের চিন্তার ভার লাঘব হয়। এ ক্ষেত্রে রবীন্দ্রানুসারী লেবেলের কাজ করে। কবির প্রতি অবিচার হল, কি না সে তর্কে প্রবেশ করছে কে?

আগে Major কবি বলে যে সব কবির নাম উল্লেখ করেছি তাঁরা সকলেই অল্পবিস্তর রবীন্দ্র-প্রভাবিত হওয়া সত্ত্বেও সকলেরই অল্পবিস্তর স্বতন্ত্র কক্ষপথ আছে। এই স্বাতন্ত্র্যের মূল কোথায় আলোচনা করা যেতে পারে। রবীন্দ্র-প্রতিভা মূলতঃ রোমান্টিক। এর বিপরীত একটা রস আছে যাকে বলা যেতে পারে Domestic বা গার্হস্থ্য রস। এই গার্হস্থ্যরসের গুণেই তাঁদের স্বাতন্ত্র্য। Poetic diction এবং ছন্দে মিল থাকা সত্ত্বেও গার্হস্থ্যরসের উপস্থিতি হেতু তাঁদের স্বতন্ত্রতা। এযুগে দেবেন্দ্র সেন, অক্ষয় বড়াল, কুমুদরঞ্জন ও কবিশেখর কালিদাস যে পরিমাণে গার্হস্থ্যরসের কবি সেই পরিমাণে তাঁরা স্বতন্ত্র, সেই পরিমাণে তাঁরা অ-রোমান্টিক অর্থাৎ অ-রবীন্দ্রানুসারী। রবীন্দ্রনাথের অন্তর্দৃষ্টি সহজেই এ কথাটা বুঝেছিল। তিনি কবিশেখরের কবিতা পড়ে মন্তব্য ক'রে ছিলেন—"তোমার এই কাব্যগুলি পড়িলে বাংলার ছায়া-শীতল নিভৃত আঙিনার তুলসীমঞ্চ ও মাধবীকুঞ্জ মনে পড়ে।" কবিশেখরের কাব্যে কবিগুরু বাংলাদেশের একটি কল্যাণমধুর গৃহের ছবি দেখতে পেয়েছেন। এখানেই গার্হস্থ্যরসের পরিচয়। কবি-শেখরের কাব্যে রোমান্টিক রসের কবিতা নেই এমন বলি না। এযুগে কবিতা লিখতে বসলে নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও বা ক্ষমতার অভাব থাকা সত্ত্বেও কখনো না কখনো রোমান্টিক কবিতা লিখতে হবেই। তবে তাঁর সমবয়স্কদের মধ্যে কবিশেখরের রোমান্টিক কবিতার ন্যূনতা সহজেই চোখে পড়ে। তুলনায় যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের রোমান্টিক

কবিতার সংখ্যা অনেক বেশি, যদিও কোন কোন মহলের মতে তিনি প্রধান "রবীন্দ্রবিরোধী" এবং রবীন্দ্র-বিরোধিতার গঙ্গোত্রী। রবীন্দ্রনাথের শরৎ কবিতার পাল্টা জবাবে লিখিত শরতের বঙ্গভূমি এবং দ্বিজেন্দ্রলালের পাল্টা জবাবে গঙ্গাস্তোত্র নাকি ঘোরতর অ-রোমান্টিক ও বাস্তববাদী। কিন্তু সত্যি তাই কি? বিষয়ের প্রকৃতি দিয়ে কাব্যের প্রকৃতি বিচার করলে চলবে না, ঐ বিষয় নির্বাচনের মূলে কবিত্বের যে প্রেরণা আছে তাই দিয়ে কবিতার প্রকৃতি বিচার করতে হবে। রোমান্টিক দৃষ্টি জগতের দিকে "তেরছ নয়নে" তাকিয়ে দেখে, তাই সমস্তই তার চোখে অভিনব। অভিনবত্ব সৃষ্টি রোমান্টিক কবিতার মূল কথা। অভিনবত্ব সৃষ্টি করতে গিয়ে অনেক সময়ে বাড়াবাড়ি ঘটে, অবাস্তবতা আসে, উদ্ভট ও অদ্ভুতের (queer) আমদানী হয় এবং অবশেষে রোমান্টিক কবিতা লোকচক্ষে হেয় হয়ে পড়ে। তৎসত্ত্বেও স্বীকার না করে উপায় নেই যে অভিনবত্ব সৃষ্টির প্রেরণাতেই রোমান্টিসিজমের জন্ম। রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলাল এক প্রকারে অভিনবত্ব সৃষ্টি করেছেন, যতীন্দ্রনাথ আর এক প্রকারে করতে চেষ্টা করেছেন। ছোট ছেলেরা খেলবার সময় মাথা নীচু করে পায়ের ফাঁক দিয়ে পরিচিত পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে যায়। এ-ও রোমান্টিক অভিনবত্ব সৃষ্টি-প্রয়াস ছাড়া আর কিছুই নয়। যতীন্দ্রনাথের এ দুটি কবিতা ছোট ছেলের মাথা নীচু করে পায়ের ফাঁক দিয়ে জগৎদর্শন। অবাস্তব সত্য—কিন্তু অভিনব নিঃসন্দেহ। পূর্বোক্ত major কবিদের মধ্যে যতীন্দ্রনাথ ও করুণানিধানে রোমান্টিক গুণ সবচেয়ে বেশি, তারপরে যতীন্দ্র বাগচিতে, এই গুণ সবচেয়ে কম কুমুদরঞ্জনে ও কবিশেখরে। রোমান্টিক গুণ সবচেয়ে কম আবার গার্হস্থ্যরস সবচেয়ে বেশি। আর সেইজন্য তাঁরা রবীন্দ্রানুসারী না হয়ে রবীন্দ্রস্বতন্ত্র।

উদাহরণ সমালোচনার সার। কবিশেখরের কাব্য থেকে কয়েকটি ছবির টুকরো উদ্ধার করে দিচ্ছি, গার্হস্থ্যরসের উদাহরণ পাওয়া যাবে।

বারো বছরের গোটা গ্রামখানি
এ বুকে রয়েছে জাগি,
সেই এঁধো ডোবা পাড়ে খড়োঘর,
প্রাণ কাঁদে তার লাগি।

আবার—

নর-নারী প্রেতমূর্তি ভোগে শুধু জ্বরে,
খাদ্য আছে সাধ্য নাই, খায় তাহা, শুধু পথ্য করে।
তাহারা ভাতের চেয়ে সাগুদানা খায় বেশিদিন,
সাগুর চেয়েও বেশি খায় কুইনিন।

অপিচ,

বিজলির বাতি জ্বলে বড় বড় শহরে
ছোট ছোট শহরেতে কেরোসিন।
দীনের কুটীরে গ্রামে, বস্তির ভিতরে
দীপশিখা জ্বলিতেছে চিরদিন।

এবং

হাঁসগুলি ফিরে ঘরে শ্রান্ত পদে সন্তরণ ছাড়ি,
কৃষকেরা ফিরে ঘরে শুষ্ক ক্ষেতে জলসেচ সারি।

আরও আছে—

মাঝে মাঝে শোনা যায় শিশুর কাঁদন আর
কুকুরের ডাক

উদাহরণ তুলে দিয়ে শেষ করা সম্ভব নয়, এমন কি কবিতার নাম লিখতে গেলেও তালিকা দীর্ঘ হয়ে পড়বে, তাই মাত্র কয়েকটি কবিতার নামোল্লেখ করছি।

ছা-পোষার হাল, ধ্বংসাবশেষ, কৈশোর-স্মৃতি, জীর্ণ সৌধ, কৃষকের শোক, প্রভৃতি যে কোন কবিতা পড়লে বুঝতে পারা যাবে গার্হস্থ্য রস বলতে কি বোঝাতে চাই। সমালোচকের ভাষ্যের চেয়ে কবির

ভাষার গুণ বেশি, তাই একটি শ্লোক উদ্ধার করে দিয়ে নিজের দায়িত্ব লাঘব করি।

রবীন্দ্রনাথের গানে পরিতৃপ্ত কান
তবু ভাল লাগে আজো নিধু দাশু শ্রীধরের গান।
কতই বিলাস হর্ম্যে ভরি আছে এই রাজধানী,
তবু ভাল লাগে সেই তকৃতকে বেঁশো ঘরখানি,
পাঁশ-ঢিবি বাঁশ ঝাড় কলা বনে ঘেরা
বাঁধা যার চারিপাশে, রাংচিতা বেড়া॥

অধিক ব্যাখ্যা অনাবশ্যক। রবীন্দ্রনাথ রোমান্টিক ও আইডিয়াল, নিধু, দাশুরথি শ্রীধর এবং সেই সঙ্গে আমরা যোগ ক'রে দিতে পারি কবিশেখর, কুমুদরঞ্জন, দেবেন্দ্র সেন, অক্ষয় বড়াল প্রভৃতি domestic ও রিয়াল, ক্ষণিকায় ও ছিন্নপত্রাবলীতে পল্লী-বাংলার যেমন চিত্র আছে তেমন আর কোথাও নেই; তবে সে সমস্তই রোমান্টিক ও আইডিয়াল। পূর্বোক্ত কবিগণ অঙ্কিত চিত্রের সঙ্গে তার মূলগত ভেদ। বলাবাহুল্য এ ভেদ গুণে নয়, রসে। রবীন্দ্রনাথের শাজাহান কবিতাটির সঙ্গে কবিশেখরের শাজাহান মিলিয়ে পড়লে ভেদটা স্পষ্টতর হয়ে উঠবে। কবি চরাচরে যে দিকেই তাকান না কেন, সতত ও সর্বত্র তাঁর চোখে পড়ে মধ্য বিন্দুতে বিরাজমান একখানি গৃহ, যে-গৃহ অত্যন্ত রিয়াল, অত্যন্ত পরিচিত, যার মাটির দেয়ালে আঙুলের ছাপগুলো এখনো মিলিয়ে যায় নি, মিলিয়ে নেওয়া যায় মানুষটির হাতের সঙ্গে। এই গৃহের মাধ্যাকর্ষণেই বিধৃত কবির জগৎ, বলা বাহুল্য সে জগৎ রবীন্দ্রের সৌরজগৎ নয়। যোজনপ্রমাণ যে মাপকাঠিতে সৌরজগতের মাপজোক চলে সে মাপকাঠির প্রয়োগ এখানে চলবে না, এখানে সর্বত্রই বালখিল্য মাপের, এবং তার ক্ষুধা-তৃষ্ণা আশা-আকাঙ্ক্ষা গৃহসংসারের ক্ষুদ্র আঙিনার সঙ্কীর্ণ দিগন্তে সীমাবদ্ধ, কিন্তু তবু তারা কম সত্য; কম সুন্দর নয়। সাহিত্যের সাত

মহলা ভবনে এরও একটি সম্মানের আসন আছে। আর এ আসনের ইতিহাস বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত।

রোমান্টিক কাব্যের আলোচনা করতে বসলেই ইংরাজি সাহিত্যের Romantic Revival-এর কবিদের ইতিহাস মনে পড়ে যায়। যেমন সেখানেই রোমান্টিক মনোভাবের উৎস। এ কথা সত্য নয়। প্রত্যেক দেশের সাহিত্যের ইতিহাসেই রোমান্টিক কাব্যের উদাহরণ পাওয়া যাবে—কেননা রোমান্টিক প্রেরণা মানুষের মনের একটা স্বাভাবিক ও সর্বজনীন বৃত্তি, যুগধর্মে কখনও প্রবল কখনো অন্যথা। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বিচারে দেখা যাবে যে এখানে দুটি ভিন্ন অথচ সমান্তরাল প্রবাহ আছে। একটি গীতি-কাব্য অন্যটি আখ্যায়িকা কাব্য, কাজের সুবিধার জন্যে বলা যেতে পারে একটি পদাবলীকাব্য অন্যটি মঙ্গলকাব্য, আপেক্ষিক বিচারে একটির রোমান্টিক প্রেরণা, অন্যটির Domestic প্রেরণা। অপ্রাপ্ত, অপ্রাপ্য, ইন্দ্রিয়াতীত, অপ্রত্যহ রোমান্টিক কাব্যের সামগ্রী আর করায়ত্ত, প্রত্যক্ষ, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, প্রাত্যহিক Domestic বা গার্হস্থ্য রসের সামগ্রী। বৈষ্ণব গীতিকাব্যে এবং মঙ্গলকাব্যে মোটের উপরে এই প্রভেদ। তবে এ ভেদ জল-অচল নয়। বৈষ্ণব কাব্যে বাৎসল্য ও সখ্য রসাশ্রিত পদগুলোর Domestic মনোভাবের দিকে ঝোঁক, আবার মঙ্গল কাব্যের কোন কোন আখ্যায়িকায় যেমন মুকুন্দরামের ধনপতি সদাগরের কাহিনীতে ঝোঁকটা রোমান্টিকতার দিকে। সব দেশের সাহিত্য বিশ্লেষণ করলে এরকম ভিন্ন প্রেরণার যুগ্ম প্রবাহ দেখতে পাওয়া যাবে। নব্য বাংলা সাহিত্যেও এই দুই ধারা সমান্তরালে বহমান। এ যুগে প্রধানতঃ বহমান। এ যুগে প্রধানতঃ রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে ও প্রতিভায় রোমান্টিক কাব্য তুঙ্গ স্পর্শ করেছে, অন্য রসের ধারা ক্ষীণ। ক্ষীণ কিন্তু একেবারে নগণ্য নয়, অক্ষয় বড়াল, দেবেন্দ্র সেন, দ্বিজেন্দ্রলাল, কুমুদরঞ্জন ও কবিশেখর কালিদাস রায়ের কাব্যে (গদ্যে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে) এই

রসের প্রবাহ। এঁরা মূলতঃ কেউ রবীন্দ্রানুসারী নন, রবীন্দ্রস্বতন্ত্র। গোড়াকার এই কথাটি না বুঝলে এঁদের কাব্য ভুল বুঝবার আশঙ্কা। তাই কিছু দীর্ঘ প্রচেষ্টা করতে হল।

॥ ৬ ॥

ইংরেজ কবি Cowper-এর কাব্যধর্ম বিশ্লেষণ উপলক্ষ্যে বিখ্যাত ফরাসী আলঙ্কারিক Sainte-Beuye বলেছেন যে Cowper হচ্ছেন "the poet of quiet rural and domestic life." কবিশেখরের কবিপ্রকৃতির সঙ্গে এ বর্ণনা মিলে যায়, তিনিও পল্লীজীবনের ও গার্হস্থ্যরসের কবি। এ দিকটা আগেই ব্যাখ্যাত হয়েছে। কিন্তু দেখছি যে পূর্বোক্ত আলঙ্কারিক Cowper-এর কাব্য-ভাষার প্রকৃতি সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেছেন তা-ও মিলে যাচ্ছে কবিশেখরের কাব্যভাষার সঙ্গে এবং সে বিষয়ে আমার ধারণার সঙ্গে। "Every man conversant with verse writing knows and knows by painful experience, that the familiar style is of all styles the most difficult to succeed in. To make verses speak the language of prose without being prosaic,······is one of the most ardous tasks a poet can undertake." কবিশেখরের কাব্যের ভাষা ও তার চালচলন সম্বন্ধে এ কথা মোটের উপরে সত্য। তাঁর ভাষা সর্বদা গদ্যের গা ঘেঁষে চলেছে কিন্তু কোথাও সংঘাত ঘটে নি। একে তো কাব্যের বিষয়টা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাদাসিদে আটপৌরে, তার উপরে ভাষার এ হেন গদ্যঘেঁষা চাল, খুব সূক্ষ্মদর্শীর কাছে ছাড়া এমন কাব্যের সমাদর হওয়া কঠিন। এদিকে যুগধর্মেও আছে মস্ত অন্তরায়। নজরুলের আগ্নেয় মদিরা, সত্যেন্দ্র দত্তর ছন্দের শার্দূল-বিক্রীড়িত, রবীন্দ্রনাথকে আর এ বিষয়ের মধ্যে ধরছি না, এমন অবস্থায়—

"আগ্রা আসি মনে পড়ে, গিয়েছিনু দূরবর্তী গ্রামে,
শুক্লা অষ্টমীর চাঁদ যখন সে অস্তে নামে নামে"

কিংবা—

"ধানকে করে পরিণত বাড়া ভাতে।
এঁটো কাঁটা বাড়তি বাসি তার বরাতে।"

কিংবা—

"ব্যথা যে অবুঝ বড় যুক্তি সে না মানে।
এই যে সেনেট হল এর অঙ্গে গাঁইতি যে হানে"

এমন আটপৌরে নিরলঙ্কার ভাষার কি আশা-ভরসা। গার্হস্থ্যরস-প্রধান কাব্যে এ যে গৃহলক্ষ্মীর নিঃশব্দ অলক্ষ্য পদসঞ্চার। খুব সম্ভব কবি নিজেও এ বিষয়ে সচেতন, তাই আত্মরক্ষার স্বাভাবিক নিয়মের প্রেরণায় তিনি 'পাঠ্যপুস্তক'কে আশ্রয় করেছিলেন। এখন ভাবছি ভালই করেছিলেন, দুঃসময়ের বন্যায় একেবারে ভেসে যান নি। আজ যখন সাল-তামামিতে হিসাব-নিকাশের সুযোগ উপস্থিত হয়েছে। দেখতে পাচ্ছি যে কবিশেখর "পাঠ্যপুস্তক"র কবি নন, বাংলা কাব্যের একটি চিরন্তন ধারাশ্রয়ী এ যুগের একজন major বা প্রধান কবি, রবীন্দ্রপ্রভাব সত্ত্বেও যিনি নিজ স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছেন।

॥ ৭ ॥

কবিশেখরের কবিধর্ম ও কাব্যপ্রকৃতি সম্বন্ধে যথাসাধ্য আলোচনা করলাম। এবারে সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর ও তাঁর সমপর্যায়ভুক্ত কবিদের স্থান নির্ণয় প্রচেষ্টা। কাজটি অত্যন্ত দুরূহ, বিশেষ বর্তমান যুগে যখন সমস্ত মূল্য ও পূর্বসংস্কার সত্যপাতী। তৎসত্ত্বেও দু'একটি কথা বোধ করি নিঃসন্দেহে বলা সম্ভব। দুটি কারণে তাঁরা বাংলা সাহিত্যে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। প্রথম, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে যুগ-সংক্রমণের মধ্যে তাঁরা একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে বিরাজ-মান বলে, দ্বিতীয়, নিজেদের কৃতিত্বের দাবীতে। এ বিষয়ে পূর্বে লিখিত একটি প্রবন্ধে বিশদ আলোচনা করেছিলাম, এখানে তার প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধার ক'রে দিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

"তাঁহাদের কাব্য এমন একটি ধারাকে টানিয়া লইয়া চলিয়াছে যাহা বুঝি লোপ পাইতে চলিল। এ ধারা বাংলা সাহিত্যে নবাগন্তুক নয়, অতি প্রাচীন ; প্রচুর রবীন্দ্রপ্রভাব সত্ত্বেও এ ধারা আপন বৈশিষ্ট্য হারায় নাই ; রবীন্দ্রপ্রভাবের ফলে বাংলা কাব্যে যখন ক্রান্তিপাত ঘটিতেছিল তখন ইহারা ও ইহাদের মত কবিগণ নবীনকে অস্বীকার না করিয়া প্রাচীন কাব্য সংস্কারটিকে সাধ্যানুসারে সজীব করিয়া রাখিতে সচেষ্ট ছিলেন। বাংলা কাব্যের প্রাচীন ও নবীন খণ্ডে আজ যে ব্যবধান ইহাদের কাব্য তাহাকে একেবারে দুস্তর হইতে দেয় নাই। কেবল এই কারণেই তাঁহাদের কাছে বাঙালী পাঠকের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। সেকালের জগৎ হইতে মুকুন্দরাম চক্রবর্তী বা গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতি একালে পদার্পণ করিলে অনায়াসে এইসব কবির কাব্যের রস গ্রহণ করিতে সক্ষম হইতেন। কিন্তু কৃতজ্ঞতার আরো কারণ আছে। উচ্চাঙ্গ কাব্যরস বোদ্ধার সংখ্যা স্বভাবতই অল্প। অন্যপর্যায়ভুক্ত বৃহত্তর পাঠকসমাজের রসজীবন যাপনের মোটা অন্নবস্ত্র যোগাইবার ভার ইহাদের মত কবির উপরে, এদেশে, বিদেশে, সর্বদেশে ও সর্বকালে। কাব্যলক্ষ্মীর মহোৎসবে খাসমহলের নিমন্ত্রিতগণ ভূরিভোজন করুন আপত্তি নাই ; কিন্তু রবাহূত, অনাহূতগণ অভুক্ত ফিরিয়া যাইবে এমন তো হওয়া উচিত নয়। ইহাদের উপরে মোটা অন্ন পরিবেশনের ভার। সেকালে মোটা অন্নে ও রাজভোগে এমন প্রভেদ করা হইত না। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল পালা উদার হস্তে যে অন্ন বিলাইত তাহাতে রাজা ও রাখালের সমান রুচি ছিল। মহাজন পদাবলীতেও অন্নে বাছবিচার ছিল না। চৈতন্যদেবের প্রভাবে কেবল সমাজে জাতিভেদ শিথিল হয় নাই, কাব্যেও জাতিভেদ ছিল না। সেকাল কেবল সমাজে নয়, রসের ক্ষেত্রেও একান্নবর্তী ছিল। একালে সমাজে ও সাহিত্যে একান্নবর্তিতা লোপ পাইবার মুখে, সাহিত্যের খাসমহল হয়তো আয়তনে বাড়িয়াছে, কিন্তু সেই সঙ্গে যে বহিপ্রাঙ্গণের আয়তনও

বাড়িয়া গিয়াছে। সেখানে যাহারা পাতা পাড়িয়া বসিয়াছে তাহাদের কি ব্যবস্থা হইবে? একশ বছর আগে মধুসূদন যখন খাসমহলের ভার গ্রহণ করিতেছিলেন, তখন সাধারণে রস-বিতরণের ভার ছিল ঈশ্বর গুপ্ত ও তৎপূর্ববর্তী দাশরথি রায়ের উপরে। একালেও প্রয়োজন আছে। এমন যদি কখনও হয় যে, কাব্যলক্ষ্মীর প্রসাদের সাকুল্যই খাসমহলের ভোগে লাগিয়া যাইবে, আর প্রবেশানধিকারীর দল ফিরিয়া যাইবে শুষ্ক মুখে, তবে সেই সরস্বতীর ছিয়াত্তরের মন্বন্তর কখনই সমর্থনযোগ্য নয়।···

"'যোগ্যতমের উদ্বর্তন' তত্ত্ব অন্যান্য ক্ষেত্রের মত সাহিত্যক্ষেত্র সম্বন্ধেও সত্য। কিন্তু তর্ক উঠিবে যোগ্যতমের সংজ্ঞায়। এ সম্বন্ধে আমার ধারণা এই যে, সাহিত্য যেমন গতানুগতিককে সহ্য করে না, তেমনি খাপছাড়া ও অদ্ভুতকেও বহন করে না। খাপছাড়া ও অদ্ভুত কিছুদিনের জন্য মনোযোগ আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইলেও চিরদিনের পাট্টা তাহাদের নাই। সাহিত্যের ইতিহাস এ সত্যটিকে যেমন চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দেয় এমন আর কিছুকে নয়।

"এখন গতানুগতিক ও অদ্ভুতের মাঝখানে স্থান খুব প্রশস্ত। সেই স্থানে যাহারা আশ্রয় লাভ করে তাহাদের মার নাই। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবিদের স্থানও যেখানে, আবার **major** ও **minor poet**-গণের স্থানও সেখানে; মহাকবি ও অন্য পর্যায়ের কবিগণ এই প্রশস্ত ক্ষেত্রে আশ্রিত, অনেক সময়েই গায়ে গায়ে বিরাজ করে; কেবল অকবি ও কুকবি-গণের সেখানে স্থান হয় না। সমসাময়িক বহুঘোষিত ও বিচিত্রকীর্তি অনেক কবি ও কবিতা যখন খাপছাড়া ও অদ্ভুত বলিয়াই তলাইয়া যাইবে, তখনও ইহাদের সরল, প্রাঞ্জল, বাঙালীর পল্লী-জীবনের সুখ-দুঃখে, আশা-আনন্দে এবং গার্হস্থ্যরসে সমুজ্জ্বল যে কবিতাগুলি টিকিয়া থাকিবে তাহার পরিমাণ বড় অল্প নয়।"

ছোট গল্পের আত্মহত্যা

বাংলা ছোট গল্প আত্মহত্যা করতে উদ্যত। উদ্যত বললে কম বলা হয়, প্রক্রিয়াটা অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে এখন প্রায় অন্তিম মুহূর্ত। কেন এমন হল তা-ই এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। তার আগে একটা প্রাসঙ্গিক বিষয়ের আলোচনা সেরে নেওয়া যেতে পারে। বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ ছোট্ট ছোট লিরিক কবিতা এবং ছোট গল্প। প্রাচীন সাহিত্যে মঙ্গল কাব্যের কথা, বিশেষ চণ্ডীমঙ্গল ও অন্নদামঙ্গলের কথা বিস্মৃত না হয়েও বলা যায় যে বৈষ্ণব পদাবলীগুলিই উজ্জ্বলতম রত্ন। আবার প্রাচীন সাহিত্যে মেঘনাদবধ কাব্যের কথা ভুলে না গিয়েও বলা যায় যে গীতবিতান ও সঞ্চয়িতায় নিবদ্ধ কবিতা-গুলিই উজ্জ্বলতম রত্ন। এসব হল পদ্য। গদ্য সাহিত্যের বিস্তার অনেক বেশি, তাতে রত্নরাজিও সুপ্রচুর তৎসত্ত্বেও ছোট গল্পগুলি অতুলনীয়। উপন্যাস সৃষ্টির পরে ছোট গল্পের সূচনা হলেও উৎকর্ষে ছোটগল্প ছাড়িয়ে গিয়েছে উপন্যাসকে। ১৮৯০ সালে ছোট গল্পের সুত্রপাত রবীন্দ্রনাথের হাতে, ১৯৪০ সালে বোধ করি তাঁর শেষ ছোট গল্প লিখিত। পঞ্চাশ বছরের মধ্যে নানা শাখা-প্রশাখায় সঞ্চারিত হয়ে ছোট গল্প একটা পরিণতিতে পৌঁছেছে। এই সময়ের মধ্যে অনেক প্রতিভাবান ছোট গল্প লেখক দেখা দিয়েছেন, শরৎচন্দ্র, প্রভাতকুমার, পরশুরাম, তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। জীবিতগণের নাম করলে তালিকা আরও দীর্ঘ করা যেতে পারে। বাঙালী কবির কণ্ঠে অনায়াসে যেমন গান আসে তেমনি তার কলমে সহজে আসে ছোট গল্প। এঁদের অনেকের ছোট গল্প বিদেশী লেখকদের শ্রেষ্ঠ ছোট গল্পের সঙ্গে তুলনীয়। মাত্র পঞ্চাশ বছরের মধ্যে যে এমন উন্নতি সম্ভব হয়েছে তার দুটো কারণ, ভাষার মর্জি আর লেখকের মেজাজ। এখন এহেন সম্পদের আত্মবিনাশ সাধন পরিতাপের বিষয় না হয়ে যায় না। এখন জিজ্ঞাস্য কেন এমন

হল? অর্থাৎ এ দায়িত্ব কার? দায়িত্ব সকলকেই ভাগ ক'রে নিতে হবে আর তাতেই কেনর উত্তর পাওয়া যাবে।

এক সময় মাসিক পত্রাদিতে ছোট গল্পের আদর ছিল। এখন নেই এমন বলছি না তবে আগের মতো নয়। মাসিকে ছোট গল্পের আদর থাকলেও সেই সব ছোট গল্প যখন গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় তখন আর সে আদর থাকে না। যে কোন প্রকাশককে জিজ্ঞাসা করলেই জানতে পারা যাবে যে ছোট গল্পের বই বিক্রি হতে চায় না অর্থাৎ পাঠক উদাসীন বা অনীহাযুক্ত। কাজেই বিচারটা পাঠকের দিক থেকে আরম্ভ করা যাক।

পাঠক অর্থাৎ খদ্দের বইয়ের দোকানে এসে বই হাতে নিয়ে শুধায় একটানা তো? অস্যার্থ কাটা কাটা ছোট গল্প চলবে না, একটানা উপন্যাস হওয়া চাই, তার উৎকর্ষ বা লেখক যেমনি হোক। প্রকাশক সরাসরি উত্তর না দিয়ে বল্‌ল দেখুন না। খদ্দেরের তাড়া আছে, বই কেনাই একমাত্র কাজ নয়, তাই সে একবার দ্রুত পাতাগুলো উল্টে গেল। পাতার উপরে নাম নেই, বোঝা যায় না উপন্যাস কি ছোট গল্প। পৃষ্ঠার মধ্যে মাঝে মাঝে ছোট গল্পের নামাঙ্ক থাকলেও ব্যস্ততায় চোখে পড়লো না। তার উপরে যখন বইখানা হাতে নিয়ে দেখল দামে ভারি, মনে মনে হয় তো কেদার চাটুজ্জের মতো ভাবলো বেশ দিব্যি পুরুষ্ট পাঁঠা, বল্‌ল আচ্ছা দিন। তারপরে বাড়ি গিয়ে যখন আবিষ্কার করলো একটানা নয়, কাটা কাটা তখন কি ভাবলো সেকথা অনুমান না করাই ভালো। তবু মূল প্রশ্নের সম্যক উত্তর পাওয়া গেল না। যে পাঠক মাসিকের পাতায় ছোট গল্প আগ্রহ ক'রে পড়ে, গল্প সমষ্টিতে তার অনীহা কেন। মাসিকে হয় তো ২-৩ টা ছোট গল্প থাকে তাও আবার ভিন্ন হাতের রচনা এক রকম চলে যায়। তাছাড়া পত্রিকাখানায় নিশ্চয় গোটা দুই ক্রমশঃ একটানা আছে প্রধানত সেই লোভেই কেনা, কাজেই মৎস্যরসিক যে মনোভাবে মাছের কাঁটাগুলোকে সহ্য করে সেই মনোভাবেই ছোট গল্পগুলো সহনীয় হয়। কিন্তু গ্রন্থাকারের

গল্প সমষ্টি অচল কেন ? গল্প থেকে গল্পান্তরে যেতে রসের রূপের ঘটনার বদল হয়—সেই আবশ্যিক ধাপ্পাটুকু অধিকাংশ পাঠকের পক্ষে অসহ্য। রেলগাড়ি মন্থর গতিতে চলতে চলতে মাঝে মাঝে লাইন বদলাবার সময় ঝাঁকুনি দেয়, আরোহী চমকে ওঠে ; তৃতীয় শ্রেণীর গাড়িতে সেটা আবার প্রবলতর। অধিকাংশ পাঠকের মন তৃতীয় শ্রেণীর, (আর্থিক বিচারে নয়, শিক্ষাদীক্ষার বিচারে) তারা মনে মনে বিরক্ত হয়ে ওঠে, পয়সা খরচ ক'রে এ ধাক্কা খাওয়া কেন ! একটানা মসৃণ গতি তাদের কাম্য। আগেই বলেছি অধিকাংশ পাঠকের মন তৃতীয় শ্রেণীর অর্থাৎ অসাড় জড় ও রসের বাজারে আনাড়ি। কাজকর্মের অবকাশে তারা কিছুক্ষণের জন্য মসৃণ আরাম চায় তার বেশি দাবী পুস্তকের উপরে তাদের নেই। কাজেই তাদের বাজারে ছোট গল্পের রূপান্তর রসান্তর ঘটনান্তর অচল। চাই উপন্যাস। আরও উপন্যাস। দেখে ঠেকে ভুগে সম্পাদক ও প্রকাশক অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছে—কাজেই লেখকও।

এখানে দু' একটা কথা বলে নি ; হয়তো একেবারে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। পরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা হতেই প্রশ্ন শুনি—বলি কি লিখছেন। চেয়ে দেখি মুখে তার অসীম প্রত্যাশা। হয় তো বললাম বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে কিংবা গীতার অনুবাদ। আশাভঙ্গুর মুখে তিনি বললেন ওসব তো হল, বলি আসল কি লিখছেন ? স্বীকার করতে হল 'আসল' এখন কিছু লিখছি না। প্রশ্নকর্তার নাটকীয় পরিভাষায় 'সবেগে প্রস্থান'। আসল মানে উপন্যাস। এখানেই বাংলা সাহিত্যের সর্বনাশ ও ছোট গল্পের সমাধি। এদেশে যে লেখক উপন্যাস লেখেন নি সে সাহিত্যিক বলে গণ্য নয়। এই বিচিত্র মাপকাঠি ইংরাজি সাহিত্যের ইতিহাসে প্রযুক্ত হলে বেকন বার্ক কার্লাইন রাস্কিন ম্যাথু আর্নল্ড প্রভৃতি বাদ পড়ে যান। উপন্যাস লেখেন নি যে। 'আসল' যখন আত্যন্তিক হয়ে ওঠে তখন তা যে ভেজালে ভরতি হয় এই অতি সরল সত্যটি বুঝতে এখনো কপালে অনেক দুঃখ আছে।

এবার সম্পাদক ও প্রকাশক। তাঁরা ব্যবসায়ী, পাঠকের মন

যুগিয়ে না চললে কাগজ ও ব্যবসা চলে না। কাজেই তাঁরা লেখকের শরণাপন্ন হলেন, উপন্যাস লিখুন। লেখক দেখলেন এ মন্দ নয়। ছোট গল্প লিখে মাসিক থেকে টাকা পাওয়া যায়—গ্রন্থকারে প্রকাশিত হলে বিশেষ কিছু মেলে না। কাজেই পত্রিকায়, বিশেষ ক'রে পূজা সংখ্যা, কিংবা নববর্ষ সংখ্যা প্রভৃতিতে উপন্যাস লেখায় লাভ বই ক্ষতি নেই। প্রথমত পত্রিকা থেকে দক্ষিণা বেশি পাওয়া যায়—আবার গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলেও রয়ালটি। কিন্তু অধিকাংশ পত্রিকা যখন উপন্যাস ছাপতে শুরু করলো তখন প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়ে গেল। কোন পত্রিকা যদি পাঁচখানি 'পূর্ণাঙ্গ' উপন্যাস ছাপলো, প্রতিযোগী ছাপলো সাতখানি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস। তার পরে 'পূর্ণাঙ্গ' উপন্যাসের ঢল নামলো। এখন সহজেই অনুমেয় এই সব উপন্যাসের পূর্ণাঙ্গতা নামে মাত্র, খুব বেশি হবে তো ৪-৫ ফর্মা। তারপরে গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময়ে আরও ২-৩ ফর্মা বাড়ানো, তাতেও না কুলোলে 'পাইকা' অক্ষর তো আছেই। ফলে দাঁড়ালো এ সব না ছোট গল্প না উপন্যাস। এরা রক্তপায়ী জোঁকের মতো স্ফীতোদর একটা প্রাণী। ওতে না আছে ছোট গল্পের সূক্ষ্মকলা-কৌশল, না আছে উপন্যাসের জীবন বিস্তার, আছে স্ফীতোদর ব্যবসায়িতা। এ শ্রেণীর দায়িত্বহীন রচনার মতো সহজ কাজ আর নেই।

কপি রাইটের নিষেধ না থাকলে রবীন্দ্রনাথের ক্ষুধিত পাষাণ, দুরাশা, কিংবা রাসমণির ছেলের মতো গল্পকে অনায়াসে ৭-৮ ফর্মার উপন্যাসে পরিণত করা যায়, তাতে তাদের রস এক বিন্দুও বাড়বে কিনা সন্দেহ। আবার এ জাতীয় 'পূর্ণাঙ্গ' উপন্যাসকে কমিয়ে এনে এক ফর্মার ছোট গল্পে পরিণত করা চলে—এখানেও বাধা কপি রাইট নতুবা দুই শ্রেণীর রচনার দুটি উদাহরণ তৈরি করে দেখাতে পারা যেতো। অনেকে বলতে পারেন বঙ্কিমচন্দ্র তো করেছেন, ছোট ইন্দিরা ও ছোট রাজসিংহকে পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসে পরিণত করেছেন। আমার বিশ্বাস আরও কিছুকাল বাঁচলে হয় তো তিনি যুগলাঙ্গুরীয়কেও পূর্ণাঙ্গ

ক'রে তুলতেন। এ তিনখানাই বৃহৎ উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত খসড়া, রাধারাণীও তাই। বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই স্বীকার করেছেন পূর্ণাঙ্গ ইন্দিরা ও পূর্ণাঙ্গ রাজসিংহ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র গ্রন্থ। নাম সাম্যে ওদের এক মনে করা উচিত হবে না। বঙ্কিমচন্দ্র নূতন ক'রে রক্তমাংস দিয়ে নূতন রচনা করেছেন—এ জৈবিক রূপান্তর। এখন যা চলছে তা টেনে লম্বা করা মাত্র তার মধ্যে জীবনীশক্তির ক্রিয়া নাই।

ছোট গল্পের বস্তুকে কৃত্রিম উপায়ে টেনে উপন্যাসে পরিণত করতে গেলে কৃত্রিম উপন্যাস হওয়া ছাড়া আর কি হবে। ছোট গল্প ও উপন্যাস সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরনের শিল্পকলা। ছোট গল্পে পাত্রপাত্রী আছে, আবার পরিণাম আছে—এর দুয়ের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে সংযোগ সাধনে ছোট গল্পের সার্থকতার রহস্য এ অনেকটা সনেট জাতীয় রচনার সগোত্র। উপন্যাসেও এই স্বাভাবিক সংযোগসাধন আছে তবে তা সরাসরি সরল পন্থায় নয়, নানা শাখাপ্রশাখার বিস্তারিত জটিল বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে। ছোট গল্প জীবনখণ্ড, উপন্যাস জীবন বিস্তার। এ দুয়ে যে কখনো সংযোগ করা চলে না তা নয়, তবে বর্তমানে যে ভাবে হচ্ছে তেমন ক'রে নয়, কেমন ক'রে তার ক্লাসিক দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রনাথের চতুরঙ্গ। ছোট গল্পের স্বকীয়তা রক্ষা ক'রে ওর মধ্যে জীবনবিস্তার আনবার চেষ্টা হ'ছে। এখনকার মাসিক পত্রের অধিকাংশ উপন্যাস ঘটনার বস্তাবন্দী রূপ। পাঠকে যদি আগ্রহের সঙ্গে পড়ে তার কারণ অমার্জিত মনের অসারতা—খানিকটা একটানা দৈর্ঘ্য পেলেই খুশী। এর ফল হচ্ছে ছোট গল্পের প্রকৃতি ও উপন্যাসের প্রকৃতি দুই ব্যাহত হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের কল্যাণে যে অনবদ্য ছোট গল্প সাহিত্যে গড়ে উঠেছিল কোথায় পরবর্তীগণ তার উন্নতিসাধন প্রয়াস করবে, না, তার বদলে করছে তার বিলোপসাধন চেষ্টা। এমন-ভাবে চললে আর কিছু দিনের মধ্যেই বাংলা সাহিত্য থেকে ছোট গল্পের ধারা মুনাফাশিকারী ব্যবসায়ীদের এবং মুনাফালোভী লেখকদের অশুভ যোগাযোগে লোপ পাবে—আর যা রচিত হয়ে উঠবে তাকে

উপন্যাস বলা মনের সঙ্গে চোখঠারা মাত্র। লেখক সম্পাদক প্রকাশক সকলেরই সতর্ক হওয়ার সময় এসেছে -আর পাঠক! পাঠক তৈরি করা এঁদের তিনজনেরই দায়িত্ব। কিন্তু হচ্ছে ঠিক তার বিপরীত। অমার্জিত রুচি পাঠকের গল্পগ্রাসী ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে গিয়ে রস সাহিত্যের দুটি প্রধান ধারাকে সকলে মিলে নিষ্ফলতার মরু বালুকার দিকে চালিত করছেন। অতএব সাধুগণ সাবধান। ছোট গল্পের আত্মহত্যার অস্ত্রে শান দেওয়া থেকে তারা এখনই নিবৃত্ত হোন।

নতুন বই

রাজধানী এক্সপ্রেস—নিমাই ভট্টাচার্য—৪'০০

রেশমী ফাঁস—নিশাচর—৬'০০

হাজার চুরাশীর মা—মহাশ্বেতা দেবী—৭'০০

মধুসূদন থেকে রবীন্দ্রনাথ—প্রমথনাথ বিশী—১৬'০০

যোগীবর বরদাচরণ—শ্রীঅমরনাথ রায়—১২'০০

ব্যুমেরাং—নিশাচর—৬'০০

নৃশংস মাফিয়া—চিরঞ্জীব সেন—৭'০০

বন্যা এলো—শক্তিপদ রাজগুরু—১২'০০

দুঃস্বপ্ন—অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়—৭'০০

ভক্তিগীতি মাধুরী—নজরুল ইসলাম—১০'০০

নাটক

পরাজিত নায়ক—ধন ন বৈরাগী—৮'০০

ওরা থাকে ওধারে—প্রেমেন্দ্র মিত্র—৪'০০

নরকের অধিশ্বর—অসিত গুপ্ত— ৫০

চক্র—লোকনাথ ভট্টাচার্য—৪'০০

প্রাচীন নাট্য সংগ্রহ (১ম খণ্ড)—ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত)—২৫'